অচিন্ত্যকুমারের কিশোর সঞ্চয়ন

প্রথম প্রকাশ
শ্রাবণ, ১৩৬৭
অগস্ট, ১৯৬০
প্রকাশ করেছেন
অমিয়কুমার চক্রবর্তী
অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির
৬, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলকাতা-১২
ছেপেছেন
রতিকান্ত ঘোষ
অশোক প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১৭।১, বিন্দু পালিত লেন
কলকাতা-৬
প্রচ্ছদ এঁকেছেন

অচিন্ত্যকুমারের

কিশোর সঞ্চয়ন

অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির
৬, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলকাতা-১২

াস সিক্স্এ যখন পড়ি, মনে আছে, প্রথম কবিতা লিখি। বাঘের গলায় াড় ফুটেছে, তার কী যন্ত্রণা, সেই নিয়ে কবিতা। 'একদা বাঘের গলে টেছিল হাড়। বাঘ ভাবে কী করিয়া পাইব উদ্ধার॥' এই বোধহয় আমার াথম শ্লোক। বাল্মীকির প্রথম শ্লোক পাখি নিয়ে, আমার বাঘ নিয়ে। কি নখছিস রে? কবিতা? দাঁড়া, বলে দিচ্ছি! ব্যস, হয়ে গেল। কবিতার ফা রফা। বাঘের উদ্ধার দূরের কথা, নিজের উদ্ধারেরই পথ কম।

খনকার দিনে ছাত্রাবস্থায় গল্প কবিতা লেখা বরদাস্ত হত না। অভিভাবকেরা দখত না নেকনজরে। প্রতিবেশীরা বিদ্রূপ করত। আর ইস্কুলের মাস্টার াতায় দু-লাইন খুঁজে পেলে মেহেদির ডালের ফরমাস করে বসত। এখন সদিন এক ছেলে কী দু-লাইন মিলিয়েছে, তার বাবা দেখাতে এসেছে গর্ব করে, ার পদ্যটা ছাপিয়ে দেওয়া যায় কি না বেরিয়েছে তার তদবিরে। ওভাবে খালাখুলি লেখার চাইতে লুকিয়ে লুকিয়ে লেখার আনন্দ যেন বেশি ছিল। কটা বুঝি বা জয়ের ভাব ছিল, অসাধ্যসাধনের ভাব। উৎসাহের জন্যে পরের য়ারে হাত পাতার দরকার ছিল না, নিজের জীবনের উত্তাপই যথেষ্ট ৎসাহ।

সই ছেলেবেলা থেকেই লেখায় লেগে আছি। কলেজের পড়া প্রায় শেষ হয়ে সেছে, ডাক পড়ল "মৌচাকে"। নিরীহ একটা গল্প সহজ ভাষায় লিখতে ারলেই সেটা ছোটদের গল্প হল এমনি একটা ধারণা চালু ছিল বাজারে। কন্তু ছোটদের গল্প লিখতে হলে যে ছোটদের মন চাই, চাই বিশেষ একটি ানসিক পরিবেশ, এ চেতনা খুব বেশি জাগ্রত ছিল না। ছোটদের জগতের য নতুন রকম ভাষা, নতুন রকম রঙ-রেখা, সেটা আবার নতুন করে অনুভব রতে হল। ছোটদের জিনিসকে বিশেষভাবে নিজের করে নিয়ে আবার সেই পায়ে তাকে আবার বিশেষভাবে ছোটদের করে দিতে পারলেই সার্থক সৃষ্টি ম্ভব।

ছলেরা শুধু দুই জাতের লেখাই বেশি ভালবাসে, হাসির আর রোমাঞ্চের—এ ারে নিয়ে হাসির আর রোমাঞ্চের গল্পেরই ছড়াছড়ি আজকাল। আর কে না ানে ইদানি এই দু-ধরনের লেখার কী অসম্ভব বিকৃতি ঘটেছে, কী শস্তা

চপলতা। ছেলেদের এ ভাবে প্রতারিত করা সাহিত্যের কাজ নয়। জীবনের নতুন আলোকে নতুন চাঞ্চল্যে তাদের চেতনাকে পরিস্ফুট করাই সাহিত্যের কাজ। শুধু আনন্দ নয়, কিছু মঙ্গলও ছেলেদের দিতে হবে যাতে পূর্ণ সৌন্দর্যে ও শক্তিকে তারা বাড়তে পারে বড় হতে পায়ে, এটাও সাহিত্যের ভাবনা। আর আশার কথা, ছেলেদের অভিভাবকেরাও ক্রমে এই চেতনায় উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন যে সরস গম্ভীর রচনাও ছেলেদের উপজীব্য। শুধু ক্ষণিক উত্তেজনা নয়, একটি রসলাবণ্যের স্পর্শ তাদের চিত্তে স্থায়ী হোক।

সেইজন্যে অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দিরের এই সঞ্চয়নের প্রচেষ্টা প্রশংসার্হ। শুধু এক ধরনের একরাশ লেখা ছাপিয়ে ছেলেদের রুচি নষ্ট করে দিতে চান নি—বিচিত্র রসনাসম্ভার একত্র করে একটি পরিপূর্ণতার আস্বাদ দিতে চেয়েছেন। এমন খাদ্য চাই যাতে ছোটদের শুধু ক্ষুন্নিবৃত্তিই হবে না, তুষ্টি-পুষ্টিও হবে। গল্প উপন্যাস কবিতা প্রবন্ধ—বহুবিধ রচনার একত্র গ্রন্থনের লক্ষ্য শুধু আনন্দ নয়, কিছু শিক্ষা, কিছু কল্যাণ, কিছু বা বৃহতের প্রতি সমগ্রের প্রতি ইশারা।

কিশোরদের অভ্যুদয়-পথ জ্যোতির্ময় হোক, মেঘনির্মুক্ত হোক, তাদের সঙ্গে আমারও এই জয়ধ্বনি।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

উপন্যাস

উঁচু-নিচু

এক

আপিস-ঘরের পর্দার ধারটা একটু ফাঁক করে কানাই ভিতরে উঁকি মারল। দেখল বড়-সাহেব ঘরে নেই, অথচ ব্র্যাকেটে কোটটা তাঁর ঝুলছে। এ-সময়ে বড় সাহেব কোথায় যেতে পারেন, সাত-পাঁচ কিছু সে ভেবে দেখল না, ভেবে দেখবার সময়ও বোধহয় নেই, চোরের মত পা টিপে-টিপে সে ঘরের মধ্যে চলে এল।

দুঃসাহসিকের কাজ—দুপুরবেলা বড়-সাহেবের খাসকামরাতে এমনি চলে আসা। আশে-পাশে কত-শত লোক, কে কখন দেখে ফেলে ঠিক নেই। জানলাগুলো খোলা, যেন প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড চক্ষু মেলে ঘরের দেয়ালটাকে গ্রাস করছে। পলক ফেলতে পর্যন্ত সময় দিচ্ছে না। এক মুহূর্ত দেরি হয়েছে কি ছাদ তার মাথায় পড়েছে ভেঙে।

তবু এক মুহূর্ত সে দেরি করল, দেখল এক কোণে টেবিলের উপর সাহেবের খাবার রয়েছে সাজানো। এমন খাবার, জীবনে যা সে কোনদিন খায় নি এবং এত খাবার, অনেক দিন ধরে যা সে খেতে পারে। কিন্তু না, খাবারের দিকে চোখ দিয়ে লাভ নেই, চোখ পাঠাতে হবে অন্যত্র: সাহেবের পকেটের গহ্বরে।

ভয়ে বুক তার দপ-দপ করছে, গলা শুকিয়ে এসেছে, হাত-পাগুলো আড়ষ্ট হয়ে আসছে, তবু সে সন্তর্পণে ব্র্যাকেটের দিকে অগ্রসর হল। প্রথমেই হাত ঢুকিয়ে দিল কোটের ভিতর-পকেটে, স্পষ্ট না দেখেও মনি-ব্যাগের অস্তিত্বটা যেখানে অনুভব করা যায়। কিন্তু মনি-ব্যাগটা সবে আদ্ধেক তুলেছে, অমনি পাশের বাথ-রুমের দরজা গেল খুলে আর মূর্তিমান যমদূতের মত বড়-সাহেব এলেন বেরিয়ে। হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, 'কে রে?'

পকেটের ভিতর থেকে মনি-ব্যাগটা আধখানা বের করা, তেমনি অবস্থাতেই শূন্যে হাত তুলে কানাই নিস্পন্দের মত দাঁড়িয়ে রইল। তার মনে হল নিমেষে যেন ঘর-বাড়ি আকাশ-পৃথিবী সমস্ত পাথর হয়ে গেছে, সে নিজে পর্যন্ত নড়তে পারছে না।

বড়-সাহেব সবেগে এসে কানাইয়ের কান চেপে ধরলেন। বাজের মত গর্জন করে উঠলেন : 'কী করছিলি এখানে?'

পকেট থেকে কানাইয়ের হাতটা শিথিল হয়ে খসে পড়ল। কানে সুতীব্র যন্ত্রণা অনুভব করে বুঝল সে এখনো বেঁচে আছে, পাথর হয়ে যায় নি ; কিন্তু তার মুখে কথা নেই কেন?

বড়-সাহেব প্রবল বিক্রমে কানাইয়ের গাল ও ঘাড়ের আধখানা জুড়ে প্রকাণ্ড একটা চড় মারলেন। চেঁচিয়ে উঠলেন : 'কী, কথা বলছিস না কেন, কী করছিলি আমার কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে?'

সেই চড়ে কানাইয়ের চিৎকার করে কেঁদে উঠা উচিত ছিল, কিন্তু একটুও সে শব্দ করল না। যে অপরাধ সে আজ করেছে তার জন্যে সমস্ত শাস্তিই তাকে নীরবে সহ্য করতে হবে। শব্দ চেপে রাখা গেলেও কান্না বোধহয় চাপা যায় না। কানাইয়ের দু-চোখ ঠেলে জল উপছে উঠল। ফ্যালফ্যাল করে তাকাল একবার সে বড়-সাহেবের মুখের দিকে।

পরনে সাহেবি পোশাক বটে, কিন্তু আসলে সাহেব নন। লম্বা-চওড়া বিশাল চেহারা, প্রকাণ্ড মুখে প্রকাণ্ড গোঁফ, চোখদুটো যেমন ক্ষুদ্র তেমনি হিংস্র আর হাতের থাবাটা বাঘের থাবার মতই নির্মম। তবু এত বড় দেহে নিশ্চয়ই কোথাও হৃদয় আছে, কানাইয়ের মনে হল। মনে হল সামান্য কটা টাকা হাত পেতে সে ভিক্ষা চাইলেই হয়ত পেত। এঁদের কত টাকা কত দিকে পাখা মেলে বেরিয়ে যাচ্ছে, তার দিকে কটা তাচ্ছিল্য করে ছুঁড়ে ফেলে দিতে হয়ত কখনো কার্পণ্য করতেন না, আর যখন শুনতেন কেন তার টাকার দরকার।

ঘাড় ধরে ক-টা প্রবল ঝাঁকানি দিয়েও ছেলেটার মুখ থেকে আওয়াজ বের করানো গেল না। তীব্র কণ্ঠে বড়-সাহেব তাই চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ম্যানেজার! ম্যানেজার!'

হন্তদন্ত হয়ে ম্যানেজার ছুটে এল। আপিসে সে মেজ-সাহেব এবং আসলে বড়-সাহেবের শালা। ভগ্নীপতির অনুকরণে সেও গোঁফ রাখে বটে, কিন্তু তার গোঁফ বাইসিকেলের হ্যাণ্ডেলের মত দুই দিকে ঝুলে পড়েছে। ভেবেছিল টিফিনের ডাক পড়েছে বুঝি, কিন্তু ঘণ্টায় না ডেকে একেবারে গলা ফাটিয়ে ডাক, ব্যাপার কী!

ম্যানেজারের আসল নাম বটকৃষ্ণ। কিন্তু লুকিয়ে সবাই তাকে 'মোটের উপর' বলে ডাকে।

ঘরে ঢুকে ম্যানেজারের চক্ষুস্থির! খালি গায়ে খালি পায়ে ময়লা কাপড় পরনে চোদ্দ পনেরো বছর বয়সের একটা রোগা ছেলের কান ধরে বড়-সাহেব বহ্নিচক্ষু হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, আর ছেলেটার গাল বেয়ে জলের দুটো ধারা নেমে এসেছে। ব্যাপারটা চট করে সে কিছু আয়ত্ত করতে পারল না, বিমূঢ়ের মত চেয়ে রইল।

'থাক কোথায়?' ম্যানেজারকে লক্ষ্য করে সাহেব ধমকে উঠলেন।

পৃথিবী কেঁপে উঠল, ম্যানেজারের তাই মনে হল। মাথা চুলকে, কাতর মুখে সে বললে, 'মোটের উপর, এখানে; পাশে ঘরেই তো ছিলুম।'

'পাশের ঘরে ছিলে!' ক্রুদ্ধ দন্তে সাহেব ভেংচিয়ে উঠলেন: 'তুমি থাকো পাশের ঘরে, আমি থাকি বাথরুমে, আর এদিকে আমার কোটের পকেটটা লোপাট হয়ে যাক, না? জিগগেস কর দেখি, যখন ঘরে আমরা কেউ নেই তখন ছোঁড়াটা কী করতে এসেছিল এখানে?'

ব্যাপারটা যেন কতক বুঝতে পারল ম্যানেজার। সাহসে ভর করে তাই সে কানাইয়ের অন্য কানটা আকর্ষণ করল। ইস্ক্রুপের মত তাতে মোচড় দিয়ে সামনে খানিকটা ঝুঁকে পড়ে সে জিগগেস করলে: 'মোটের উপর, কী করতে এসেছিলি শুনি?'

'চুরি করতে এসেছিলাম।' নির্গলিত কান্নায় বিহ্বল কণ্ঠে কানাই বললে।

অপরাধীর মুখে অপরাধ স্বীকার করাটাও বোধহয় অসহ্য। 'চুরি করতে এসেছিলে?' সাহেব আরেকটা চড় কষালেন এবং সেটার প্রাবল্য এত ভয়ঙ্কর ছিল যে ম্যানেজার অন্য কানটা ছেড়ে দিয়ে এক লাফে দশ হাত দূরে ছিটকে পড়ল, আর প্রহারের মধ্যে এমনি একটা মাদকতা আছে যে হাত চলতে থাকলে পা চলতে চায়, আর হাত পা যখন দুইই চলে কেউ কাউকে ছেড়ে সহজে নিবৃত্ত হতে চায় না। 'চুরি করতে? জানিস তুই আমার ব্যাগে কত টাকা আছে? ভাবতে পারিস?'

কানাই তখন মেঝের উপর উবু হয়ে বসে পড়েছে দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ ঢেকে, আর অস্ফুট একটা আর্তনাদ করছে। তারই মধ্য থেকে সে হাঁপাতে-হাঁপাতে বললে, 'সমস্ত আমি নিতাম না বাবু, কক্‌খনো না, মাত্র তিন টাকা পাঁচ আনা আমার দরকার।'

জুতোর ডগা দিয়ে তার পিঠে ঠোকর মেরে সাহেব বললেন, 'ওঁর জন্যে কড়াক্রান্তি হিসেব করে ব্যাগে আমার টাকা রাখতে হবে, যাতে করে উনি গুণে-গেঁথে চুরি করতে পারেন!' ডান পা-টা পরিশ্রান্ত হয়েছিল বলে সাহেব এবার বাঁ পায়ের ব্যবহার শুরু করলেন।

ম্যানেজার সাহস করে আবার এগিয়ে এল। বললে, 'ক-টাকা ক-আনাই যখন দরকার তখন মুখ ফুটে এসে চাইতে পারতিস না? মোটের উপর, চুরি করতে গেলি কেন?'

'রাখ!' সাহেব আবার ধমকে উঠলেন এবং ম্যানেজার আবার তিন হাত দূরে ছিটকে পড়ল: 'চাইলেই দিয়ে দিতে হবে! এ তুমি মামাবাড়ি পেয়েছ?'

মাথা চুলকে ম্যানেজার বললে, 'মোটের উপর মামাবাড়িতেও কেউ দেয় না।'

'তবে? চাইলেই হল? চাইলেই তিন টাকা পাঁচ আনা ওকে দিয়ে দিতে হবে? আর, তা দেব না বললেই চুরি করবে ও আমার

ব্যাগ ?' এক হেঁচকা টানে কানাইকে সাহেব দাঁড় করিয়ে দিলেন। বললেন : 'পুলিশ ডাক। ছোঁড়াকে আমি পুলিশে দেব।'

'পুলিশ! পুলিশ!' ম্যানেজার গলা ছেড়ে ডাকতে শুরু করল।

'কী গাঁক-গাঁক করে চ্যাঁচাচ্ছ ?' সাহেব ধমকে উঠলেন, 'ব্যাগ যখন সত্যি নিতে পারেনি তখন আর পুলিশে দিয়ে কী হবে ?'

'নিতে পারেনি ? ও হ্যাঁ, তখন আর পুলিশের কী দরকার! মোটের উপর নিতে পারেনি যখন—' ম্যানেজার আশ্বস্ত হবার ভঙ্গি করে খাবারের প্লেটের সামনে চেয়ার টেনে বসল।

'কিন্তু ছোঁড়াটাকে তুমি চেন ?'

'চিনি বৈকি। ও তো কানাই। নবীন মিস্ত্রির ছেলে।'

'কে নবীন মিস্ত্রি ?'

'মোটের উপর নবীন মিস্ত্রির ছেলে।' ম্যানেজার একখানা চপ মুখে পুরল আর তার বাইসিকেলের হ্যাণ্ডেলটা চিবোনোর সরু রাস্তায় আঁকা-বাঁকা ভঙ্গি করতে লাগল। তার এক ফাঁকে বললে, 'নবীন মিস্ত্রির বাপের নাম আমার জানা নেই।'

গোলমাল শুনে আনাচে-কানাচে লোক জমে গিয়েছিল, তাদেরই মধ্যে থেকে কে একজন বললে, 'আমাদেরই নবীন। এখানেই সে কাজ করে।'

কে আরেকজন যোগ করে দিল : 'পাগলাটে নবীন।'

সাহেব হুকুম করলেন : 'তাকে এক্ষুনি পাঠিয়ে দাও এখানে।' বলে চেয়ারে বসে পড়লেন। অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়েছিলেন বলে তক্ষুনি খাবারের প্লেটটা সামনে টেনে আনতে পারলেন না।

যে লোকটা এল, মনে হল যেন শ্মশান থেকে উঠে এসেছে। কঙ্কালসার চেহারা। গায়ে একটা ফতুয়া আছে বটে, কিন্তু তারই উপর থেকে যেন তার পাঁজর গোনা যায়। বয়সে যত নয়, রোগে আর দারিদ্র্যে তার চেয়ে বেশি বুড়ো দেখায়। একগাল দাড়ি রেখেছে,

তাতেও ভাঙা গালদুটো ঢাকা পড়েনি। চেহারা দেখেই সাহেব তাকে চিনতে পারলেন।

'ও! তুমি! এ তোমার ছেলে?'

কানাই বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনি, আবার তেমনি দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ ঢেকে মেঝের উপর বসে পড়েছে। নবীন সামান্য একটু নিবিষ্ট হয়ে দেখতে যাচ্ছে, অমনি ও-পাশের থেকে ম্যানেজার হুঙ্কার দিয়ে উঠল: 'মোটের উপর এ তোমার ছেলে কি না?'

মুখ না দেখেও ছেলেকে চিনতে নবীনের দেরি হল না। বললে, 'হ্যাঁ, হুজুর!'

'সাহেব জিগগেস করলেন: 'তুমি এখানে কদ্দিন চাকরি করছ?'

'আজ একুশ বছর।'

'কত মাইনে পাচ্ছ এখন?'

'আঠেরো টাকা।'

'হুঁ!' সাহেব একটা প্রবল নিশ্বাস ছাড়লেন: 'তোমার চাকরি আজ গেল।'

একমুখ খাবার নিয়ে ম্যানেজার বললে, 'মোটের উপর তুমি বরখাস্ত হয়ে গেলে।'

বুড়ো নবীনের দু-চোখে ধাঁধা লাগল। আকাশটা হঠাৎ মাটির উপর খসে পড়লেও যেন সে এত চমকাত না। নিষ্প্রাণ গলায় সে বললে, 'হুজুর, আমার অপরাধ?'

'তোমার অপরাধ তোমার ছেলে।' সাহেব কানাইয়ের দিকে জুতোর ডগাটা উঁচিয়ে ধরলেন। বললেন, 'তোমার ছেলে চোর, পকেটমার; সে আমার ঘরে ঢুকে ব্র্যাকেটে আমার কোটের পকেট থেকে ব্যাগ চুরি করতে গিয়েছিল—'

'সেই অপরাধে তোমার ছেলের চাকরিটি আজ গেল, নবীন।' ম্যানেজার পরম উৎসাহের সঙ্গে বললে।

'খাচ্ছ, খাও, তুমি এর মধ্যে কথা বলতে আস কেন?' সাহেব তর্জন করে উঠলেন: 'ওর ছেলে চাকরিই করে না, তার আবার চাকরি যাবে কী! ওর বাপের চাকরি গেল।'

ঢোক গিলে তারপর খানিকটা জল খেয়ে ম্যানেজার বললে, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাপের চাকরি গেল। গোড়াতেই আমার ভুল হয়েছিল। মোটের উপর বাপের চাকরি।'

'চোর? চুরি করতে এসেছিল!' রাগে অন্ধ হয়ে নিষ্ঠুর আক্রমণ করবার উদ্যোগে নবীন কানাইয়ের চুলের ঝুঁটিটা চেপে ধরল। এক টানে মুখটা চোখের সামনে তুলে ধরতেই আতঙ্কে সে স্তব্ধ হয়ে গেল। সমস্ত মুখ-চোখ তার ফুলে গেছে, নাক দিয়ে দাঁত দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে, ঠোঁটদুটো কেটে গেছে—শুধু মুখ দেখে আর তাকে চেনা যায় না। নবীনের মুঠিটা নিজের অজানতেই হঠাৎ আলগা হয়ে এল। বললে, 'ব্যাগটা ফিরিয়ে দিয়েছে?'

ম্যানেজার হেসে উঠল। বললে, 'নিতেই পারে নি তার আবার ফিরিয়ে দেবে কী! গোড়াতেই ভুল করে বসেছ।'

'কিন্তু এসেছিল চুরি করতে। পকেটে দস্তুরমত হাত ঢুকিয়েছিল। আর এমনি নির্লজ্জ, তা আবার উঁচু গলায় জাহির করা হচ্ছে!' সাহেব নবীনের দিকে রোষগম্ভীর দৃষ্টিক্ষেপ করলেন: 'ছেলেকে চমৎকার শিক্ষা দিয়েছ, নবীন!'

অপরাধটা তারই, এমনি ভাবে নবীন তাকাল। বললে, 'সেইজন্যে আমার চাকরিটি যাবে! আমি কী দোষ করেছি!'

'দোষ করেছ, ছেলেকে শিক্ষা দাও নি।' বললে ম্যানেজার।

'ও চুরি করতে এসেছিল, ওকে আপনি মারুন কাটুন জেলে দিন, যা আপনার খুশি। কিন্তু আমার চাকরিটি গেলে আমি দাঁড়াব কোথায়?' নবীন সাহেবের পায়ের কাছে ভেঙে পড়ল।

ম্যানেজার টিপ্পনি কাটল: 'কেন, ছেলের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে।'

'আঃ, তুমি একটু চুপ কর দেখি!' সাহেব রুখে উঠলেন। পরে নবীনের দিকে তাকিয়ে কঠিন গলায় বললেন, 'তোমার ছেলে এই যে অপরাধ করল, বলতে চাও, কোনো শাস্তি হবে না!'

কানাইয়ের আহত মুখটা নবীনের একবার মনে পড়ল। তবু সাহেবের পা জড়িয়ে ধরে বললে, 'যত খুশি শাস্তি আপনি দিন, কিন্তু দয়া করুন, চাকরিটি নেবেন না!'

'আচ্ছা বেশ, তুমি থাক। কিন্তু এক কথা। মনে থাকবে?' সাহেব আঙুল তুললেন।

ভয়ে-ভয়ে নবীন উঠে দাঁড়াল।

'হুঁসিয়ার! ছেলেকে তোমার এ-অঞ্চলে কক্খনো আসতে দেবে না। মনে থাকবে?' সাহেব আঙুল নাড়তে লাগলেন।

'কক্খনো দেব না। আসবে তো, ওরই একদিন কি আমারই একদিন! আপনার দয়ার শরীর, হুজুর।' বলে নবীন আভূমি প্রণত হল। পরে ছেলের ঘাড়ে এক রদ্দা মেরে তাকে ঘরের বাইরে ঠেলে দিলে।

ম্যানেজার এক লাফে উঠে এল সামনে। নবীনকে বাধা দিয়ে বললে, 'আর শোন, ছেলেকে এবার থেকে শিক্ষা দেবে। বুঝলে?'

নবীন কিছুই বুঝতে না পেরে হেসে ফেলল।

ম্যানেজার তাকে বুঝিয়ে দিল। বললে, 'মোটের উপর কালকেই তাকে ইস্কুলে ভর্তি করে দেবে। যাতে চুরি সে কোনদিন না করে। কী, মনে থাকবে?'

বোকা, পাগলা নবীন কিছুই বুঝতে না পেরে আবার হেসে ফেলল।

'আস্ত একটা ইডিয়ট!' বলতে-বলতে ম্যানেজার তার চেয়ারে গিয়ে বসল।

দুই

ঘাড়ে আরেকটা রদ্দা মেরে ছেলেকে নবীন রাস্তায় বার করে দিলে। বললে, 'চোর, হতভাগা! ও-মুখ তুই আর আমার সামনে বার করিসনে!'

ঘুঁসি খেয়ে যে-চোখটা তার ফুলে গেছে, নবীনের মনে হল সেই চোখে কানাই তার দিকে একবার চাইল। কাঁদল না, কথা কইল না, আস্তে-আস্তে চলে গেল রাস্তা ধরে।

কতদূর গিয়েই একটা জলের কল। কল খুলে সে মুখ ধুল, মাথা ধুল এবং সেই জলের সঙ্গে মিলিয়ে হয়ত চোখের জলও ফেলল। অমানুষিক মার খেয়েছে বলে নয়, ব্যাগটা সরাতে পারেনি বলে।

'এই, শোন।'

হঠাৎ কে যেন ডাকল। কানাই চমকে উঠল, চেয়ে দেখল কাছে দাঁড়িয়ে কে একটি সুদর্শন ছেলে তাকে যেন কী প্রশ্ন করছে। ষোল-সতের বছর বয়েস, পাতলা ছিপছিপে চেহারা, মুখে শান্ত একটি স্নেহ। দেখলেই এগিয়ে যেতে ইচ্ছে করে, কিন্তু ছেলেটির পরনে সাহেবি পোশাক দেখে কানাইয়ের ভরসা হল না। একে সাহেবি পোশাক, তায় দাঁড়িয়ে আছে একটা মোটর-গাড়ির সামনে। কানাইয়ের ভয় হল এখুনি বা তার গায়ের উপর দিয়ে না গাড়িটা চালিয়ে দেয়।

ছেলেটি নিজেই এগিয়ে এল, এবং বিশ্বাস করা যায় না, ট্রাউজারের পকেট থেকে রুমাল বের করে জলে ভিজিয়ে নিল। পরে পুঁটলি পাকিয়ে বললে, 'এমনি করে খানিকক্ষণ জলপটি দাও।' বলে নিজেই

ভিজে রুমালটা কানাইয়ের চোখের উপর চেপে ধরল। বললে, 'ভীষণ লেগেছে, না?'

লজ্জিত হয়ে কানাই বললে, 'না। লাগেনি।'

তার হাতে রুমালটা ছেড়ে দিয়ে ছেলেটি জিগগেস করলে, 'তোমার কত টাকার দরকার?' বলে তার কোটের ভিতর-পকেট থেকে সে একটা ব্যাগ বার করলে।

কানাই ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

ছেলেটি স্নিগ্ধ মুখে বললে, 'টাকার দরকার বলেই তো চুরি করতে গিয়েছিলে? কী, সত্যি নয়? আর, খুব বেশি টাকার দরকার নেই বলেই তো সমস্ত ব্যাগটা সরাতে চাও নি! কী, ঠিক বলছি না? তবে এখন বল, কত টাকা তোমার চাই।'

মার খেয়ে কানে তার তালা লেগেছে, চোখ ঝাপসা হয়ে এসেছে, তাই বোধহয় কানাই ঠিক শুনছে না, ঠিক দেখছে না! নইলে শাদা দিনের আলোয় শুকনো মাটির উপর দাঁড়িয়ে চোরকে কেউ উপযাচক হয়ে টাকা দেয় এটা অভাবনীয়।

'তোমার কিচ্ছু ভয় নেই। যে টাকা আমি তোমাকে দিতে যাচ্ছি সেটা আমি চুরি করে পাই নি।' ছেলেটি হাসল। বললে, 'বল, কত পেলে তোমার চলে!'

কানাইয়ের মুখ থেকে বেরিয়ে এল: 'তিন টাকা পাঁচ আনা।'

'সর্বনাশ! খুচরো কিচ্ছু নেই ব্যাগে।' ছেলেটি তার মনিব্যাগের গহ্বরগুলি অনুসন্ধান করতে লাগল। বললে, 'চুলোয় যাক্‌গে। মোট এই পাঁচ টাকাই তুমি নাও।' বলে পাঁচ টাকার একখানা নোট সে এগিয়ে ধরল।

নেবে কি নেবে না, কানাই দ্বিধায় লাগল দুলতে।

'নাও। কে জানে, হয়ত এ টাকাটা পেলে তোমার আর ইহজীবনে চুরি করবার ইচ্ছে হবে না।' বলে জোর করে কানাইয়ের

হাতের মধ্যে নোটটা ছেলেটি গুঁজে দিল। পরে বললে, 'তোমার টাকার হঠাৎ দরকার হল কেন? করবে কী?'

এতক্ষণ অবরুদ্ধ হয়ে ছিল, এইবার কানাইয়ের চোখের জল বন্যার জলের মত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। বললে, 'দিদির সঙ্গে দেখা করতে যাব।' যখনই সে দিদির কথা ভাবে তখনই তার কান্না পায়।

'দিদি? সে কোথায়?'

'শ্বশুর বাড়িতে।'

'সেখানে কী?

'সেখানে তার বড় কষ্ট।' কানাই ভিজে রুমালে দুই চোখ মুছতে লাগল: 'আজ তিন বচ্ছর তার বিয়ে হয়েছে, কিন্তু শ্বশুরবাড়ি থেকে তাকে একদিনের জন্যেও ছেড়ে দেয় নি। বাবা তাদের মনের মত গয়না দিতে পারেন নি বলেই তাদের রাগ, দিদিকে বাপের বাড়ি আসতে দিচ্ছে না। দিদি চিঠি লিখেছে বাবাকে, আমাকে নিয়ে যাও, নইলে আমি মরে যাব। বাবা যেতে চান না, বলেন, গয়না দেবার মত টাকা নেই। তাই আমি ঠিক করেছি, আমিই দিদিকে নিয়ে আসব। আমাব সঙ্গে যখন গয়নার চুক্তি হয়নি তখন আমার নিতে আসতে বাধা কী! নিয়ে আসতে না পারি, একবার দেখে আসতে তো পারব। কতদিন দেখি না দিদিকে!'

'তিন টাকা পাঁচ আনা বুঝি সেখানকার ট্রেন-ভাড়া?'

'হ্যাঁ। সেই তিন টাকা পাঁচ আনাই শুধু আমার দরকার। তার বেশি নয়।'

'ওটা তো এক-পিঠের ভাড়া। তারপর, ফিরবে কী করে? দিদির ভাড়াও বা দেবে কে?'

'জানি না। ভেবে দেখিনি!' কানাই অবিচলিত ভাবে বললে, 'শুধু ভেবেছিলুম, কী করে দিদির কাছে যেতে পারব, কী করে দেখব একবার দিদিকে।'

'এখন টাকা পেয়ে মনে হচ্ছে বুঝি, গিয়ে আর কাজ নেই?' ছেলেটি হাসল।

কানাই দৃঢ় গলায় বললে, 'টাকা যখন পেলুম না, ভেবেছিলুম হেঁটেই যাব। বেশ তো, বিশ্বাস না হয়, টাকা আপনার ফিরিয়ে নিন।'

'নিচ্ছি।' ছেলেটি হাসল, বললে, 'কিন্তু তার বদলে যদি তোমাকে পনেরটা টাকা দিই, তা হলেই খুব ভাল হয়। তাই নয়?'

'কক্‌খনো না।' কানাই প্রতিবাদ করে উঠল: 'যেটুকু আমার দরকার, যেটুকু আমার না হলেই নয় ততটুকুই আমি চেয়েছিলুম। তার একতিল বেশি নয়। এই টাকা থেকে এক টাকা এগারো আনা পয়সা আপনি নিয়ে নিলেই বরং ভাল হয়। দিদিকে যদি তারা আসতে দেয়, ভাড়াও জোগাড় করে দেবে। আর যদি না দেয়, আমি পায়ে হেঁটেই ফিরে আসব।' বলতে-বলতে চোখ তার আবার ভিজে উঠল।

'বেশ, যা দিয়েছি তাই তুমি নাও।' বলে ছেলেটি দ্রুত পা ফেলে চোখের বাইরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

অন্তর্যামী ছাড়া আর যে এই দৃশ্যটি দেখেছে সে কানাইয়েরই পাড়ার ছেলে, এক বস্তিতে থাকে, সমবয়সী—নাম অধর। একটু নিরিবিলি হলেই কানাইয়ের কাছে সে এগিয়ে এল, চোখ টিপে বললে, 'খুব বাগিয়েছিস যা-হোক! এখন বখরা দে।'

'বখরা মানে! এ আমি চুরি করেছি নাকি!'

'চুরি, নয়ত ভিক্ষে করেছিস। ও একই কথা। খেটে তো আর রোজগার করিসনি!'

'দে না খাটতে। কে বা তখন চুরি করে, কে বা বা তখন ভিক্ষে চায়!'

'খাটতে চাস, ক-টাকায় খাটবি শুনি?'

'যা দিবি, তাইতেই। ধর দশ টাকা।' কানাই হাসল।

'আব্দার! দশ টাকা! দশ টাকা কখনো দেখেছিস একসঙ্গে?' অধর টিটকিরি দিয়ে উঠল—যেন সে কতই দেখেছে। বললে, 'ফাজলামো করিস নে, পাঁচ টাকা দেব মাইনে। কী, রাজি আছিস?

'এই মুহূর্তে।' দীপ্ত চোখে কানাই বললে।

'দিলে কী খাওয়াবি বল্?'

'কী খেতে চাস?'

'তেলে-ভাজা জিলিপির বেশি কোন দিন উঠতে পারিনি। যদি খাবই গোটা-চারেক রাজভোগেই রাজভোগ করব।'

'সে আর বেশি কী!' পরম উদারতায় কানাই বললে।

'তবে চল দোকানে, এক্ষুনি।' অধর তার হাত ধরে টানতে শুরু করলে।

'তার মানে? মাইনে কই?'

'মাইনে ওই তোর হাতের মুঠোয়—করকরে পাঁচ টাকার নোট—এক মাসের পুরো মাইনে।' অধর বিস্ফারিত চোখে বললে, 'কথা দিয়েছিস কানাই, খেলাপ করবি তো মুখ পচে যাবে।'

'কক্ষনো আমি অমন কথা দিইনি।' কানাই হাত ছাড়িয়ে নিল, রুখে উঠে বললে, 'মুখ পচে যাবে তোর, তুই মিথ্যে কথা বলেছিস!'

'আমি মিথ্যে কথা বলেছি?' অধর হঠাৎ কানাইয়ের মুখে এক চড় কষিয়ে দিল। বললে, 'চোর কোথাকার, পকেটে হাত ঢুকিয়ে ব্যাগ চুরি করিস, তুই আবার অন্যকে মিথ্যাবাদী বলতে আসিস!'

'তবু মিথ্যে কথা বলিনি!' হাতের মুঠো না খুলে কানাইও এক ঘুসি বসিয়ে দিল।

চলল খানিকক্ষণ হুটোপুটি, এবং অধরের ঐকান্তিক আগ্রহ সত্ত্বেও কানাই তার মুঠো খুলল না। যে রাগ এতক্ষণ রুদ্ধ হয়ে ছিল, এখন এই অতর্কিত আক্রমণে তা উদ্বেলিত হয়ে উঠল, এক লাথিতেই অধর একেবারে মাটি নিলে। বুঝল মারামারি করে সুবিধে করতে পারবে না।

গা থেকে ধুলো ঝেড়ে অধর উঠে দাঁড়াল এবং হাসিমুখে এমন একখানা ভাব করল যেন এ-সব যাত্রার অভিনয় হচ্ছে। বললে, 'আমাকে না খাওয়াস নাই খেলাম। কিন্তু আমার ছোট বোন গোলাপিকে চারটে পয়সা দিবি !'

ছোট বোন ! কানাইয়ের সমস্ত রাগ যেন জল হয়ে গেল। বললে, 'কেন তার কী হয়েছে !'

'তার ঘোরতর জ্বর। তার জন্যে সাবু আর মিছরির দরকার। কিনতে মা চারটে পয়সা দিয়েছিল, পথে কোথায় হারিয়ে গেছে।'

'দেব। কিন্তু সত্যি কথাই বল, কী করেছিস পয়সা দিয়ে ?'

ঢোক গিলে অধর সত্যি কথাই বললে, 'জিলিপি কিনে খেয়েছি।'

রুগ্ন ছোট বোনের পথ্যের চেয়ে যার কাছে নিজের জিহ্বাটা বড় তার সঙ্গে কথা বলতেও কানাইয়ের ইচ্ছে হচ্ছিল না, তবু সে বললে, 'নোটটা আগে ভাঙাই।'

'চল্ সভারাম কারিগরের কাছে, ওর ফতুয়ার পকেটে অনেক টাকা। কিন্তু এমন হুঁসিয়ার,' অধর চোখ টিপল, 'শত গরমেও গা থেকে ফতুয়াটা কিছুতেই খুলে রাখবে না।'

কারখানার এক কোণে বসে সভারাম নাকের ডগায় সুতোবাঁধা চশমা এঁটে কিসের হিসেব কষছিল, কানাই তার সামনে নোটটা মেলে ধরে বললে, 'পাঁচটা টাকা দিতে পারেন !'

সভারাম চশমার উপর দিয়ে বিস্মিত দৃষ্টি প্রসারিত করে ধরল।

'বাটা পাবে হে মেসো, বাটা পাবে।' পিছন থেকে অধর হেসে উঠল।

'না, বাটা পাবেন না, পাই পয়সাটিও আমার দরকার।' কানাই আঙুলে করে নোটটা নাড়তে লাগল। বললে, 'চারটে আস্ত টাকা, আর এক টাকার রেজকি চাই।'

'রেজকি দিয়ে একটা থ্যাট দিতে হবে।' বললে অধর। 'তুমিও চলে এস না মেসো, লুটের টাকা হরির লুটে বেরিয়ে যাবে।'

সভারাম হঠাৎ কানাইয়ের হাত চেপে ধরল। বললে, 'এ টাকা কোথায় পেলি শুনি ?'

কানাই হাত ছাড়িয়ে নিতে গেল, পারল না। তেজি গলায় বললে, 'যেখান থেকেই পাই না কেন, আপনার তাতে কাজ নেই। ভাঙানি দিতে পারবেন কি না তাই বলুন।'

'কোথায় পেয়েছে রে টাকাটা ?' সভারাম অধরকে জিগগেস করলে।

'আর কোথায় !' অধর হেসে উঠল। 'বটগাছের তলায় হাঁ করে দাঁড়িয়ে ছিল, বটগাছ পাতা না ফেলে একখানা পাঁচ টাকার নোট ওর মাথার উপর ফেলে দিলে।'

'সত্যি করে বল !' সভারাম গর্জন করলে।

'সত্যি কথাই তো বলছি। আমরা দুজনে পুকুরে স্নান করছিলাম, প্রায় মাঝ-পুকুরে। বাজি ধরলাম ডুব দিয়ে কে মাটি তুলতে পারে ! দিলাম দু-জনে ডুব, আমি তুললাম মাটি আর ও তুলল পাঁচ টাকার শুকনো একখানা নোট।' অধর হি-হি-হি করে হেসে উঠল।

কানাইয়ের হাতে প্রবল চাপ দিয়ে সভারাম বললে, 'বড়-সাহেবের পকেট থেকে চুরি করেছিস বুঝি ?'

'বেশ করেছি। হাত ছেড়ে দিন বলছি !' কানাই আরেকবার দুর্বল চেষ্টা করলে।

'তবে এই যে শুনলাম পকেট থেকে কিছু সরাতে পারেনি !'

অধর আবার হেসে উঠল। বললে, 'তুমি ভুল করছ মেসো, পকেট থেকে কে বললে ?' বড় সাহেবের একেকটা ঘুসি একেকটা টাকা হয়ে ওর হাতে পড়ছিল। দেখ নি তো, বড়-সাহেব মোটমাট ওকে পাঁচটা ঘুসি মেরেছিল।'

'চল না, তোমাকে পঞ্চাশ টাকা পাইয়ে দিচ্ছি।' বলে সভারাম হিড়-হিড় করে টানতে টানতে কানাইকে সাহেবের খাসকামরায় এনে হাজির করলে।

সাহেব কতগুলো কি কাগজ-পত্র দেখছিলেন, চোখ তুলে অবাক হয়ে গেলেন। বললেন, 'এ আবার কী হল ?'

'দেখুন ছোঁড়ার হাতে পাঁচ টাকার এই নোট।' সভারাম বীরত্বের ভঙ্গিতে বললে, 'শুনেছিলাম আপনার পকেট থেকে কিছুই নাকি সরাতে পারেনি। কিন্তু নিশ্চয়ই কোথাও ভুল হয়েছে। ব্যাগটা ভাল করে দেখুন দিকি !'

বড়-সাহেব ও ম্যানেজার যুগপৎ তাঁদের পকেট থেকে ব্যাগ বের করে সদর অন্দর সবগুলো কামরা তীক্ষ্ণ চোখে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। বড়-সাহেব বললেন, 'না, কিছু খোয়া গেছে বলে তো মনে হয় না। তোমারটা কী বলে হে ম্যানেজার ?'

ম্যানেজার মাথা চুলকে আঙুলের কড় গুণে দাঁতে পেন্সিল ঠেকিয়ে অনেকক্ষণ চিন্তা করে বললে, 'মোটের উপর কত ছিল আর কত না ছিল ঠিক কিছু মনে করতে পারছি না।'

'কোথায় পেলি এ টাকা ? কার পকেট থেকে চুরি করেছিস ?' বড়-সাহেব হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন।

কানাই স্থির গলায় বললে, 'চুরি ছাড়া আর বুঝি আমাদের কোনোই পথ নেই !'

'কোথায় পেয়েছিস তাই বল না।' সভারাম কানাইয়ের হাতে একটা মোচড় দিল।

'মোটের উপর পেলি কোথায় ?' ম্যানেজার তার বাইসিকেলের হ্যাণ্ডেলদুটোতে দু-বার হাত বুলিয়ে নিল : 'স্বপ্নে তো আর পাসনি !'

'হ্যাঁ, স্বপ্ন, স্বপ্নেই পেয়েছি।' বললে কানাই।

'পাগলের ছেলে পাগল !' সভারাম ভেংচিয়ে উঠল : 'দিনের বেলা জেগে-জেগে তুই স্বপ্ন দেখিস নাকি ?'

'প্রায় সেটা স্বপ্নই।' কানাই বলতে লাগল : 'কলতলায় মুখ ধুচ্ছিলাম, হঠাৎ কে একজন আমার সামনে এসে আমার হাতে এই নোটটা গুঁজে দিলে।'

'মিথ্যে কথা!' সাহেব মেঘনিনাদ করে উঠলেন: 'একে এক্ষুনি থানায় নিয়ে যেতে হয়, সভারাম। ম্যানেজার, তুমি যাও ওকে সঙ্গে করে, পুলিশে হ্যাণ্ড-ওভার করে দিয়ে এস। লোকের আর খেয়ে-দেখে কাজ নেই, এক-আধ পয়সা নয়, জলজ্যান্ত পাঁচ-পাঁচটা টাকা ওর হাতে দিয়ে গেল! বলি কলিকালে দাতাকর্ণটি কে!'

'তাকে চিনি না বাবু, কোনোদিন দেখিনি! সাহেবি পোশাক পরা—'

'দেখাচ্ছি তোমাকে সাহেবি পোশাক। কই, ওঠ,' সাহেব ম্যানেজারকে লক্ষ্য করলেন, 'তুমি না উঠলে তো আমাকেই নিয়ে যেতে হয়। ডাক আমার সোফারকে। চুরি, আমারই আপিসে চুরি!'

'না বাবা, চুরি নয়। আমিই ওকে দিয়েছি ঐ নোটখানা।' পর্দা সরিয়ে সমীর এসে ঘরে ঢুকল, বললে, 'একটুও মিথ্যে বলে নি।'

নিশ্বাসের শব্দ শোনা যায়, মুহূর্তে এমন স্তব্ধ হয়ে গেল সেই ঘর। সভারামের হাত খসে পড়ল, ম্যানেজারের মুখটা লম্বা হয়ে গেল আর সাহেব শিথিল হয়ে তাঁর চেয়ারে বসে পড়লেন।

কানাই চেয়ে দেখল—তার স্বপ্নের সেই দেবদূত।

ক-টা দিন সমীরের কলেজে ছুটি যাচ্ছিল, তাই সে বাবার পরামর্শে তাঁরই সঙ্গে সঙ্গে কারখানায় আসা-যাওয়া করছে কাজকর্ম সম্বন্ধে আস্তে আস্তে আগ্রহান্বিত হবার জন্যে। এমনি ছুটি পেলেই সে আসে, এখানে-ওখানে ঘুরে ফিরে এটা-ওটা নেড়ে-চেড়ে সমস্তটা দিন উত্তেজনার মধ্যে কাটিয়ে দেয়। সিনেমা বা থিয়েটার, ফুটবল বা ক্রিকেটের চেয়ে এই কারখানাটা তার কাছে বেশি রোমাঞ্চকর মনে হয়। যেন স্থলের উপরে প্রকাণ্ড একটা জাহাজ চলেছে। ও আছে দাঁড়িয়ে, কিন্তু ওরই ইসারায় ডাঙায় চলেছে ট্রেন, সমুদ্রে চলেছে জাহাজ, এক বন্দর থেকে আরেক বন্দরে। কী ভাল লাগে সমীরের এর গর্জন শুনতে—সমুদ্রের গর্জনের চেয়েও ভয়ঙ্কর! কী করে সুইচ টিপলেই স্তব্ধ এর হৃৎপিণ্ডটা সহসা উজ্জীবিত হয়ে ওঠে, কোথায় কী সূক্ষ্ম কলকব্জা, কী করে

দেখতে দেখতে কাঁচা মাল থেকে বেরিয়ে আসে কাঁচা পয়সা, সব মিলিয়ে যেন একটা অতিকায় বিস্ময়। একবার এলে আর শিগগির ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না। রক্তে যেন নেশা ধরে।

কিন্তু এখনকার বিস্ময় তার তত নয় যত বড়-সাহেবের। তিনি ছেলেকে আপাদমস্তক একবার নিরীক্ষণ করলেন। বললেন, 'ওকে এই টাকাটা দেবার কী দরকার ছিল?'

সমীর চুপ করে রইল, সন্তোষজনক কোন উত্তরই যেন খুঁজে পেল না।

'জান, ও চুরি করতে এসেছিল?'

'জানি।'

'তবে দিলে যে বড়? চোরের প্রতি এত করুণা!'

'করুণা করতে হলে চোরকেই তো করা উচিত।' সমীর ভয়ে-ভয়ে বললে।

'তার মানে, চুরি করাকে প্রশ্রয় দেয়াই তুমি ঠিক মনে কর!'

'আমার তো মনে হয় এই টাকা ওকে দিলুম এই থেকেই ওর চরম শিক্ষা হয়ে যাবে, প্রহার বা পুলিশের চেয়ে বড় শিক্ষা। জীবনে আর ও কোনদিন চুরি করবে না।' সমীর একবার বাপের দিকে আরেকবার কানাইয়ের মুখের দিকে ভীত ও করুণ চোখে তাকাল। বললে, 'আমার মাস্টার-মশায় তো বলেন বিশেষ কতগুলো অবস্থার সমন্বয়েই লোকে অপরাধ করে, সেই অবস্থাগুলো দূর করে দিলেই অপরাধ করার আর প্ররোচনা থাকে না।'

'আচ্ছা'—সাহেব গম্ভীর হয়ে গেলেন। কাগজ-পত্র গুছিয়ে রাখতে রাখতে বললেন, 'চল, আর নয়, এখন বাড়ি যাব।'

শোফার গাড়ি নিয়ে এল। বড়-সাহেব আর সমীর পাশাপাশি বসলেন, গাড়ি ছেড়ে দিল। সমস্ত রাস্তা কেউ কাকে আর একটাও প্রশ্ন করল না।

তিন

কারখানা থেকে কলকাতা মিনিট পঁচিশের রাস্তা। বাড়ি এসেই নিচে পড়ার ঘরে ঢুকে সমীর দেখল আদিত্য তার জন্যে বসে আছে। যেখানে একটা পিঠ-তোলা বেঞ্চিতে অনেকগুলি বই-খাতা টাল করে ফেলা, তারই একধারে অত্যন্ত কুণ্ঠিত হয়ে আদিত্য বসে।

ঘরের চেহারা দেখে মনে হয় না কী প্রকাণ্ড বাড়ির সেটা ঘর, এবং যার সেটা ঘর, কত বড় বিত্তের সে উত্তরাধিকারী। মাঝখানে প্রকাণ্ড একটা টেবিল, মুখোমুখি দুই দেয়ালে দুটো লম্বা আলমারি। যেমন শোনায় তেমন দেখায় না। সব কেমন বিশৃঙ্খল, অপরিচ্ছন্ন। কেবল বই আর বই আলমারিতে, টেবিলে, মেঝেয়, এখানে সেখানে। পাছে তার বইয়ে কেউ হাত দেয় সেই ভয়েই বোধহয় চাকর-বাকরকে সে ঘরে ঢুকতে দেয় না। ঘরটা যেমন ছন্নছাড়া তার মালিকটিও তেমনি ছন্দহীন।

আদিত্য এতক্ষণ বসে আছে এ যেন তারই অপরাধ এমনি ভাবে সমীর বললে, 'ও! অনেকক্ষণ তোমাকে বসিয়ে রেখেছি। হেঁটে এসেছ নিশ্চয়ই, আর নিশ্চয়ই কিছু খাও নি। বোস,' সমীর তার গায়ের কোটটা খুলে ফেলল, 'আমিও এক্ষুনি খাব।'

ড্রয়িং-রুমের পাশেই এই পড়ার ঘর। ড্রয়িং-রুম দিয়ে চামেলি তখন গাড়ি-বারান্দায় যাবে, দেখলে দাদার ঘরে দাদা আর তার বন্ধু।

তক্ষুনি অস্ফুট স্বরে নাকে কাঁদতে-কাঁদতে বাড়ির ভিতরে সে ফিরে গেল। তার মা কনকলতা ভিতরের দালানে বসে লেস বুনছিলেন, মেয়েকে ফিরে আসতে দেখে অবাক হয়ে গেলেন। বললেন, 'সেকি ফিরে এলি যে?'

চামেলি তেমনি নাকে কাঁদতে-কাঁদতে বললে, 'দাদার ঘরে আজ

সেই অযাত্রাটা বসে আছে। আজ আমার গলা ঠিক ভেঙে যাবে। আমি যাব না, ককখনো যাব না।'

কনকলতা ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন না। বললেন, 'কে অযাত্রা?'

'দাদার সেই মিনিমুখো বন্ধুটা। কে এক মোটর ড্রাইভার না ছুতোর মিস্ত্রির ছেলে। উঃ, অ-ফুল! দাদা যে কী করে ঐ সব ছোটলোকের সঙ্গে মেশে ভাবতে মাথা ঘুরে যায়। চুল কাটে না, নখ কাটে না, ধোয়া জামার সঙ্গে কোরা কাপড় পরে, আর ফতুয়া পরে মনে করে শার্ট পরেছি। হিডিয়াস!' চামেলি দুই হাতে নানারকম নাটকীয় ভঙ্গি করলে।

কী যেন একটা আতঙ্কের কথা শুনছেন কনকলতা মুখ-চোখের তেমনি চেহারা করলেন। বললেন, 'কী করেছে ও?'

'করবে আবার কী! সেদিন যখন রেডিয়োতে গান দিতে যাই, ঐ হনুমানটার মুখ দেখে যাই। ফলে, গানটা ম্যাসাকার হয়ে গেল। আজ যাচ্ছি, আজ আবার সেই!' চামেলি মেঝের উপর জুতো ঠুকতে লাগল।

কনকলতা বিরক্ত হয়ে বললেন, 'বাঁদরটা এখানে আসে কেন?'

'ভিক্ষে করতে আসে। দাদার সঙ্গে পড়ে এই আস্পর্ধায় আজ এসে চায় বইয়ের দাম, কাল কলেজের মাইনে, পরশু বাজার-খরচ। আর দাদাও হচ্ছে কল্পতরু, পকেট-কাটার পরিশ্রমও কারুর করতে হয় না। হরিব্‌ল্! বেছে-বেছে এইসব নোংরা কুচ্ছিত লোকগুলির সঙ্গে কী করে ও মেশে, পাশে বসে কথা কয়, ভাবতেও আমার গা শিরশির করে ওঠে। টেরিব্‌ল্!'

'দাঁড়া, সমীরকে ডেকে আনছি। আর ঐ স্কামটাকে দিচ্ছি তাড়িয়ে।' বলে কনকলতা মিহি, মাজা গলায় ডাক দিলেন: 'বেয়ারা!'

উর্দি-পরা বেয়ারা এসে দাঁড়াল। কনকলতা গম্ভীরমুখে বললেন, 'দাদাবাবুকে খবর দাও তার খাবার তৈরি।'

চামেলি আবার আনুনাসিক প্রতিবাদ শুরু করল : 'কতক্ষণ দাঁড়াব আনি? ততক্ষণে আমার সমস্ত স্নো-পাউডার ভ্যানিশ করে যাক!' কব্জির ঘড়ির দিকে তাকিয়ে পরে বললে, 'লর্ড! সময়ও বেশি নেই!'

বেয়ারা ফিরে এসে বললে, 'দাদাবাবুর কাছে কে এসেছে, বললেন খাবারটা তাঁর পড়ার ঘরে পাঠিয়ে দিতে।'

'খবরদার পাঠিয়ো না, মা!' চামেলি ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, 'খাবারের প্লেট দেখলে হনুমানটা আর উঠতে চাইবে না।'

মেয়ের মতেই মায়ের মত। বেয়ারাকে উদ্দেশ করেই কনকলতা ধমকে উঠলেন। চড়া গলায় বললেন, 'পড়ার ঘরে জঞ্জালের মধ্যে বসে ভদ্রলোক কেউ খায় নাকি? আর খায় তো, যার-তার সামনে বসে কেউ খায়? দাদাবাবুকে গিয়ে বল, ডাইনিং রুমে টেবিলে খাবার দেওয়া হয়েছে।'

ভ্যানিটি-কেস থেকে ভাঁজ-করা রুমাল বের করে চামেলি তার ঠোঁটে চোখের পাতায় ও চিবুকের নিচে মৃদু-মৃদু চাপ দিতে লাগল। বললে 'ড্যাশ্ ট্ নন‌সেন্স!'

কনকলতা বললেন, 'চলে গেছে নিশ্চয়ই। সাড়াশব্দ পাচ্ছি না আর। যেই শুনেছে খাবার জুটবে না অমনি সটকেছে!' বলে নিজের মনেই হেসে উঠলেন। মেয়েকে বললেন, 'এখন একবার ছাখ-দেখি উঁকি মেরে। নিশ্চয়ই নেই।'

সাহসে ভর করে চামেলি ড্রয়িংরুমের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। উঁচু গলায় ডাকল, 'দাদা!'

পড়ার ঘর থেকে সমীর উত্তর দিল : 'কেন?'

'তোমার সেই ছুঁচোমুখো বন্ধুটা এখনো ওখানে বসে আছে?'

মুহূর্তের জন্যে সমীরের মুখ লাল হয়ে উঠল। পরে স্বাভাবিক গলায় উচ্ছ্বসিত হেসে উঠে সে বললে, 'ও! তুই রামহরির কথা বলছিস? সে তো কখন চলে গেছে। এখন যে আমার ঘরে বসে আছে সে তো আদিত্য।'

নিঃশঙ্ক পা ফেলে চামেলি সোজা অগ্রসর হল। আর তক্ষুনি, হঠাৎ, আদিত্যের সঙ্গে তার ভীষণ চোখাচোখি হয়ে গেল। 'ইডিয়ট, ফুল্, স্টুপিড!' দাঁতে দাঁত ঘষে চামেলি আবার ফিরে এল ভিতরে। মাকে বললে, 'ডালার্ডটা এখনো বসে আছে। আমার যাওয়া আজ আর হল না। আমি ফোন করে দিই।' বলে সে সোজা উপরে উঠে গেল।

নিচে থেকে কনকলতা চেঁচিয়ে উঠলেন, 'বলিস কী পাগলের মত! অমন একটা বিউটিফুল প্রোগ্রাম তুই মাটি করে দিবি নাকি? দাঁড়া, আমি দিচ্ছি ওটাকে তাড়িয়ে। রাগ করে সাজ-গোজ সব নষ্ট করে ফেলিস নে।' বলে তিনি ড্রয়িং-রুমের দরজার কাছে এসে সমীরের পড়ার ঘরের উদ্দেশে ডাক দিলেন: "সমীর! তোমার ঘরে যে ভদ্রলোক বসে আছে তাকে চলে যেতে বল।'

একতাল কাদার মত কথাটা সমীরের গায়ে এসে পড়ল। ব্যাপারটা সে বুঝতে পেরেছিল শুরুতেই, কেননা যেদিন চামেলির গানটা সেই 'ম্যাসাকার' হয়েছিল সেদিনের শোকাকুল ইতিহাস আজও তার স্পষ্ট মনে আছে। 'মোটের উপর'-মামাবাবু পর্যন্ত সায় দিয়েছিলেন, 'যা ভীষণ মুখ, আমার চোখের সামনে পড়ে টায়ার ফাটিয়ে আমার গাড়ি না একদিন উলটিয়ে দেয়!'

মার কথায় রাগ হলেও সমীর সেটা গোপন করলে। তরল গলায় বললে, 'সামান্য আরেকটু দেরি আছে, মা। বেয়ারাকে মোড়ের দোকানে খাবার আনতে পাঠিয়েছি, ও এলেই আমরা যাব। কেননা ঘরে ভদ্রলোক শুধু আদিত্য নয়, আমিও।'

'তবে বলতে চাস চামু আজ রেডিয়োতে গান দিতে যাবে না?' কনকলতা ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন।

'যাবে বৈকি, গাড়ি আমি পাশের রাস্তায় নিয়ে যেতে বলেছি। ইচ্ছে করলে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়েই ও গাড়ি পেতে পারবে।'

কনকলতাও উপরে উঠে গেলেন। ভেবেছিলেন মেয়ে বুঝি

সাজসজ্জা খুলে ফেলে ধূলিশয্যা নিয়েছে, কিন্তু দেখলেন ব্যাপারটা তত ঘোরালো হয়নি। শুধু, ড্রেসিং-টেবিলের সামনে বসে ঘোরালো করে আরেক পোঁচ পাউডার সে মুখে ঘষছে। আয়নায় মার ছবি দেখতে পেয়ে ঘাড় না ফিরিয়েই চামেলি জিজ্ঞেস করলে, 'কী মা, তাড়াতে পারলে ?'

বিরস মুখে কনকলতা বললেন, 'গাড়ি পাশের গলিতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। তোকে পেছনের দরজা দিয়ে বেরুতে হবে।'

'ইমপসিবল্।' হাতের পাফটা মেঝের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চামেলি লাফিয়ে উঠল। তীব্রকণ্ঠে বললে, 'আমি চোরের মত পেছনের দরজা দিয়ে বেরুব ? আমারই নিজের বাড়ি থেকে ? হোয়াট ডু ইউ মীন্!'

এমনি সময় পাশের বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলেন বড়-সাহেব, বাড়িতে যিনি চন্দ্রচূড় চক্রবর্তী। পরনে গেরুয়া-রঙের সিল্কের লুঙ্গি, খালি গায়ে ঝোলানো পৈতে, পায়ের চটিটা শুঁড়-তোলা। তৈল-চিক্কণ নধর ভুঁড়িটি তাঁর ঘৃতপক্ক আভিজাত্যের একটি জয়ডঙ্কা।

'ব্যাপার কী ?' চন্দ্রবাবু বিরক্ত মুখে জিগগেস করলেন।

খানিকটা নাকি সুরে ও খানিকটা নাটকীয় সুরে ব্যাপারটা চামেলি বিশদ করে দিল। যত সব গরিব ছোটলোকদের সঙ্গে মিশে ছেলে যে দিন-দিন নরকে নেমে যাচ্ছে তার একটা ভীতিজনক বর্ণনা দিলেন কনকলতা।

প্রথম থেকেই চন্দ্রবাবুর মেজাজটা ক্ষেপে ছিল, কারখানার সেই ঘটনার থেকে। এখন যেন এতটা সহ্য হল না! এত বড় লোকের ছেলে হয়ে এত বড় তার অধঃপতন। চক্রবর্তী সাহেব দু-চোখে ধূ-ধূ মরুভূমি দেখলেন। সেই অবস্থাতেই নেমে গেলেন নিচে, সোজা হাজির হলেন সমীরের পড়ার ঘরে।

এমন দৃশ্য দেখবেন চন্দ্রবাবু সশরীরে কল্পনা করতে পারতেন না। বইয়ের গাদার মধ্যে, মেঝের উপর, খবরের কাগজ বিছিয়ে, সমীর আর

কে-একটা কদাকার ছেলে মুখোমুখি বসে একই ঠোঙার থেকে খাবার তুলে তুলে খাচ্ছে—আর কী তাদের নির্বারিত হাসি! চন্দ্রবাবু এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইলেন, এদের ক্ষুধা দেখে তত নয়, যত খাদ্য দেখে। হিঙের কচুরি আর বোঁদে। খাদ্যটা এ বাড়ির পক্ষে দুঃসহ। স্বাস্থ্য-হানির ভয় নয়, মর্যাদাহানির ভয়।

'এ কে?' চন্দ্রবাবু তাঁর ডান হাতের বুড়ো আঙুল বেঁকিয়ে অবজ্ঞার ভাবে আদিত্যকে নির্দেশ করলেন।

দুজনেরই গলার মধ্যে খাবার আটকে গেল। প্রাণপণে ঢোক গিলে উঠে দাঁড়াল দু-জনে—সমীরের দেখাদেখি আদিত্য। শার্টের গুটোনো হাত ও পেণ্টালুনের গুটোনো পা নামিয়ে দিয়ে সমীর তার চেহারায় শিষ্টতা আনলে। বললে, 'এ আমার বন্ধু।'

বাঁকা তীক্ষ্ণ চোখে চন্দ্রবাবু আদিত্যকে পর্যবেক্ষণ করলেন। বললেন, 'তোমার অদৃষ্টে এমন সব অপরূপ বন্ধু জুটছে কবে থেকে?'

কথাটার মধ্যে প্রচ্ছন্ন যে ঘৃণা ছিল, সেটা সমীরকে বিদ্ধ করল। আদিত্যর চেহারায় ও পোশাকে যে দারিদ্র্য আঁকা আছে সেটাই বাবার চক্ষুশূল। তাই অত্যন্ত কুণ্ঠিত হয়ে সে বললে, 'বন্ধু মানে, আমার সঙ্গে এক কলেজে, এক ক্লাশে পড়ে—তাই—'

'কলেজে পড়ে তো বাড়িতে কী?' চন্দ্রবাবু রুখে উঠলেন: 'এক-সঙ্গে পড়ে বলে একসঙ্গে খেতে হবে নাকি? আর, ডাস্টবিনের ঐ ছাই-পাঁশ ছাড়া তোমার অদৃষ্টে খাবার জোটে না আজকাল?'

এ-সব কথার উত্তর নেই।

সুতরাং, চন্দ্রবাবু আদিত্যকে নিয়ে পড়লেন। ওর সঙ্গে কথা বলাটা যে কত বড় ঘৃণার কাজ সেই ভাব মুখে ফুটিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন ওর বাবা কী করে, কোথায় থাকে, কত মাইনে পায়। আদিত্যর পিতৃ-পরিচয়টা চন্দ্রবাবুকে উদ্দীপিত করতে পারল না, কেননা তার বাবা বাঙলা এক দৈনিক কাগজের প্রেসের কম্পোজিটর, যেখানে তারা

থাকে সেখানে আলো বাতাস নির্বাসিত, আর যা মাইনে তার চেয়ে বেশি সমীর শুধু পকেট-খরচই পেয়ে থাকে।

'সমস্ত কলেজ থেকে এই রত্নটিকেই শুধু আবিষ্কার করতে পেরেছ!' চন্দ্রবাবু কুটিল দৃষ্টিক্ষেপ করলেন। 'কেন, স্যর নরেনের ছেলেরা আজকাল আসে না? ওয়াই-এম-সি-এর টেবল-টেনিস কি উঠে গেছে? জস্টিস ভাদুড়ির ভাগ্নে তোমার পার্টনার ছিল না ডাব্‌ল্‌সে? ও-সব ছেড়ে দিয়ে শেষকালে কিনা এ-সব!'

'বাবা, এবার আমি যেতে পারি?—লাইন ক্লিয়ার?'

পেছনে চামেলির গলা শুনে চন্দ্রবাবু চমকে উঠলেন। 'একী, তোমার পড়ার ঘরের দরজায় পর্দা নেই! ম্যানেজার!' কোন কিছু বিপদপাত হলেই চন্দ্রবাবু তাঁর গুম্ফবান ম্যানেজারের শরণাপন্ন হন, কিন্তু এবার কোন সাহায্য এল না, কেননা ম্যানেজার এখনো বাড়ি ফেরে নি। পর্দা যখন নেই, তখন দরজাটাই তিনি সবেগে বন্ধ করে দিলেন। বললেন, 'ভিখিরির মতো মাটিতে বসে খাচ্ছ, এ-দৃশ্যটা সবাইকে না দেখালে ক্ষতি কী? দরজাটা বন্ধ করে দিতে পার না?' পরে অনুপস্থিত কাকে সম্বোধন করে বললেন, 'এবার চলে যা।'

খুর-তোলা জুতোয় খট্‌-খট্‌ আওয়াজ করতে-করতে দৃপ্ত ভঙ্গিমায় চামেলি বেরিয়ে এল। চৌকোটের ওপারে দাঁড়িয়ে মৃদু রেখায় একটু হাসলেন কনকলতা।

পরক্ষণেই তেমনি সবেগে চন্দ্রবাবু ঘরের দরজা খুলে দিলেন। আদিত্যর মনে হল, যেন তাকে এক্ষুনি চলে যেতে বলা হচ্ছে। সে এখানে নিতান্ত খাপছাড়া, নিতান্ত অশোভন।

'এবার তবে আমি যাই।' কোঁচার খুঁটে সন্তর্পণে হাত মুছতে-মুছতে সে বললে। ভীত চোখে তাকাল একবার চন্দ্রবাবুর স্ফীতগুম্ফ রোষগম্ভীর মুখের দিকে।

'যাবে?' সমীর চঞ্চল হয়ে উঠল, ট্রাউজারের পকেটে রুমাল না পেয়ে খবরের কাগজেই হাত-মুখ মুছে সে বললে, 'হ্যাঁ, কিন্তু দাঁড়াও

তোমার টাকাটা নিয়ে যাও।' বলে ছাড়া কোটের পকেট থেকে মনিব্যাগ বের করলে, সহজ গলায় বললে, 'খুচরো আজ আর নেই। এই পাঁচটা টাকাই নাও।' বলে পাঁচ টাকার একখানা নোট সে বাড়িয়ে ধরল।

দ্বিধাজড়িত গলায় আদিত্য বললে, 'অত আমার দরকার নেই।'

'এখন নেই, কিন্তু পরে হতে কতক্ষণ? বাড়তিটা তোমার কাছে আগানত রইল।'

'না না, বইয়ের দাম তো মোটে সাড়ে তিন টাকা, অত আমি নেব কেন? তোমার অসুবিধে হবে।'

সমীর নিঃশব্দে হাসল। বললে, 'কিছু অসুবিধে হবে না। আমার অনেক আছে। যত থাকা উচিত নয়, তার চেয়ে বেশি।' মনিব্যাগের গহ্বরে সে একবার চোখ পাঠাল। 'বেশ তো, বাড়তিটা নিতে তোমার সঙ্কোচ লাগে, টাকাটা ভাঙিয়ে যে-কোন দিন আমাকে দিয়ে দিয়ো।' বলে নোটখানা গুঁজে দিল সে আদিত্যর হাতে। আর আদিত্য ঘর থেকে পালিয়ে গেল ইঁদুরের মত।

'মনি-ব্যাগটা আমাকে দাও।' চন্দ্রবাবু গর্জন করে উঠলেন।

ব্যাপারটা সমীর কিছুই বুঝতে পারল না, আর বুঝতে পারল না বলেই মনি-ব্যাগটা বাপের হাতে সমর্পণ করলে।

'এ-মাসে কত নিয়েছ হাত-খরচ?' প্রশ্ন করেই আত্মবিস্মৃত হয়ে চন্দ্রবাবু পুনরায় হেঁকে উঠলেন, 'ম্যানেজার! ম্যানেজার!' কেউ এল না দেখে পুনরায় তিনি ছেলের সম্মুখীন হলেন। 'কী, কত নিয়েছ? ত্রিশ-চল্লিশ হবে? পঞ্চাশ?'

'হতে পারে।' সমীর নম্র স্বরে বললে।

'কী করেছ টাকা দিয়ে?'

'হিসেব তো কোনদিনই রাখি না। দরকার হয় চেয়ে নিই। আপনিও চান না কোনদিন হিসেব।'

'হিসেব তো রাখ না, কিন্তু কর কী টাকা দিয়ে? এইভাবে বিলিয়ে দাও চারিদিকে?'

'তা দিই মাঝে-মাঝে।' সমীর চোখ নামিয়ে বললে।

'দাও বলতে তোমার লজ্জা করল না? এ কার টাকা তুমি খেয়াল রাখ?'

সমীর মৃদু হেসে বললে, 'কার আবার! আমার টাকা।'

'তোমার টাকা!' এ টাকা তুমি রোজগার করেছ? তুমি চাকরি কর, না ব্যবসা কর?'

'কিছুই করি না, শুধু চেয়ে নিই। আর, যে-ভাবেই হোক টাকা যখন আমার হাতে এসে পড়ে তখন ও আমারই টাকা, আর কারুর নয়!'

'কখনো না!' গলার রগ ফুলিয়ে চন্দ্রবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন: 'ও আমার টাকা।'

'তেমনি আপনার কারখানার কুলি-মজুররাও ভাবতে পারে ও তাদের টাকা।' সরল, স্নিগ্ধ গলায় সমীর বললে, 'কারখানার কুলি-মজুররা দিন-রাত পরিশ্রম করে টাকাটা আপনার হাতে পৌঁছে দিয়েছে, আপনি ভাবছেন আপনার টাকা; আপনার হাত থেকে পেয়ে আমি ভাবছি আমার টাকা; আর আমার হাত থেকে পেয়ে আদিত্য ভাবছে আদিত্যর। আসলে ও কারুরই একার টাকা নয়, ও সকলের।'

'এসব তোমার মাস্টার শিখিয়েছে বুঝি?'

'মাস্টার শেখাবে কেন? এ তো চোখ চেয়ে যে-কেউ বলে দিতে পারে।'

'হুঁ!' চন্দ্রবাবু নাসারন্ধ্রের ভিতর থেকে একটা রোমহর্ষক শব্দ করলেন। বললেন, 'আজ থেকে তোমার হাত-খরচের টাকা বন্ধ। এখন দেখা যাক, টাকাটা কার।' বলে তিনি মনি-ব্যাগটা নিয়ে ঘর থেকে অন্তর্হিত হলেন।

সেই রাত্রে মাস্টারের কাছে সমীর পড়ছে, বেয়ারা এসে খবর দিল উপরে সাহেবের বসবার ঘরে মাস্টার-মহাশয়ের তলব হয়েছে।

কলেজের প্রফেসর, এই বিধুভূষণ দত্ত। ছত্রিশ-সাঁইত্রিশ বয়েস, কিন্তু অকালে বুড়ো হয়ে পড়েছে, রোগে, অভাবে, শারীরিক পরিশ্রমে। রাবণের পরিবার, উপার্জক সে একলা, আর কলেজে সে যা মাইনে পায় তা নিতান্ত নিরুপায় বলেই সে গ্রহণ করে। সংসারের দাবি মেটাবার জন্যে তাই তাকে সকাল-সন্ধ্যায় টিউশানি করতে হয়, বাজারে নোট লিখতে হয়, পরীক্ষার খাতা দেখতে হয়—যত রকম উঞ্ছবৃত্তি। উপায় নেই; শুধু নিজেকে নয়, তার উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এমন বহু লোককে বাঁচাতে হবে।

বেয়ারাকে অনুসরণ করে বিধুভূষণ দোতলায় কোণের ঘরে এসে উপস্থিত হল। দেখল ঘুমন্ত চেয়ারে বসে সামনের টেবিলের উপর পা দুটো প্রসারিত করে চন্দ্রবাবু কড়া চুরুট টানছেন। পাশের চেয়ারে বসে ম্যানেজার কাকে ফোন করছে, ও অন্যপ্রান্তবর্তী লোকটাকে কী বলতে হবে মাঝে মাঝে তারই উপদেশ দিয়ে যাচ্ছেন চন্দ্রবাবু। বিধুভূষণ সে ঘরে ঢুকেছে এটা তিনি নজরেই আনলেন না, বসবার জন্য একখানা চেয়ার নির্দেশ করে দেয়া দূরের কথা, পা দুটো পর্যন্ত গুটিয়ে নিলেন না সম্ভ্রমে। বিধুভূষণ বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে রইল।

ফোন শেষ করে শালা আর ভগ্নীপতি ব্যবসা-সংক্রান্ত কি পরামর্শ করতে লাগলেন নিম্নকণ্ঠে। ঘরে তৃতীয় ব্যক্তি যে কেউ আছে এটা যেন তাঁদের ধর্তব্যই নয়।

অসহ্য, বিধুভূষণের মনে হল—এবং মনে হওয়ামাত্র সে একখানা চেয়ার সবেগে টেনে নিয়ে বসে পড়ল।

পা দুটো হ্রস্ব না করেই চন্দ্রবাবু অবিচলিত কণ্ঠে জিগগেস করলেন, 'ছাত্রকে বুঝি এই শিক্ষা দেন?'

'কী?' বিধুভূষণ নিরুদ্দেশ ভঙ্গিতে চেয়ে রইল।

'আপনি না বলা পর্যন্ত সে দাঁড়িয়ে থাকে, না, আপনার অনুমতির অপেক্ষা না করেই চেয়ার টেনে বসে পড়ে সামনে?' চন্দ্রবাবু বক্র কটাক্ষ করলেন।

'কিন্তু ভুলে যাচ্ছেন, আপনি আমার মাস্টার নন।'

'কিন্তু মনে রাখবেন, আমি আপনার মনিব।' এক ঝটকায় পা দুটো নামিয়ে এনে চন্দ্রবাবু টেবিলের উপর একটা চড় মারলেন, বললেন, 'এক কথায় এক্ষুনি এই মুহূর্তে আমি আপনার চাকরি নিয়ে যেতে পারি, সেটা মনে রাখবেন।'

'তার আগে,' পরিবারের সমস্ত দৈন্য ও মালিন্য উপেক্ষা করে বিধুভূষণ নির্মম গলায় বললে, 'তার আগেই আপনার এই চাকরিতে ইস্তফা দেব, সেটা ভুলে যাবেন না।'

'আহাহা', দুই দিকে দু-হাত ছড়িয়ে দিয়ে ম্যানেজার ঝগড়া থামাতে গেল : 'মোটের উপর ব্যাপার কী?'

'এইখানে বসে আছ, আর দেখতে পেলে না ব্যাপারটা?' চন্দ্রবাবু ম্যানেজারের উপর মুখিয়ে উঠলেন।

নির্লিপ্তের মত বাইসিকেলের হ্যাণ্ডেলে ম্যানেজার হাত বুলুতে লাগল।

'চোখের সামনে দেখলে না ঐ লোকটার আস্পর্ধা? বলি চেন তো ওকে?'

ম্যানেজার যেন সম্বিত ফিরে পেল। স্থির চোখে বিধুভূষণের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে সে লাফিয়ে উঠল। 'চিনি বই কি, আলবৎ চিনি। সমীরের মাস্টারমশাই। সমীর, ওহে সমীর',—ম্যানেজার চেঁচাতে লাগল, 'তোমার মাস্টারমশাই এসেছেন। উপরে আছেন, বই-খাতা নিয়ে উপরেই চলে এস। শিগগির।'

'থাম!' চন্দ্রবাবু ধমক দিয়ে উঠলেন। 'ওর কাছে আর পড়বে কে?'

মুখ-চোখ উদ্বিগ্ন করে ম্যানেজার বললে, 'কেন, সমীরের কি আজ অসুখ করেছে?'

'না, সমীরের জন্যে আমি অন্য মাস্টার রাখব।'

'কেন, ওঁর অপরাধ?' দরজার ও-পাশ থেকে কে বললে।

সবাই অবাক হয়ে চেয়ে দেখল, বই-খাতা হাতে নিয়ে সমীর দাঁড়িয়ে।

'অপরাধ, কেননা দরিদ্র হয়েও গর্বিত ধনীর কাছে ভদ্রতা প্রত্যাশা করেছিলাম। ভেবেছিলাম অত্যধিক অর্থ বুঝি মানুষকে নিস্পৃহ করে, নির্মুক্ত করে। ভুল বুঝেছিলাম। এখন দেখছি, টাকা দিয়ে সবই কেনা যায়, মান আর খোসামোদ,—কিন্তু মনুষ্যত্ব অর্জন করা যায় না।' বিধুভূষণ উঠে দাঁড়াল।

· 'বিষ! বিষ!' চন্দ্রবাবু আর্তনাদ করে উঠলেন, 'এইসকল বিষই কেবল ছেলেটার মাথায় ঢোকানো হচ্ছে! শুধু গরিবের উপর সহানুভূতি, গরিবের জন্য চোখের জল!'

'মোটের উপর একটি পয়সাও যে তাতে খরচ নেই।'

'আলবৎ আছে।' চন্দ্রবাবু টেবিলে আবার চপেটাঘাত করলেন, 'এই কুশিক্ষার ফলে আমার বহু টাকাই অপব্যয় হয়ে যাচ্ছে। এমন শিক্ষা—চোরকে পর্যন্ত মহাপুরুষ ভাবতে হবে, মনে করতে হবে চোরের দোষ নয়, যারটা চুরি হচ্ছে তার দোষ। কী গুণধর মাস্টার! ওঁকে আবার চেয়ার এগিয়ে দেবে! এখানে কেন, একেবারে ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে চেয়ার নিয়ে বস না!'

'আপনি এখান থেকে চলে যান, স্যর!' আকুল কণ্ঠে সমীর মিনতি করে উঠল।

'আহাহা, মাইনেটা নিয়ে যাবেন না?' ব্যস্ত হয়ে ম্যানেজার তার কোটের পকেট হাতড়াতে লাগল।

'ন-দিনের মাইনে একুশ টাকা তখন হিসেব করে তোমাকে দিয়ে দিলুম না?' চন্দ্রবাবু ভুরু কুঁচকোলেন।

'হ্যাঁ, এই যে।' টাকাটা কাগজ-চাপার তলা থেকে বের করে ম্যানেজার বললে, 'এই নিন মশাই আপনার পাওনা। দেখুন, মোটের উপর, মনুষ্যত্বটা আমাদের আছে কি না!'

বিধুভূষণ টাকাটা নিল হাত পেতে।

'এখন আপনি আপনার মনুষ্যত্বের পরিচয় দিন, দুই চক্ষু সার্থক করি। ফিরিয়ে দিন দিকি টাকাটা!' বলে ম্যানেজার নাটকীয় ভঙ্গিতে ভিক্ষুকের মত হাত বাড়িয়ে ধরল : "I am বটকৃষ্ণ, sir. Black without food, sir. Living under a banyan tree, so বটকৃষ্ণ sir, মোটের উপর, very-very hungry, sir. One pice father-mother, sir...'

'দেখুন দিচ্ছি ফিরিয়ে।' বিধুভূষণ কঠিন হয়ে দাঁড়াল। বললে, 'কেন আমাকে যেতে হচ্ছে ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না। চাকরির জন্যে দুঃখ নেই, দুঃখ এমন একটি ছাত্র হারাচ্ছি বলে—'

'আর তার মামা?' ম্যানেজার গোঁফ দুলিয়ে জিগগেস করলে।

'আর, আনন্দ হচ্ছে এই, একজন দাম্ভিক, শক্তিশালী অর্থ-পিশাচের কাছে নিজের মনুষ্যত্বকে এতটুকুও নত করি নি। এই নিন আপনার টাকা!' বলে নোট ক-খানা কুটি-কুটি করে ছিঁড়ে ফেলে টাকাটা টেবিলের উপর সশব্দে ছুঁড়ে দিয়ে বিধুভূষণ ঝড়ের মত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কাছেই ছিল সমীর, সোজা একটা রাস্তা দিয়ে তাকে নামিয়ে নিয়ে রাস্তায় বার করে দিলে।

'ধর, ধর, পাকড়ো, পাকড়ো!' চন্দ্রবাবু চেয়ারে ঘুরতে ঘুরতে চেঁচাতে লাগলেন।

'পুলিশে খবর দিন, রিং করুন থানায়! নম্বর? নম্বর লাগবে না। ফায়ার ব্রিগেড কিম্বা অ্যাম্বুলেন্স বললেই হবে।' বলে ফোনের রিসিভারটা তুলে নিয়ে তা চন্দ্রবাবুর হাতে দিয়ে ম্যানেজার দ্রুত নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল। বলতে-বলতে গেল : 'চোর, চোর, ধর্ ধর্, ঐ ছাদে উঠল, আরে, এই যে সিঁড়ির নিচে!'

রিসিভারটা হাতে নিয়ে চন্দ্রবাবু হাঁ করে বসে রইলেন।

এ-ঘর ও-ঘর ছুটতে-ছুটতে ম্যানেজার চলে এল নিচে ড্রয়িং-রুমে যেখানে কনকলতা রেডিয়ো খুলে দিয়ে তন্ময় হয়ে গান শুনছেন।

'এখানে এসেছে? এখানে? এই সোফাটার তলায়, কিম্বা ঐ আলমারিটার পেছনে?'

'মার্ডার! মার্ডার!' কনকলতা নিচু একটা কৌচে এলায়িত ভঙ্গিতে বসে ছিলেন, হঠাৎ দু-হাত তুলে ক্ষিপ্তের মত চেঁচিয়ে উঠলেন।

ম্যানেজার বাইসিকলের হ্যাণ্ডেলছুটো চোয়াল পর্যন্ত ঝুলিয়ে দিয়ে বিবর্ণ মুখে থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

'ঠিক এ-জায়গাটায় চামু একটা ছোট্ট খোঁচ দিচ্ছে, অমনি পদ্মবনে মত্ত হস্তীর মত উনি দিলেন সব পণ্ড করে! ড্যাশ্ ট্ হোপলেস!' রাগ করে কনকলতা রেডিয়োটা বন্ধ করে দিলেন।

চার

সমীরের মনে হল সে যেন হঠাৎ নতুন পৃথিবীতে এসে জন্ম নিয়েছে। যখনই দেখল পকেটটা তার শূন্য, তখনই মনে হল সসাগরা পৃথিবীর সে অধীশ্বর। সামনে-পিছনে তার জন্য সমস্ত পথ খোলা পড়ে আছে।

গলির মোড় ফিরতেই পরেশদের বাড়ি, খোলার বস্তিতে। কে যেন বলেছিল, ছেলেটার ক-দিন থেকে বাড়াবাড়ি অসুখ যাচ্ছে। কথাটা সে গ্রাহ্যেই আনে নি এতদিন। কার কাছে যেন শুনছিল পরেশের মা তার মার কাছে নাকি পুরোনো কাপড় চাইতে এসেছিল আর তার মা নাকি বলে দিয়েছিলেন, পুরোনো কাপড়ে বাসন কেনা যায়, যাকে-তাকে অমন বিলিয়ে দেওয়া যায় না। সেদিন শুনেও শোনেনি সে-কথাটা। কিন্তু আজ, সবার আগে তার মনে পড়ে গেল পরেশকে।

কোন এক ফ্যাক্টরিতে না মিল-এ পরেশের বাবা কি-একটা ছোট-খাট কাজ করত। ব্যবসা-বাজার মন্দা পড়ায় মালিকদের মুনাফা কিছু কম হচ্ছিল বলে চাকরি গেছে হরিচরণের। চাকরি যে তার একার যায়

নি, আরো অনেকের গেছে, এ থেকে সবাই তাকে সান্ত্বনা নিতে বলেছিল, কিন্তু আরো অনেকের ছেলে মরে বলে তারও ছেলে মরবে এ-দুঃখে সে সান্ত্বনা পাচ্ছে না।

বাপের চাকরি যাবার পর পরেশ রাস্তায় বেরিয়েছিল ফেরি করতে —সাবান-স্নো, আলতা-ফিতে, গৃহস্থ মেয়েদের প্রসাধনের টুকিটাকি। সমীরের স্পষ্ট মনে আছে, যেদিন পরেশ নতুন ব্যবসার উৎসাহে প্রথমে তাদের বাড়ি আসে তার জিনিস নিয়ে--বড়লোক খরিদ্দার নিশ্চয়ই তাকে বিমুখ করবে না, এই আশ্বাসে। স্বাভাবিক কৌতূহলে কনকলতা ও চামেলি তার জিনিস ঘাঁটতে বসেছিলেন, এবং আদ্যোপান্ত জিনিস দেখে এমন ভ্রূকুঞ্চন করেছিলেন যে পরেশের সমস্ত মুখ অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। এমন সাবান নিয়ে এসেছে যেটা তাদের কুকুরেরও স্নানের যোগ্য নয়, আর, সভ্যসমাজে এমন মেয়েও আজকাল আছে নাকি যে ঠোঁট না রাঙিয়ে পা রাঙায়! পা তো থাকে জুতোর মধ্যে, জুতো খুলে আলতা কে দেখতে বসবে! গালে চুন-কালি মাখবার সময় চুন না পেলে এই স্নোই বুঝি মাখিয়ে দেয়! আর, টেপা-বোতামের যুগে এ-সব কদাকার সেফটিপিন! মা আর মেয়ে সেদিন কী হাসিই না হেসেছিলেন—সমীরের স্পষ্ট মনে আছে। তারও চেয়ে স্পষ্ট মনে আছে, পরেশের সেই শুষ্ক মুখের শীর্ণ কাতরতা।

কিন্তু তার এই মরণাপন্ন অসুখের সময় তার বাড়ি গিয়ে সে কী করবে? এক পয়সা সাহায্য করবার তার ক্ষমতা নেই, রোগীর শুশ্রূষায়ও সে অভ্যস্ত নয়। না হোক, তবু সে যাবে, তার এই নিঃস্বতার দিনে পরেশের মতই যারা রুগ্ন আর রিক্ত, ব্যথিত আর বঞ্চিত, তারাই তার আপনার লোক।

এত বড় কথাটা চন্দ্রবাবুর কান এড়াল না। সমীরকে তিনি ডেকে পাঠালেন।

'এ-সব কী শুনছি? তুমি নাকি হরি মিস্ত্রির বাড়ি গিয়েছিলে?'

খুব একটা আত্ম-অসম্মানের কাজ করেছে, প্রশ্নের মধ্যে তেমনি

একটা প্রচ্ছন্ন প্রতিবাদ। সমীর শান্ত গলায় বললে, 'হ্যাঁ, গিয়েছিলাম। তার ছেলে পরেশের খুব অসুখ।'

'অসুখ—তা তোমার কী? তুমি কি ডাক্তার?'

সমীরের অল্প একটু হাসল। বললে, 'ডাক্তার হলে কক্‌খনো যেতাম না। ফি চাইতাম। আর, এই ফি দেবার ক্ষমতা নেই বলে হরি-মিস্ত্রি আজ পর্যন্ত একটা ডাক্তার ডাকতে পারেনি।

'ডাক্তার ডাকতে পারেনি, তা, তোমার মাথা-ব্যথা কেন?' চন্দ্রবাবু ঝাঁজিয়ে উঠলেন। 'ডাক্তারের পয়সা না থাকে, হাঁসপাতালে পাঠিয়ে দিক। তাতে তোমার কী ঘুমের ব্যাঘাত হচ্ছে?'

'ঘুমের ব্যাঘাত যে হচ্ছে না সেইটেই আশ্চর্য।'

ছেলের মুখের দিকে চন্দ্রবাবু এক মুহূর্ত তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে রইলেন। বললেন, 'ওসব ছোটলোকের নোংরা বস্তিতে যেতে তোমার লজ্জা করল না?'

'ভীষণ লজ্জা করল, আমাদেরই বাড়ির কাছে এমন একটা জঘন্য বস্তি থাকতে পারে, থাকা সম্ভব!'

'ছেলেটার কী অসুখ?' চন্দ্রবাবু ঘুরিয়ে দিলেন কথাটা।

'সেদিকে খুব বড়লোকি আছে। উপসর্গের ছড়াছড়ি।'

কী অসুখ স্পষ্ট না জেনেই মুখিয়ে উঠলেন চন্দ্রবাবু। 'অমন সব ভয়ঙ্কর অসুখের সামনে তোমার যাবার কী দরকার পড়েছিল? যদি ছোঁয়াচ লাগে? আত্মসম্মানের বালাই না থাকে, শরীর বলে তো পদার্থ আছে, সেটাকে বাঁচাতে হবে তো? বাড়ি ফিরে এসে স্নান করেছিলে, ডিসইনফেক্‌ট্যাণ্টে ধুয়েছিল হাত-মুখ?'

সমীর চুপ করে রইল। বাবার এ বক্তৃতাটা সত্যি স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে না সামাজিক ভেদবোধ সম্বন্ধে সেটা সে বুঝতে পারল না।

'ডাক্তার তো নও জানি, আর নার্সিংও জান অষ্টরম্ভা। আর নার্সও ফি ছাড়া কথা কয় না—তোমার মার সেবারের অসুখে সাতশো বিয়াল্লিশ টাকা শুধু নার্সদেরই দিয়েছি। তবে শুধু-শুধু ওখানে গিয়ে-

ছিলে কার মুখ উজ্জ্বল করতে শুনি ? টাকা দু-একটা লাগে চিকিৎসার জন্য, তা-বরঞ্চ দেওয়া ভাল—অমন কদর্য, দূষিত আবহাওয়ায় যাওয়ার চেয়ে।'

'আমার কাছে টাকা কই ?' সমীর ভয়ে-ভয়ে বললে।

'থাকবেই না তো তোমার কাছে টাকা। তুমি ছাত্র—ষোল-সতের বছর মোটে বয়স, রোজগার-পত্র কর না, তোমার কাছে টাকা থাকবে কেন ? টাকা আমার, আমার কাছে থাকবে। দরকার হয়, হরি-মিস্ত্রি আমার কাছে এসে চাইবে, খোঁজ-খবর নিয়ে যদি বুঝি যে পাত্র উপযুক্ত, জানলা দিয়ে দু-এক টাকা না-হয় তখন ছুঁড়ে দিতে পারি তাকে। দাঁড়াও, এক্ষুনি আমি খোঁজ নিচ্ছি।' বলেই চন্দ্রবাবু হেঁকে উঠলেন : 'ম্যানেজার! ম্যানেজার !'

বাধা নিয়ে সমীর বললে, 'খোঁজ নিয়ে দরকার কী ! হরি-মিস্ত্রি তো আর চাইতে আসেনি আপনার কাছে। আর, দেরি নেই, খোঁজ-খবর নিতে-নিতেই সব সমাধান হয়ে যাবে।'

সমীর চলে যাচ্ছিল, চন্দ্রবাবু তাকে ডাকলেন। বললেন, 'সমাধান হোক বা না হোক, তোমার তা নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। আর তোমাকে বারণ করে দিচ্ছি, ও-সব গরিব ছোটলোকের নোংরা বস্তিতে কখনো যেতে পারবে না তুমি।'

'নিজে গরিব হয়েও নয় ?' সসঙ্কোচে সমীর প্রশ্ন করলে।

'নয় !' চন্দ্রবাবু ক্রুদ্ধ গলায় হুঙ্কার দিলেন। পরে স্বরে একটু ব্যঙ্গ মিশিয়ে বললেন, 'গরিবের তো কিছু দেখছি না তোমাতে। গায়ে দিব্যি ইস্ত্রি-করা সিল্কের শার্ট, সোনার চেনে বোতামগুলো চিকচিক করছে, চুলে একখানা ঘাড়-চাঁছা ছাঁট দিয়েছ, আছ তেতলার উপর, চড় মোটর, শুনছ রেডিয়ো। গরিব হতে যাবে তুমি কোন দুঃখে ? তা ছাড়া তোমার এত বড় বাপ,—দুটো ফ্যাক্টরি একটা ব্যাঙ্ক, দেশ-বিদেশে খান বারো-চোদ্দ বাড়ি—গরিব হওয়া কি তোমার শোভা পায় ? নিজের সম্মান না বোঝ, আমার দিকে অন্তত চেয়ে ও-সব নোংরামো আর

কোরো না, বুঝলে ? আমার মানটা অন্তত রেখ,—নইলে—' চন্দ্রবাবু ঢোক গিলে লন, 'নইলে একদিন না শেষকালে সত্যি-সত্যিই গরিব হয়ে যেতে হয় তোমাকে। কী, বুঝলে কথাটা ?'

'বুঝলাম।' সমীর দ্রুত পায়ে চলে গেল ঘর থেকে।

কথাটা সমস্ত দিন ধরে তাকে নাড়া দিতে লাগল। সত্যি, শুধু হাত-খরচের টাকা-কটা থেকে বঞ্চিত হয়েই সে গরিব হয়ে যায়নি। আজও সে ষোড়শ উপচারে খায়, খাটের উপর সিল্কের তোশকে শোয়, পিঠের তলায় কুশান দিয়ে মোটর চড়ে। প্রখর কণ্ঠে নিজেকে তার ধিক্কার দিতে ইচ্ছে করল। অথচ, চোখের উপর কি বীভৎস দারিদ্র্য সে দেখে এসেছে হরি-মিস্ত্রির বাড়িতে! এত বড় একটা রুগী, শুয়ে আছে মাটিতে একটা চটের উপর! আজ যদি দুটো টাকা কেউ হরি-মিস্ত্রিকে দেয়, তা দিয়ে নিশ্চয়ই সে ছেলের জন্যে ওষুধ কেনে না, নিজের জন্যে চাল নিয়ে আসে। কী নির্লজ্জ ক্ষুধা এই মানুষের! যে মরে মরুক, তবু আমি যদি একদিন বেশি বাঁচতে পারি।

বিকেলবেলা পরেশকে শ্মশানে নিয়ে যাচ্ছে, খবরটা বিষাক্ত বাণের মত এসে সমীরের বুকে বিঁধল। হাতের চায়ের পেয়ালাটা ছিটকে পড়ে গেল টেবিলের উপর। গায়ে টুইলের একটা হাফ-শার্ট, পায়ে স্যাণ্ডেল, সেই অবস্থাতেই সে ছুটে গেল রাস্তায়।

পিছন থেকে চন্দ্রবাবু বলে উঠলেন, 'কোথায় যাচ্ছ ?'

সমীর দাঁড়িয়ে পড়ল। বললে, 'রাস্তায়—বেড়াতে।'

'বেড়াতে যাচ্ছ, কিন্তু এটা কি ভদ্রলোকের পোশাক নাকি ? ঠিকমত ড্রেস করে নাও। আর সোফারকে গাড়ি বার করতে বল।'

'না, আমি পায়ে হেঁটেই বেড়াব। আমি যাচ্ছি রাস্তায়, কোন বস্তিতে নয়। অতএব, আপনার ভয় নেই, কোন অসম্মানের কাজ হচ্ছে না তাতে।'

'আমি বলছি, হচ্ছে। তুমি ফিরে এস।'

'রাস্তায় গরিবরা হাঁটে বলেই কি অপমানের ভয়ে আমাদের সেখানে মোটর চালাতে হবে?'

'তর্ক কোরো না।' চন্দ্রবাবু গুম্ফদ্বয় গম্ভীর করে তুললেন। 'তোমার উদ্দেশ্য বেড়ানো নয়, তোমার উদ্দেশ্য শ্মশানযাত্রীদের সঙ্গ নেয়া। সেটা হতে পারে না।'

'বেশ, মোটরেই আমি যাব।' সমীর দ্রুত ভঙ্গিতে ফিরে দাঁড়াল।

'না, তা-ও আজ সম্ভব হবে না।' চন্দ্রবাবু অবিচলিত গলায় বললেন, 'তোমাকে বাড়িতেই থাকতে হবে। কতক্ষণ বাদে, সন্ধের সময়, তোমার নতুন মাস্টার আসবেন।'

পরাভূতের মত সমীর তার পড়ার ঘরে ফিরে এল। শ্মশানযাত্রীদের কণ্ঠরোল মিলিয়ে গেল বড় রাস্তার কিনারে। দোতলায় চামেলি পিয়ানো বাজাচ্ছে। কার সঙ্গে বসে কনকলতা উচ্চহাস্যে গল্প করছেন। চন্দ্রবাবুর জন্যে গেটের সামনে বিকেলের মোটর দাঁড়িয়ে।

'এই যে, এই ঘর।' বেয়ারা কাকে ঘর দেখিয়ে দিল।

দেখেই সমীর বুঝতে পারলে, নতুন মাস্টার। উজ্জ্বলন্ত ফুলবাবু, কোঁচার ঝুলটাই হয়ত ছাপ্পান্ন ইঞ্চি। গিলে-করা পাঞ্জাবি, গলা জড়িয়ে জরি-পাড় মাদ্রাজি চাদর। সান্ধ্য প্রসাধনের গন্ধ সর্বাঙ্গে ভুরভুর করছে। যেন বিধুভূষণের উপর একটা নির্মম উপহাস।

'ও! তুমিই ছাত্র? বেশ, ভাল কথা। কি, ফ্যানটা একটু খুলতে পারি?'

রেগুলেটার ঘুরিয়ে সমীর পুরোদমে চালিয়ে দিল পাখাটা।

'কী বীস্টলি গরম!' পকেট থেকে টেবিল-ঢাকনির মত বিশাল-কায় এক রুমাল বের করে ঘাড়-গলা মুছে মাস্টার বললেন, 'একটা কার না হলে চলছে না। আসতে হয়েছে বাস-এ, মুচি-মুদ্দাফরাস ধাঙড়-মেথরদের সঙ্গে, তিন থেকে ছ-পয়সার সব প্যাসেঞ্জার! এদিকে, আমাদের পাড়ায়, সন্দেশ বেচে চিন্তারাম গোয়ালার তিনখানা মোটর, আর কী অবিচার দেখ, আমার মত একজন প্রফেসার, আমাকে কিনা

একটা কদাকার বাসে চাপতে হচ্ছে, এর গুঁতো আর ওর গন্ধ সহ্য করে! আরে, তোর দেহ তো মোটে একটা, চড়বার বেলায় চড়বি তো একটাতে, বাকি দুটো তো আর শুধু-শুধু সঙ্গে নিয়ে বেড়াবি না, তবে তিনটে গাড়ি দিয়ে তোর হবে কী? বৈষম্যটা কতদূর একবার ভেবে দেখ! ছানায় পাক দিচ্ছে যে চিন্তারাম তার তিন-তিনখানা গাড়ি, আর আমি, আমার মত যারা ফ্লাওয়ার অব্ দি ইউনিভার্সিটি, আমি কিনা চলেছি একটা বাস-এ, প্যাক-করা রেলোয়ে পার্শেলের মত! এ অন্যায় বৈষম্য দূর হয়ে যাওয়া উচিত। কী বল, উচিত নয়?'

'কিন্তু আপনার মোটর পাবার আগে', সমীর সজল স্নিগ্ধ স্বরে বললে, 'আরো অনেকের কি শুধু একমুঠো ভাত পাওয়া উচিত হবে না? বৈষম্যটা সেদিক দিয়ে দেখেছেন?'

কথাটা নতুন মাস্টার হেমেন্দু সিংহকে ভীষণ অপ্রস্তুত করে দিল। কথা না পেয়ে সে হাসতে লাগল। বললে, 'ও-সব এখন তুমি ঠিক বুঝবে না; রামের পক্ষে এক মুঠো যা ভাত, শ্যামের পক্ষে তা হয়ত সিক্স-সিলিণ্ডার মোটর-গাড়ি। আচ্ছা, আচ্ছা, সে পরে দেখা যাবে। এখন পড়বে কী? ইংরিজি, হিস্ট্রি, না সিভিকস?'

'আমি কিছুই পড়ব না।'

'পড়বে না!' হেমেন্দু অবাক হয়ে গেল।

'না, আমি প্রাইভেট টিউটরের কাছে আর পড়ব না। টাকাটা আর অপচয় হতে দিতে আমার ইচ্ছে নেই।'

'কিন্তু এর আগেও তো এতে অপচয় হয়েছে।'

'হ্যাঁ, আপনার আগেও আমার একজন টিউটর ছিলেন। কিন্তু তাঁর বেলায় সেটা আমার অপচয় বলে মনে হয় নি।'

'তবে আমাকে ডেকে আনবার কী দরকার ছিল?'

'যাঁরা আপনাকে ডেকে এনেছেন তাঁদেরকে জিগগেস করুন।'

ক্রুদ্ধ কণ্ঠে হেমেন্দু বললে, 'বেশ, তাদেরকেই তবে ডেকে দাও।'

বাবা বাড়ি নেই সমীর তা জানত, মামাবাবু আছে কি না বেয়ারাকে বললে খোঁজ নিতে। ম্যানেজারের আবির্ভাব হল এবং ব্যাপারটা আনুপূর্বিক জেনে হেসে উঠল সে অনর্গল। হেমেন্দুর কাঁধ চাপড়ে বললে, 'মোটের উপর, আপনি তাতে ঘাবড়াচ্ছেন কেন? ছাত্র আপনার পড়ুক কি না পড়ুক, তাতে কী আসে যায়? মোটের উপর, ছাত্র তো আপনাকে মাইনে দেবে না। মাইনে দেবে তার বাবা, আর আমি তার মারফতদার। মোটের উপর আপনার ভাবনাটা কোথায়? দিনের দিন দয়া করে পায়ের ধুলো দেবেন, দিনের দিন মাইনেটি আপনার পকেটে তুলে দেব।'

হেমেন্দু আকর্ণ হাস্য বিস্তার করলে। বললে, 'হ্যাঁ, মাসান্তে আমার মাইনেটা পেলেই হল।'

এমন অবস্থায় বিধুভূষণ ককখনো চাকরি নিত না, সমীর ভাবলে।

'কিছু না পড়ান, কিছুই ক্ষতি নেই।' ম্যানেজার গোঁফ দুলিয়ে বললে, 'মোটের উপর, চুরি করা অপরাধ নয়--নোট ছেঁড়াটা বাহাদুরি —রুগীর বস্তিতে যাওয়া মানেই বিদ্যাসাগর হওয়া—এ-সবগুলো না শেখালেই হল। বড়লোকের বাড়িতে যেমন রেডিয়ো-পিয়ানো থাকে, নিষ্কর্মা ম্যানেজার থাকে, তেমনি একটি বড়-ল্যাজ-ওয়ালা প্রফেসরেরও দরকার। এটা একটা আমাদের শোভা, বৈঠকখানায় অয়েলপেন্টিং-এর মত আমাদের না পুষবে তো, মোটের উপর, বড়লোক তবে আছে কী করতে?'

'তবে আমি আজ যাব?' প্রফুল্ল গলায় হেমেন্দু জিজ্ঞেস করলে।

'যাবেন বৈকি মোটের উপর, আপনার কাজ হবে আসা যাওয়া, আমার যেমন কাজ শেকড় গেড়ে বসে থাকা। আসুন, দুটো আইস-ক্রীম খেয়ে যান।'

সে-রাত্রে লুচির থালা নিয়ে সমীর বসল বটে, কিন্তু কিছুই গিলতে পারল না, ও তেতলায় তার সিল্কের বিছানার উপর শুয়ে তার মন হল সে যেন কাঁটার উপর শুয়ে আছে। মনে হল, অনেককে যেন সে

বঞ্চিত করে এসেছে, অনেক নিরন্ন ও অনেক নিরাশ্রয়কে। টিঁকতে পারল না বিছানায়, চলে এল ছাদে, তার ঘরের সামনে যে ঢালা ছাদ। কৃষ্ণপক্ষের ভাঙা চাঁদ উঠেছে, অনেক রাতে সমস্ত আকাশ সুকোমল নীল—দেখলে মনে হয় না, পৃথিবীতে দুঃখ আছে এক কণা। উঁচু-উঁচু দালানের দম্ভ রয়েছে চারদিকে উদ্ধত হয়ে—দেখলে মনে হয় না, এদের ফাঁকে ফাঁকে লুকিয়ে রয়েছে সব গরিবের বস্তি। প্রবল অট্টহাসির পেছনে কেন এত হাহাকার? কত অল্পতেই মানুষ খুশি হতে পারে, অথচ এই অল্পের অল্পতম ভগ্নাংশটুকুও অনেকের জোটে না। বিধাতার অঙ্কে কেন এত গরমিল? হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপে কত সহজে আলো জ্বালতে পারে সে, কিন্তু কত ঘরে সামান্য মাটির বাতিটিও জ্বালতে পারে না সন্ধ্যাকালে! এক জনের এত উদ্বৃত্ত, আরেক জনের এত রিক্ততা! অথচ, সমস্ত সংসার আশ্চর্য উদাসীন!

আস্তে-আস্তে সমীর সব ছাড়তে শুরু করল; যেটুকুই সে মনে করে বিলাসের সেটুকুই সে পরিহার করে, যার মধ্যেই ঐশ্বর্যের ঝাঁজ রয়েছে তাই যেন মনে হয় তার দম আটকে ধরেছে। চন্দ্রবাবু যত নিষ্ঠুর হন, সমীরও তত নিশ্চিহ্ন করে তোলে নিজেকে। ভাল পরে না, ভাল খায় না, মেঝের উপর শুকনো মাদুর বিছিয়ে ঘুমোয়। বাইরে পর্যন্ত বেরোয় না, কেননা যে-গলিতে মোটরের অধিকার নেই সে-গলি থেকে সে নির্বাসিত। ম্লান মুখে কয়েদীর মত বসে থাকে সে তার পড়ার ঘরটিতে। আর, সবচেয়ে তার বড় দুঃখ, এতেও কিছুতেই সে নিজেকে দুঃখী বলে ভাবতে পারে না।

দেখে-শুনে সবচেয়ে বিচলিত হলেন কনকলতা। প্রথমটা ভেবেছিলেন, বাপের উপর রাগ পকেট-খরচ বন্ধ হয়েছে বলে, লুকিয়ে তাই তাকে তিনি টাকা দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'যেমন তোর ইচ্ছে তেমনি তুই খরচ কর্। কাউকে বিলিয়ে দিতে চাস. তা-ও দে, ওঁকে শুধু কিছু বলিসনে।'

অনেকগুলি টাকা। হাসিমুখে সব মার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে সমীর বললে, 'আমি ভেবে দেখেছি মা, শুধু দান করে দারিদ্র্য-নিবারণ হয় না। কত আমি দেব, কতজনকে দেব! দিতে দিতে আমিই শুধু নতুন আরেকজন গরিব হয়ে যাব, শেষ পর্যন্ত কারুরই তাতে লাভ হবে না। মিছিমিছি সংসারে আরেকজন গরিব বাড়িয়ে লাভ কী?'

কাঁদো-কাঁদো মুখে কনকলতা বললেন, 'তবে কী চাস তুই?'

'সেইটেই যে ঠিক বুঝতে পারছি না, মা।'

কনকলতা তারপর স্বামীর কাছে গিয়েছিলেন প্রতিকার খুঁজতে।

চন্দ্রবাবু বোমার মত বিদীর্ণ হয়ে পড়লেন। 'বেশি বাড়াবাড়ি করে তো, বাড়ির থেকে সোজা বার করে দেবে।'

ম্যানেজার সামনেই বসে ছিল, বাইসিকেলের হ্যাণ্ডেলে হাত বুলুতে-বুলুতে গম্ভীর গলায় বললে, 'তাতে মোটেই রোগের চিকিৎসা হবে না। মোটের উপর, এর ওষুধ জানা আছে শুধু একটা—যদিও একটু দাম বেশি।'

'কী?' কনকলতা ও চন্দ্রবাবু উভয়েই প্রশ্ন করলেন।

'বিষের ওষুধই হচ্ছে বিষ। মোটের উপর আর কিছুই নয়, ওকে সাঙ্ঘাতিক বড়লোক বানিয়ে তুলতে হবে। আগে ওর হাতে যেত যদি পঞ্চাশ টাকা, এখন সে-জায়গায় দিতে হবে ওকে পাঁচ শো। ওকে ডুবিয়ে দিতে হবে বিলাসের অজস্রতায়। মোটের উপর রক্তে ওর এই ঐশ্বর্যের নেশা ধরিয়ে দিতে হবে। যত খুশি ও যেমন খুশি, চারপাশে শুধু জিনিস আর জিনিস এনে জড় করতে হবে, একটা জিনিসের দরকারে আরেকটা জিনিস—হাঁপিয়ে তুলতে হবে ওকে। হোটেল আর সিনেমা, পার্টি আর পিকনিক, দার্জিলিং আর কাশ্মীর—ওকে থামতে দেওয়া হবে না, মোটের উপর, ওকে ঘুরিয়ে দিতে হবে এক অফুরন্ত মেরি-গো-রাউণ্ডে। তখন কোথায় বা বস্তি, কোথায় বা আঁস্তাকুড়! সমস্ত স্বপ্ন তখন তার ধূলিসাৎ। বাঘের বাচ্চাকে বাঘ বানাতে হয়। তেমনি বড়লোকের ছেলেকেও বড়লোকের ছেলে করাই প্রশস্ত।'

প্রথমে বিরক্ত, পরে ঈষৎ গম্ভীর ও শেষকালে অপরিমিত উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন চন্দ্রবাবু।

'তুমি ঠিক বলেছ। ঠিক। একশোবার। আশ্চর্য, এ-কথা আমার অনেক আগেই মনে হওয়া উচিত ছিল। হ্যাঁ, এক্ষুনি, এক্ষুনি আমি ওর জন্যে একটা কার-এর অর্ডার দেব।' বলে তিনি ক্ষিপ্র হাতে ফোনের রিসিভারটা তুলে নিলেন।

'আর, আমার জন্যে, বাবা?' কোত্থেকে চামেলি এসে হাজির।

'আগে গরিব হ, উপোস করে থাক্, মাদুর পেতে শো—তখন দেখা যাবে।' ম্যানেজার টিপ্পনি কাটল।

না, বাবা, আমার জন্যে একটা হীরের নেকলেস!' চামেলি নাকে কাঁদতে-কাঁদতে বললে।

পাঁচ

এ বাড়ি সম্বন্ধে সমীরের আর বিশেষ কৌতূহল নেই। তাই তার কলেজ যাবার সময়—আজকাল পায়ে হেঁটেই সে কলেজে যায়—বাড়ির সামনে জিনিস-পত্র বোঝাই দু-দুটো মোটর-লরি দেখে কিছুতেই সে বুঝতে পারেনি, কিন্তু ফিরে এসে তার চক্ষুস্থির। দেখল, নিচের তলা থেকে তার পড়ার ঘরটা তেতলায় উঠে এসেছে। নতুন বুক-কেসে থরে-থরে সাজানো তার বই, মেঝের পা-পোষের মত পুরু গালিচা, চার পাশে নতুন-নতুন কায়দার দামি আসবাব। পাশে শোবার ঘরটা এমন জমকালো সাজানো যা সিনেমার পর্দাতেও বিশ্বাসযোগ্য নয়। আর শেষ প্রান্তে তার সাজঘরটা যেন রূপকথার স্বপ্ন দিয়ে তৈরি। সমীরের মনে হল, যেন হঠাৎ আলাদীনের প্রদীপ জ্বলে উঠেছে। যেন পড়ার ঘরে বসে তাকে আর পড়তে হবে না, যেন বিছানায় শুয়ে তাকে আর ঘুমুতে হবে না, যেন সব সময়েই তাকে

সাজ-গোজ করে সার্কাসের সঙের মত বাঁদরামি করে বেড়াতে হবে।

তদ্বির-তদারকে ম্যানেজার খুব ব্যস্ত। 'কী, পছন্দ হচ্ছে?' সমীরকে দেখতে পেয়ে গুম্ফপ্রান্তে হাসির ঢেউ তুলে সে বললে, 'মোটর উপর, বলছি তো—বাঘের বাচ্চারে, বাঘ না করিনু যদি কী শিখানু তারে? ঐ সব বনবাসের পোশাক ছেড়ে এখন একেবারে রাজপুত্তুর বনে যাও।'

চারিদিকে বিমূঢ় চোখে চাইতে চাইতে সমীর বললে, 'এ সব কী মামাবাবু?'

'তোমাকে এ-সব পুরস্কার দেয়া হচ্ছে।' কাছেই কোথায় চন্দ্রবাবু ছিলেন, বললেন ঘরে ঢুকে—'যাতে তুমি ভাল হয়ে ভদ্র হয়ে চল তারই জন্যে। যাতে নিজের মর্যাদা, বাড়ির মর্যাদা না ভোল, তারই জন্যে। দেখ, আর কী বই অর্ডার দেবে, নতুন আর কী স্যুট-পাজামা, নতুন আর কী ফার্নিচার! টাকা যখন যা লাগবে আগের মত চেয়ে নেবে ম্যানেজারের থেকে, যত চাও আর যখন চাও। খেলায়-ধুলোয়, বইয়ে-বেড়ানোতে খরচ করতে চাও, কোরো কিন্তু দেখো সে-খরচে যেন বাড়ির মর্যাদা না ম্লান হয়। গরিবদের খাওয়াতে চাও খাওয়াও, কিন্তু ছোটলোকদের সঙ্গে পাত পেড়ে বসে নিজে খেয়ো না।'

পুরস্কার, না ঘুস! সমীরের সমস্ত মন ঘৃণায় অশুচি হয়ে গেল।

'শুধু তাই নয়, দাদা।' চামেলি নাক টান করে বললে, 'তোমার জন্যে আবার একটা গাড়ি এসেছে। আলাদা সোফার পর্যন্ত।'

'মোটর গাড়ি!' সমীর যেন হঠাৎ বহুদূরবিস্তৃত একটা মুক্তির আভাস পেল। কারাকক্ষের জানলা থেকে চকিতে একটুখানি আকাশ দেখার মত।

'আর এই মোটরে আমাদের ফার্স্ট ট্রিপ হবে শ্রীনগর!' ম্যানেজার বললে।

পরদিন সকালে জয়ন্তর ফোন এল। 'হ্যালো, সমীর? ওনার

অব্ এ কার্ ? কনগ্র্যাচুলেশ্যন্স্! কলেজে যাবার সময় আমাকে একটা লিফ্‌ট্ দিস ভাই। কাল থেকে আমাদের গাড়িটা হাঁসপাতালে পড়ে আছে। মাইণ্ড, ভুলিস নে। চিয়্যারো।'

সমীরের মনে পড়ল শ্যামাপদর কথা, তিন মাইল দূর থেকে যে হেঁটে আসে। মনে পড়ল সুকুমারের কথা, কাচে পা কেটে গেলেও ন্যাকড়ার ফালি বেঁধে যে খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে আসে, অথচ ট্রামে চড়বার পয়সা নেই। মনে পড়ল সুনীলের কথা, ছেলে পড়িয়ে তার বাড়িতে বাজার করে দিয়ে মেসে খেয়ে কলেজে আসতে যার প্রথম ঘণ্টায় রোজ রোজ দেরি হয়ে যায়।

জয়ন্তর বাড়ির সামনে যখন সমীরের গাড়ি এসে দাঁড়াল, জয়ন্ত দেখল সমীর একা নয়, সঙ্গে শ্যামাপদ, সুনীল আর সুকুমার।

'My! এদের জোটালে কোত্থেকে?' জয়ন্ত নিরুৎসাহের মত বললে।

'বাড়ি-বাড়ি গিয়ে সংগ্রহ করে এনেছি। গাড়ি যখন একটা হয়েছে তখন মিছিমিছি এদেরকে আর কষ্ট করতে দিই কেন? একটু ঠাসাঠাসি হচ্ছে বটে, তাতে কি, চলে এস, বেশ হৈ-হৈ করে যাওয়া যাবে।' সমীর গাড়ির দরজাটা খুলে দিল।

'এক্সকিউজ মি। এক দিনেই তোমার গাড়িটার স্প্রিং নষ্ট হয়ে যাক, সেটা আমি চাই না। গাড়িরও একটা মান-সম্ভ্রম আছে, নইলে গরুর গাড়িও তো গাড়ি। অচ্ছা ডোণ্ট ও'রি, আমি ট্যাক্সিতেই যাব না-হয়।' জয়ন্ত বিদায়সূচক হাত তুলল।

সেদিন শনিবার। তা ছাড়া এক পিরিয়ডের প্রফেসার আসেনি। সকাল-সকাল ছুটি হয়ে গেল। সমীর ড্রাইভারকে বললে, 'কারখানা।'

সমীরের খেয়াল হল মজুর-মিস্ত্রিদের ছেলেদের সে গাড়ি চড়াবে। কী অভাবনীয় আনন্দ হবে না-জানি তাদের। চিরকাল যারা পিছনে পড়ে থেকে ধুলো খেয়েছে তারা আজ ধুলো উড়িয়ে যাবে; যারা ছিল এতদিন চাকার তলায় তারা উঠে বসবে আজ গদির উপর।

গাড়ি থেকে নেমে একজনকে সে জিগগেস করলে, 'এই, কানাই কোথায় ?'

'কে কানাই ?' লোকটা থতমত খেয়ে গেল।

'নবীন মিস্ত্রির ছেলে। চেন না ?'

'ও, হ্যাঁ, চিনি। কিন্তু কোথায় তা বলতে পারব না।'

'তার মানে ?'

'তার মানে ছোঁড়াটার আর পাত্তাই পাওয়া যাচ্ছে না।'

'কেন, কী হয়েছে ?'

'কোথায় চুরি-টুরি করে জেল-ফেল গেছে নিশ্চয়। পাকা চোর ছিল যে এক নম্বরের।'

'তুমি কী করে জানলে ?'

'বা', লোকটা অবাক হবার ভাব করল : 'তা তো আপনিও জানেন। সেদিন বড়-সাহেবের পকেট কাটতে গেলে আপনিই তো ধরিয়ে দিয়েছিলেন ওর চুরি। আর, কী মারটাই না সেদিন খাওয়ালেন ওকে। ভুলে গেছেন নাকি ?'

সমীর হাসল। বললে, 'আমাকে তাহলে চিনতে পেরেছ দেখছি। বেশ, এখন একবার নবীনকে গিয়ে খবর দাও, তার সঙ্গে আমার বিশেষ দরকার। এই গাছতলাতেই আমি আছি।'

গাছতলায় ঘন ঘাসের উপর সমীর পা ছড়িয়ে বসল এবং দেখতে-দেখতে তার চারপাশে জড় হতে লাগল ছোটলোকদের ছোট-ছোট সব ছেলেমেয়ে। আসবার পথে দোকান থেকে সে একঠোঙা চকোলেট আর টফি কিনে এনেছে, তাই সে প্রথমে দূর থেকে ছুঁড়ে দিচ্ছিল এবং ক্রমে-ক্রমে ব্যবধানটা সংক্ষেপ করে এনে এখন একেবারে তাদের মুঠোয় তুলে দিচ্ছে।

আপিস-ঘরের জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে বড়-সাহেব বললেন, 'ও কে, সমীর না ?'

ম্যানেজার যেখানে বসে ছিল সেখান থেকে বাইরেটা দেখা

যায় না, তবু মুখ না তুলেই সে বললে, 'সেই রকম তো মনে হচ্ছে।'

'মনে হচ্ছে কী! সমীরই তো। ঐ তার গাড়ি। ম্যাটিনি শোতে সিনেমায় না গিয়ে ও এখানে এসেছে কেন?'

'কাশ্মীরের পথ ভুল করে হয়ত।'

'তারপর কুলি-বস্তির নোংরা কতগুলি ছেলে জোগাড় করে ও ওখানে করছে কী?'

'আগড়ুম বাগড়ুম খেলছে বোধহয়। কিম্বা—'

'কী ওখানে বসে ইয়ার্কি করছ!' বড়-সাহেব গর্জে উঠলেন: 'উঠে এসে দেখ না, সত্যি বলছি কি না।'

ম্যানেজার উঠে গিয়ে জানলাটা সজোরে বন্ধ করে দিল। এবং এসে বসল তার নিজের জায়গায়।

'দেখলে না, দেখতে পেলে না সমীরকে?' বড়-সাহেব রুক্ষ গলায় প্রশ্ন করলেন।

ততোধিক রুক্ষ গলায় ম্যানেজার বললে, 'না! ছেলেমানুষ নিজের খেয়ালে কী করছে না করছে, মোটের উপর, তার দিকে সর্বক্ষণ চোখ রাখতে হবে না।'

'এত বড় বড়লোক করার পরও ওর তেমনিই মতি-গতি থাকবে!' হতাশার ভাব দেখিয়ে বড়-সাহেব চেয়ারে পিঠটা ছেড়ে দিলেন।

ম্যানেজার বিরক্ত হয়ে বললে, 'কটা দিন একটু সবুর করুন না! দেখুন না হুইলটা কোন্‌দিকে বাঁক নেয়।'

'দেখ, হেমেন্দু সিংকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না।' বড়-সাহেবের মুখে গভীর অসন্তোষ ফুটে উঠল। 'ওকে কতদিন বলেছি, রোজ বিকেল-বেলা সমীরকে নিয়ে হয় সিনেমা নয় হোটেল—যে-সব জায়গায় বড়-লোকের ছেলেদের শোভা পায় তেমনি কোথাও নিয়ে যাবে। আর কোথাও না যায়, যার গাড়ি আছে, আর যেখানে চৌরঙ্গি আছে সেখানে তার আবার কিসের ভাবনা। মাস্টারি করা মানে শুধু নোট মুখস্ত

করিয়ে দেয়া নয়। হোপ্‌লেস্! লোকটাকে আমি ছাড়িয়ে দেব।'

'কিন্তু বিকেল তো এখানে হয়নি।' ম্যানেজার বললে, 'মোটের উপর, এই ভর-দুপুরবেলায় সে করবে কী? তার অপরাধ কোন্‌খানে?'

'দেখ', বড়-সাহেব চেয়ার ঘুরিয়ে ম্যানেজারের দিকে মুখিয়ে এলেন, 'এখানে তোমার ম্যনেজারি আর পোষাবে না। তোমাকে কাল থেকে সমীরের গার্ডিয়ান টিউটর হতে হবে। মাস্টার-ফাস্টারে হবে না, সারাক্ষণ তোমাকেই তাকে পাহারা দিয়ে বেড়াতে হবে। আর মনে থাকে যেন, তোমার পরামর্শেই তাকে বড়লোক করেছি। তাই দায়িত্বটা সম্পূর্ণ তোমার।'

চোয়াল দুটো লম্বা করে বাইসিকেলের হ্যাণ্ডেলদুটোতে হাত বুলুতে-বুলুতে ম্যানেজার বললে, 'আমাকে পড়াতেও হবে নাকি?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়!' বড়-সাহেব টেবিলের উপর প্রবল মুষ্ট্যাঘাত করলেন।

ম্যানেজার কেঁপে উঠল। বললে, 'আমি মোটের উপর মার খেয়েও কোঁক্ করি না পাছে ক উচ্চারণ হয়—আমার মত পণ্ডিত রাখতে হলেই হয়েছে। তবে পড়াতে না হয়ে বখাতে হয় তার চেষ্টা দেখতে পারি।'

'তাই বা মন্দ কী!' চেয়ারে উল্টো-ঘুরোন দিয়ে বড়-সাহেব নিজের জায়গায় ফিরে গেলেন। 'বড়লোকের ছেলের পক্ষ বড়লোকের মত বকে যাওয়াটাও শোভন—এমনি ছন্নছাড়া লোফার হওয়ার চেয়ে।'

ওদিকে নবীন এসে গড় হয়ে প্রণাম করতেই সমীর অতিশয় কুণ্ঠিত হয়ে উঠে দাঁড়াল। জিগগেস করলে, 'তোমার ছেলে, কানাই কোথায়?'

নবীন কেঁদে ফেলল এবং সবিস্তারে যা বলল সংক্ষেপে তা এই। কানাই সেই যে তার দিদির সঙ্গে দেখা করতে বেরিয়েছে, আজও তার

কোন সন্ধান নেই। সেখানে খবর নিয়ে জেনেছে দিদির সঙ্গে তাকে দেখা করতে দেয়নি, সঙ্গে সে গয়না নিয়ে আসেনি বলে। মনের দুঃখে সে নাকি তারপর কলকাতা গিয়েছে রোজগার করে বড়লোক হবার জন্যে। কিন্তু কলকাতা তো বিরাট জনসমুদ্র, সেখান থেকে কে খুঁজে দেবে তার কানাইকে ?

'বেশ তো, তুমি চল না আমার সঙ্গে, আমার গাড়িতে।' সমীর উত্তেজিত হয়ে উঠল, 'সম্ভব অসম্ভব সমস্ত জায়গায় খুঁজে ক-দিনেই আমরা ওকে ঠিক বার করতে পারব।'

নবীন ম্লান মুখে একটু হাসল। বললে, 'বড়-সাহেব ছুটি দেবেন না যে।'

'কেন ? তোমার ছেলে কোথায় হারিয়ে গছে, তোমাকে ক-টা দিন দেবেন না তার খোঁজ করতে ? তুমি চেয়েছিলে ছুটি ?'

'অনেকবার। শেষকালে বললেন—ছুটি নিতে হয় কাজে ইস্তফা দাও। কিন্তু, বলুন, কাজ ছেড়ে দিলে খাব কী ?'

আর এদিকে তোমার ছেলে কিছু খাচ্ছে কি না তারই কোন খোঁজ নেই।' সমীর বিদ্রূপ করে উঠল। 'এ কাজ রাখার মানে কী; নিজে যখন ব্যারামে বিছানায় মুখ থুবড়ে পড়বে তখন ছুটি পাবে তো ?'

কিরকম বিকৃত মুখ করে নবীন হঠাৎ হেসে উঠল। যেন খানিকট পাগলের হাসি। তাকে প্রকৃতিস্থ করবার চেষ্টায় সমীর বললে, 'আচ্ছ তুমি ভেব না, আমি চোখ রাখব, কোথাও ওকে পাই কি না কুড়িয়ে যাও, এখন কাজ কর গে।'

বন্ধ জানলার বাইরে হঠাৎ সম্মিলিত কণ্ঠের তুমুল হর্ষধ্বনি শো গেল আর সেই সঙ্গে ধাবমান একটা মোটরের শব্দ।

বড়-সাহেব উঠলেন : 'কী ওটা ?'

ম্যানেজার শব্দ করল না।

'উঠে জানলাটা খুলে দিয়ে যাও বলছি।'

তথাপি ম্যানেজারের বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য নেই। বড়-সাহেব অগত্যা নিজেই গেলেন জানলা খুলতে। ম্যানেজার ও-পাশ থেকে বলে উঠল, 'চুপ করে বসে থাকুন নিজের জায়গায়। মোটের উপর, দায়িত্ব যখন সম্পূর্ণ আমার তখন আপনাকে খুলতে দেব না এ-জানলা।'

'দায়িত্ব তোমার মানে এ-কারখানার দায়িত্বও তোমার নাকি?' প্রবল ধাক্কা মেরে বড়-সাহেব খুলে দিলেন জানলা। এবং খুলেই বাইরে তিনি যা দেখলেন তা তাঁর মানবীয় কল্পনার বাইরে। কারখানার আশ-পাশ দিয়ে যে-সব রাস্তা গিয়েছে এঁকে-বেঁকে তারই উপর সমীরের গাড়ি চলেছে ঘুরে-ঘুরে, আর গাড়ির মধ্যে এক দঙ্গল মুটে-মজুরের ছেলে আনন্দে চিৎকার করছে আপ্রাণ। হাতের কাজ ফেলে তাই দেখতে বেরিয়েছে সব মজুর-মিস্ত্রির দল। এমন দৃশ্য তারা জীবনে উপভোগ করে নি, যন্ত্রের আর্তনাদের দেশে কলকণ্ঠ শিশুর আনন্দ-কাকলি। বড়-সাহেব মুহূর্তে পাথর হয়ে গেলেন। গাড়িটাতে চেপেছে বোধহয় এক ডজনের বেশি—আর সবগুলিই নোংরা নর্দমা থেকে তুলে আনা, যেমন তাদের পোশাক তেমনি তাদের আকৃতি : আর তাদেরই কাউকে এ-হাতে জাপটে, ও-হাতে আঁকড়ে, পিঠ দিয়ে চেপে, পা দিয়ে জড়িয়ে, প্রদীপ্ত মুখে বসে আছে সমীর, যেন যুদ্ধজয় করে ফিরছে এমনি মুখ। বড়-সাহেব নিজেকে আর স্থির রাখতে পারলেন না, চিৎকার করে উঠলেন, 'সমীর।' দ্রুত পায়ে বেরুতে গেলেন বাইরে, কিন্তু দেখলেন দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ম্যানেজার।

'মোটের উপর, উত্তেজিত হবেন না।' ম্যানেজার গোঁফের উপর হাসির পোঁচ বুলিয়ে বললে, 'আপনি নন, আজ থেকে আমিই ওর গার্জেন। অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়ে গেছে। অতএব—'

'ইডিয়ট!' বড়-সাহেবের দুইপাটি দাঁত দৃঢ়সংযুক্ত হল।

সেই রাত্রে বাড়ি ফিরেই চন্দ্রবাবু প্রথমে মাস্টারকে ডেকে পাঠালেন তাঁর ঘরে। হেলতে-দুলতে হেমেন্দু এসে হাজির।

'কী করতে আসেন আপনি এখানে ?' চন্দ্রবাবু ফেটে পড়লেন।

হেমেন্দু থ হয়ে গেল।

'এই যে প্রকাণ্ড কার্নিভ্যাল বসেছে, সেখানে নিয়ে গিয়েছিলেন সমীরকে ?'

'কার্নিভ্যালে ? সেখানে তো শুধু জুয়োর আড্ডা। সেখানে কোন ভদ্রলোক যায় নাকি ?'

'কিন্তু সিনেমা ? সিনেমায় নিয়ে যেতে পারেন না ?'

'কোথায় যাব ? কবে যাব ?' হেমেন্দু হাসল : 'একটা বই যদি একবার ধরে, কামড় দিয়ে পড়ে থাকে। তিন মাসের আগে মুখ বদলায় না।'

'কিন্তু মুখ বদলাতে হোটেলে তো যাওয়া যায়।'

'নিয়ে গিয়েছিলাম একদিন। আমাকে ঢুকিয়ে দিয়ে ও বললে—স্যর, আমার মোটেই খিদে নেই, আপনি খান। বলে বেরিয়ে গেল গাড়ি নিয়ে।'

'আর আপনি খেলেন ?'

লজ্জিত হয়ে হেমেন্দু বললে, 'কী আর করা যায়, একবার ঢুকে পড়ে দু-জনেরই বেরিয়ে যাওয়াটা ভাল দেখায় না বলেই—'

'দেখুন, আপনার দ্বারা কিচ্ছু হবে না।' চন্দ্রবাবু দৃঢ় গলায় ঘোষণা করলেন।

হেমেন্দু হাসল। বললে, 'সেটা আর কিছু নতুন আবিষ্কার নয়। যেদিন শুনেছি সন্দেশওয়ালা চিন্তারাম মোদকের তিনখানা মোটর গাড়ি, সেদিনই সেটা হৃদয়ঙ্গম হয়েছে।'

'সুতরাং কাল থেকে আপনি আসবেন না।'

'আসব না মানে ? আমার কাজই তো শুধু আসা আর যাওয়া।'

'কে বললে ?'

পার্শ্বোপবিষ্ট ম্যানেজারকে হেমেন্দু দেখিয়ে দিল। বড়-সাহেব ম্যানেজারের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে জিগগেস করলেন, 'কী, তাই বলেছ ?'

ম্যানেজার গোঁফে হাত বুলুতে-বুলুতে বললে, 'কত কথা কত সময়ে বলে থাকি তার ঠিক আছে ?'

'তাই বুঝি সন্ধেবেলা একটু পাখার হাওয়া খেতে আসেন এখানে ?' বড়-সাহেব ঘাড় পুনরায় সোজা করলেন।

'—আর দুটো আইসক্রীম।' হেমেন্দু হাসল।

'তবে যাবার আগে আজকের দুটোও খেয়ে যাবেন।'

'দরকার নেই।' হেমেন্দু উঠে দাঁড়াল। বললে, 'লোকে মাস্টার রাখে ছেলের ভাল করার জন্যে। আর আপনি রেখেছেন ছেলেকে নষ্ট করার জন্যে। নিজে কখনো বড়লোক হতেও পারব না, কাউকে বড়লোক বানাতেও পারব না। অতএব, নমস্কার। আমার যা পাওনা সুবিধে-মত পাঠিয়ে দেবেন একদিন।'

হেমেন্দু চলে যেতেই ম্যানেজার হঠাৎ আস্তিন গুটিয়ে ঘুসি পাকিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে বললে, 'আবার, ওকে আবার আমার মারতে ইচ্ছে করছে।'

বড়-সাহেব অবাক হয়ে গেলেন। 'সেকি ? ওকে তুমি মারলে কবে ?'

'মারি নি, তবে প্রথম যেদিন আসে সেদিন ওকে ভীষণ মারতে ইচ্ছে করেছিল। আজ আবার তেমনি ইচ্ছে করছে।' ম্যানেজার গোঁফ ছড়িয়ে হাসতে লাগল।

ছয়

চামেলির সঙ্গে সমীরের ঝগড়া হয়ে গেল। চামেলির জন্মদিন উপলক্ষে বোটানিক্যাল গার্ডেনে পিকনিক হবে ঠিক হয়েছে, সমীর তার কোন বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করবে কি না এই শুধু সে জানতে চেয়েছিল। সমীর বলেছিল একজনকে শুধু করবে, এবং সে কে জানতে চাইলে

সমীর দেখিয়ে দিয়েছিল একটা ধাঙড় ছেলেকে, রাস্তার গর্তের মধ্যে নেমে যে পাঁক ঘাঁটছে, আপাদমস্তক যার কাদায় মাখামাখি। তার অনুমান রুজ-পমেটম পালিশ-বার্নিশকে এই কাদার প্রসঙ্গে নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ করা হচ্ছে—এই থেকে ঝগড়ার সূত্রপাত, আর তার পরিসমাপ্তি ঘটল সমীরের হরতালে। সে উঁচু গলায় ঘোষণা করল যে সে যাবে না।

কনকলতা বললেন, 'ঐ ফ্যাসানের রাজ্যে তোকে ফ্যাসাদ বাধাতে যেতে বলি না, শুধু তোর মোটরটা আজ ওকে ছেড়ে দে।'

'দিতে পারি, যদি বুধি গয়লানির ছোট মেয়ে সোনামতিকে ও নিমন্ত্রণ করে।'

অনেক কষ্টে তাইতেই চামেলি রাজি হল। তবে সোনামতির জন্যে সিল্কের একটা ফ্রক, একজোড়া ঘুন্টি-বাঁধা জুতো আর কয়েক শিশি এসেন্স কিনে দিতে হবে। সমীর হেসে বললে, 'দেব। মনে রাখিস তোর জন্মদিনে এই আমার এবারের উপহার।'

সমীর খোঁজ নিয়ে জানল বাবার আপিসের গাড়িও চামেলি আদায় করে নিয়েছে। তার উপর বাড়ির হিলম্যানখানা আর পুরোনো ডজটা। এত যদি সে জানত তবে তার নিজের গাড়ি ছেড়ে দেবার আগে ওদের দলের মধ্যে ঢুকিয়ে দিত গোলাপি মেথরানীর মেয়ে সুভদ্রাকে।

তাদের কলেজ ফুটবল খেলে কি-একটা শীল্ড পেয়েছে বলে আজ ছুটি। এদিকে গাড়িটাও হাত-ছাড়া। কোন কাজে সমীরের মন বসল না, অতএব দুপুরের ট্রেনে সেও চলল কারখানায়।

'এই যে আপনি এসেছেন।'

কারখানার ফটকের কাছে সমীরকে হঠাৎ কে সম্ভাষণ করলে। সমীর চেয়ে দেখল, নবীন।

'খবর পাওয়া গেছে, হুজুর।'

'কার? কানাইয়ের?'

'হ্যাঁ,' বললে নবীন, কিন্তু তার মুখ যেন কেমন বিমর্ষ।

'কী খবর ?' একটু শঙ্কিত সমীরের প্রশ্ন।

'কলকাতার হাসপাতালে কী-একটা শক্ত অসুখ হয়ে সে পড়ে আছে। হাসপাতাল থেকে চিঠি পেলাম আজ।'

'নিশ্চয়ই তাহলে খুব শক্ত অসুখ।' সমীর ভিতর থেকে নড়ে উঠল। বললে, 'তা, এখনো যাও নি যে কলকাতা ?'

'বড়-সাহেব যে ছুটি দেন না।' নবীন অসহায়ের মত বললে।

'ছুটি দেন না, চেয়েছিলে ছুটি ? বলেছিলে তোমার ছেলের অসুখ ?'

'পায়ে ধরে বলেছিলাম।'

সমীর একবার নবীনের মুখের দিকে তাকাল। বললে, 'চিঠিটাও দেখিয়েছিলে ?'

'দেখিয়েছিলাম।'

'কী বললেন তারপর ?'

'বললেন—নিকালো, হবে না ছুটি।'

'কেন হবে না জিগগেস করলে না ?' সমীরের গলাটা কেমন অদ্ভুত শোনাল।

'তাঁর মুখের উপর কথা বলি এমন আমাদের সাধ্যি কী।'

সমীর ম্লান একটু হাসল। বললে, 'তবে আর কি, কালকে পর্যন্ত অপেক্ষা কর, ছেলের শেষ সংবাদটা পেয়ে যাবে।'

নবীন দু-চোখে হঠাৎ অন্ধকার দেখল, তার পায়ের নিচে পৃথিবী যেন টলছে। সে বসে পড়ল সমীরের পায়ের কাছে, শোকাকুল কণ্ঠে বললে, 'আপনি যদি একটু বড়-সাহেবকে বলেন আমার জন্যে! একটু যদি সুপারিস করেন!'

ছিটকে সরে গিয়ে সমীর বললে, 'আমি সুপারিস করতে যাব কেন ? আমার ছেলে বা আমার ভাই তো কেউ মরছে না। আর আমি চাকরিও করি না এই কারখানায়। আমার কী মাথা-ব্যথা!'

সমীর চলে যাচ্ছিল, পিছন থেকে নবীন ডুকরে ডুকরে কেঁদে উঠল, 'এখন তবে আমি কী করব?'

'হয় ছেলেকে একা-একা মরতে দেবে, নয় কাজে ইস্তফা দিয়ে সোজা চলে যাবে কলকাতা।'

আপিস-ঘরে হঠাৎ সমীরকে দেখতে পেয়ে বড়-সাহেব তো অবাক!

'একি, তুমি পিকনিকে যাও নি?'

তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করে সমীর বললে, 'ও তো একটা মেয়েদের ব্যাপার।'

'কেন, তোমার বন্ধুদের, স্যর নরেনের ছেলে আর জস্টিস ভাদুড়ির ভাগ্নেকে নিয়ে গেলেই পারতে।'

'একটি বন্ধুকে ও নিয়ে যেতে চেয়েছিল,' হাসি মুখে বললে ম্যানেজার, 'কিন্তু মোটের উপর চামেলি রাজি হয়নি।'

'কেন, রাজি হয়নি কেন?'

'মোটের উপর রাজি হয়নি, কেন না বন্ধুটির পরনে শুধু ন্যাকড়ার একটা ফালি, আর সর্বাঙ্গ কর্দমলিপ্ত।'

'সে কী কথা?' বড়-সাহেব চমকে উঠলেন, 'তার বাড়ি কোথায়?'

'তার বাড়ি ম্যান-হোলে।'

'তুমি কি একটা পাগল না গাধা?'

'আমি হয় গাবল নয় পাধা, মোটের উপর দুয়ের সংমিশ্রণ। গার্জেন আর ম্যানেজার। আমাকে এখন জেনম্যান বলে ডাকতে পারেন।'

তার অবিশ্বাস্য গল্পটা উড়িয়ে দিলেন বড়-সাহেব। সমীরকে বললেন, 'পিকনিকে না গিয়ে ভাল কর নি। কী দিলে চামেলিকে?'

টেবিল থেকে ম্যানেজার আবার মুখ তুলল। বললে, 'সিল্কের একটা ফ্রক, ঘুন্টি-বাঁধা একজোড়া জুতো—'

'ফ্রক!' বড়-সাহেব আঁৎকে উঠলেন।

সমীর হাসি চেপে রেখে বললে, 'বাড়ি ফেরবার সময় কিছু একটা কিনে নিয়ে যাব।'

'তাই নিয়ো। এসেছ কিসে ?'

'ট্রেনে। গাড়িটা চামু নিয়ে গেছে।'

ম্যানেজার গুম্ফ বিস্তার করে বললে, 'গাড়ি যায় দ্রুতগতি, পাশে বসে সোনামতি।'

তার কথায় কর্ণপাত না করে বড়-সাহেব বললেন, 'ট্রেনে এসেছ, কোন্ ক্লাসের টিকিট করেছিলে ?'

সর্বনাশ করেছে! সমীরের একদম খেয়াল হয় নি। যেখানে ভিড় আর অপরিচ্ছন্নতা, নিজেরও অলক্ষ্যে সেখানেই সে জায়গা করে নিয়েছিল, কল্পনাও করতে পারেনি তার জন্যে দরকার সুকোমল আরাম আর অভিজাত নির্জনতা। স্পষ্ট কণ্ঠেই সে বললে, 'থার্ড ক্লাস।'

বড়-সাহেব চেঁচিয়ে কি বলতে যাচ্ছিলেন, দেখলেন দরজার সামনে নবীন। সে যেন আরো কী এক স্পষ্ট কথা বলতে এসেছে—সমস্ত চোখ-মুখে তেমনি একটা রুক্ষ কঠোরতা।

কিছু তাকে জিজ্ঞাসা করতে হল না, সে নিজে থেকেই বললে, 'চাকরিতে আমি ইস্তফা দিলাম হুজুর। আমার দু-মাস সতেরো দিনের মাইনেটা চুকিয়ে দিন।'

ঘরের মধ্যেটা অস্বাভাবিক স্তব্ধ হয়ে গেল। এমন অসম্ভব কথাও কেউ বলতে পারে—কেউই যেন তা ধারণা করতে পারছে না।

ক্রুদ্ধ চোখে বড়-সাহেব তাকালেন একবার নবীনের মুখের দিকে। অনায়াসে নবীন সে-চোখের সম্মুখীন হল, একটুও স্খলিত বা সঙ্কুচিত হল না। বললে, 'আমার ছেলেই যদি মরে যায়, তাকে যদি দেখতেই না পারি শেষ সময়, তবে আমার চাকরি দিয়ে কী হবে ? নিজের পেট যে-করে হোক চলে যাবে, তার জন্যে কার ভাবনা! ঘাড়ে পড়ে আছে বুড়ো বোন আর তার এক ছেলে, তাদের জন্য মাথা ঘামাব না। তারা দেখবে তাদের নিজের পথ। দিন, আমাকে এবার ছুটি দিন।'

বড়-সাহেব এক মুহূর্ত কিছুই বলতে পারলেন না, খালি ভাবলেন এত বড় সাহস এ-লোকটার হল কী করে ? খানিক আগেও সে পায়ে

ধরে কেঁদে গেছে। তার সেই সজল চক্ষু-দুটি হঠাৎ এমন শুষ্ক ও প্রখর হয়ে উঠল কিসে?

দমিত রাগের চাপে তিনি এবার ফেটে পড়লেন। বললেন ম্যানেজারকে, 'দাও ব্যাটাকে ঘাড় ধরে তাড়িয়ে!'

'তাড়াতে হবে না, আমি নিজেই যাচ্ছি। শুধু আমার পাওনাটা ফেলে দিন।' পরিষ্কার নির্ভীক কণ্ঠে নবীন বললে।

—দেব না—কিছুতেই দেব না—না দিলে কী করবি তুই—এমনি ধরনের কতগুলি কথা বড়-সাহেবের প্রখর জিহ্বাগ্রে এসে পড়েছিল, কিন্তু সমীরের দিকে তাকিয়ে কিছুই তিনি বলতে পারলেন না। তাঁর স্বর আশ্চর্য রকম নরম হয়ে এল। বললেন ম্যানেজারকে, 'হিসেব করে ওর পাওনাটা চুকিয়ে দাও, আপদ বিদায় হয়ে যাক।'

টাকা নিয়ে নবীন যখন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, তার চেহারা দেখে মনে হল তার ফুর্তির আজ শেষ নেই। যেন কয়েদ থেকে খালাস পেয়েছে এমনি সে একটা ভাব করছে, কিম্বা শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পেয়েছে একটা হরিণ। সবাই ভাবলে, লোকটা যেমন মূর্খ তেমনি উন্মাদ।

এমনিতে নিয়মিত পুরোপুরি মাইনে পাওয়াটা তার প্রায় পূর্বজন্মের সাধনার মত ছিল, কিন্তু ইহজন্মে, মুখের একটি-মাত্র কথায়, অনেকগুলি টাকা তার হাতে এসে পড়েছে—নবীনের মাথাটা ঘুরে উঠল। অনেক কাট-ছাঁট করেও মেজ-সাহেব দু-কুড়ি তিন টাকার কম নামাতে পারেন নি—একসঙ্গে তা-ই নবীনের অনেক। নির্ঘাত সে বুঝতে পেরেছে, কানাই আর বেঁচে নেই—হাসপাতাল থেকে অমন একটা চিঠি আসার অর্থ শুধু ঐ একটাই। সে কাঁদবে না, কেঁদে কেউ কিছু করতে পারেনি পৃথিবীতে। না, সে হাসবে, আনন্দ করবে,—জীবনে একবার উপভোগ করবে সে অপব্যয়ের রোমাঞ্চ। তার ছেলেই যখন নেই তখন আর টাকার জন্য মায়া কিসের!

এই ভেবে সে বাজারে গেল, কিনল ধোলাই-করা ধুতি, ডবল-ঘরের সিল্কের শার্ট আর সাদা ক্যাসভাসের জুতো। শার্টের ঘরে

ঢুকিয়ে দিল সে রঙিন কাঁচের ঝকমকে বোতাম, বুক-পকেটটা ফুলে উঠল তার টাকা-বাঁধা রুমালের অহঙ্কারে। পানের দোকানের ঝাপসা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সে নিজেকে একবার ভাবল বড়লোক বলে— জীবনে এই প্রথম, হয়ত বা এইই শেষ—আর তার চোখে জল না এসে এল নিষ্ঠুর একটা আনন্দের দীপ্তি, যেটা প্রায় হাহাকারেরই কাছাকাছি।

পিছন থেকে কে বলে উঠল, 'সবই হয়েছে, সাত দিনের দাড়িটাই শুধু কামানো হয়নি।'

আরেক জন বললে অবাক হয়ে, 'এ কী হল রে, নবীন? বিয়ে নাকি আবার?'

নবীন শুধু বললে, 'বড়লোক হয়েছি।' তারপর যেই তাকে তার এই আকস্মিক রূপান্তরে বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করেছে, সবাইকে দিয়েছে সে এক উত্তর, 'বড়লোক হয়েছি।' এমনকি, এই অসময়ে, বিকেলবেলা সে দাড়ি কামাতে বসেছে কেন, নাপিতের এই প্রশ্নের উত্তরেও সে বলেছে, 'বড়লোক হয়েছি যে।'

সকাল-সকাল আজ ফিরতে হবে, তাই বিকেলের ট্রেন ধরতেই বড়-সাহেব স্টেশনে এলেন, সঙ্গে সমীর আর ম্যানেজার। বৈকালিক চা-টা স্টেশনের রেস্টোর‍্যাণ্টেই খাওয়া হবে এমনি ব্যবস্থা হয়েছে।

সুইং-ডোর ঠেলে তিনজন ঢুকলেন রেস্টোর‍্যাণ্টে। বেশ নিরিবিলি, শুধু কোণের টেবিলে প্লেট সাজিয়ে বসে আরেকজন কে খাচ্ছে। চেয়ার টেনে বসতে যাচ্ছিলেন সবাই, হঠাৎ সেই আরেকজনের উপর চোখ পড়তেই সবাই হতভম্ব হয়ে গেলেন। সে আর কেউ নয়, নবীন। একটা পঙ্কিল পোকা থেকে সে যেন হঠাৎ প্রজাপতি হয়ে উঠেছে। তার বেশবাস, চাল-চলন, খাওয়া-বসা সব এক নিমেষে গেছে বদলে, শুধু—এটা সমীর দেখল—তার ক্ষুধাটাই এখনো বদলায় নি।

লোকটার কী অমানুষিক আস্পর্ধা—এমনি ভাবের থেকে বড়-সাহেব

রেস্টোর‍্যান্টের ম্যানেজারকে জিগগেস করলেন, 'এ লোকটা এখানে বসে খাচ্ছে কেন ?'

রেস্টোর‍্যান্টের ম্যানেজার হকচকিয়ে গেল। বড়-সাহেবকে সে চিনত, তাই সম্ভ্রমের ভাবটা একটুও ক্ষুণ্ণ না করে বিনীত স্বরে বললে, 'খদ্দের এসে খেতে চাইলে তাকে ফেরাব কী করে ?'

'কিন্তু ও আপনার দাম দেবে ভেবেছেন ?' বড়-সাহেব ধমকে উঠলেন অকারণে।

'দাম না দিয়ে পালাবে কোথায় ?' রেস্টোর‍্যান্টের ম্যানেজার হাসল।

নবীন ঈষৎ চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, দাম দিয়েও খেতে পাবার বাধা আছে সে তা কল্পনা করতে পারত না, তাই সে টাকা-বাঁধা রুমালটা পকেট থেকে হঠাৎ বের করে বললে, 'না, আছে টাকা। নিজেকেই এতদিন ঠকিয়েছি, আর কাউকে ঠকাবার মতলব নেই। দিন আরেকখানা কাটলেট।'

'হাসছেন কী', বড়-সাহেব রেস্টোর‍্যান্টের ম্যানেজারের উপর মুখিয়ে এলেন, 'এইসব নোংরা ছোটলোকদের ঢোকান বলেই তো কেউ খেতে আসে না এখানে। হেটফুল !' বলে দোর ঠেলে দর্পিত ভঙ্গিতে তিনি বেরিয়ে গেলেন। সঙ্গে-সঙ্গে সমীরও, ম্যানেজারও।

এমন চমৎকার সাজগোজ করেছে, সদ্য-সদ্য দাড়িটা পর্যন্ত কামানো, তবু সে এখনো নোংরা ; এমন রাজকীয় ভঙ্গিতে স্টেশনের রেস্টোর‍্যান্টে বসে সে কাচের প্লেটে করে চপ-কাটলেট খাচ্ছে, তবু সে এখনো ছোটলোক ! ক্ষোভে, অভিমানে, হয়ত-বা প্রচ্ছন্ন রাগে নবীনের চোখদুটো জ্বালা করে উঠল।

বাইরে বেরিয়ে এসে সমীর বড়-সাহেবকে বললে, 'আমাদের চা-টা ওয়েটিং রুমে দিতে বলি ?'

'তা ছাড়া উপায় কী ! তাই বল তবে।' বড়-সাহেব গজরাতে লাগলেন, 'ওদিকে ছেলে মারা যাচ্ছে আর এদিকে ইনি কাজে ইস্তফা দিয়ে রাজভোগ খাচ্ছেন। মাইনে না দিয়ে চাবুক দিলে তখন ঠিক হত

ম্যানেজার গেল অর্ডার দিতে। ঘরে ঢুকেই নবীনকে লক্ষ্য করে বললে, 'কী হে নবীন, মোটের উপর একা-একাই সাঁটলে! আমি তোমাকে গুণে-গুণে টাকাগুলো দিলুম, আমাকেও নেমন্তন্ন করলে না?'

'ছোটলোকের নেমন্তন্ন খাবেন?' চোখ বড় করে নবীন জিগগেস করলে।

'আরে, ক্ষীর খাবার সময় কে জিগগেস করতে যায় দুধে জল ছিল কি না-ছিল! তা ছাড়া, তোমাকে আর ছোটলোক এখন বলে কে? মোটের উপর, এখন তুমি নবীন বাবু বা নব্য বাবু। দেখ, এক দিনেই বেশি খেয়ে ফেলো না।'

কলকাতার গাড়ি এসে দাঁড়ালো। তিনখানা সেকেণ্ড ক্লাস টিকিট কেটে বড়-সাহেব সদলে গাড়িতে গিয়ে বসলেন। গাড়ি তখন ছাড়ো-ছাড়ো, ভাঙা গলায় এঞ্জিন হাঁক পাড়ছে, হঠাৎ দরজা ঠেলে বড়সাহেবের কামরায় কে একজন ঢুকে পড়ল। যেন কে এক সম্ভ্রান্ত আগন্তুক, এমনি ভাব দেখিয়ে সমীর সরে গিয়ে বসতে জায়গা দিল তাকে।

'একি, তুমি?' বড়-সাহেব আঁৎকে উঠলেন।

নবীন নির্লিপ্তের মত কোঁচার খুঁটে মুখের ঘাম মুছতে মুছতে বললে, 'হ্যাঁ, কলকাতায় যাচ্ছি।'

'এ গাড়িতে যে?'

'এ গাড়িটাই পছন্দ হল।'

'জান এটা সেকেণ্ড ক্লাস?'

'আগে জানতাম না, ইস্টিশানের মাস্টারবাবু দেখিয়ে দেবার পর জানলাম।'

গাড়ি তখন চলতে শুরু করেছে। বড়-সাহেব গর্জন করে উঠলেন, 'টিকিট আছে তোমার?'

জানলা দিয়ে প্রাকৃতিক শোভা দেখতে-দেখতে উদাস গলায় নবীন বললে, 'টিকিট নেই তো গাড়ি চেপেছি কেন? ছোটলোক বলে টিকিট তো আর না-বেচে পারেনি।' নবীন বেশ আরাম করে হেলান দিল।

'কই, দেখি, কোন্ রঙের টিকিট ?' বড়-সাহেব এগিয়ে এলেন।

'সবুজ রঙের। আমি বেশ ভাল করে দেখেছি।'

'বুঝলে ম্যানেজার,' বড়-সাহেব ম্যানেজারকে লক্ষ্য করলেন, 'ককখনো ওর টিকিট নেই, ও বিনা-টিকিটে ট্র্যাভল করছে। তুমি পরের স্টেশনে নেমে টি-ট-আই বা স্টেশন মাস্টারকে খবর দেবে, ধরিয়ে দিতে হবে ওকে। পরের স্টেশন বেশি দেরি নেই।'

বেশ নড়ে-চড়ে বসে নবীন রুমালের কোণ থেকে সত্যি-সত্যিই একখানা সবুজ রঙের সেকেণ্ড-ক্লাস টিকিট বের করল। সেটাকে গর্বিত ভঙ্গিতে উঁচু করে তুলে ধরল। গর্বিত স্বরে বললে, 'আপনার টিকিটের যা দাম, আমার টিকিটেরও সেই দাম।'

'কই, দেখি!' বলে চক্ষের নিমেষে বড়-সাহেব ছোঁ মেরে সেই টিকিটটা কেড়ে নিলেন। বললেন, 'ককখনো এ তোর টিকিট নয়।' বলে একবার এ-পিঠ ও-পিঠ দেখে নিজের কোটের পকেটের মধ্যে রেখে দিলেন টিকিটটা।

মুহূর্তে নবীনের মুখ ছাইয়ের মত পাংশু হয়ে গেল। কাতর স্বরে বললে, 'বা, আমি ওটা নিজের পয়সায় কিনেছি!'

'কেউ বিশ্বাস করবে না!' বড়-সাহেব তাঁর নিজের জায়গায় ফিরে গেলেন।

'বেশ, আপনি ইস্টিশানের মাস্টারবাবুকে জিগগেস করবেন চলুন।'

'তুই নেমে গিয়ে জিগগেস করে আয়।'

'বা, আমার টিকিট ফিরিয়ে দিন!' কাঁদো-কাঁদো মুখে নবীন বললে।

'কিসের তোর টিকিট!' বড়-সাহেব স্বপ্নোত্থিতের মত বললেন, 'তোর টিকিটের আমি জানি কী? তুই তো চোরের বাপ জুয়াচোর, কোম্পানিকে ঠকিয়ে বিনা-টিকিটে গাড়ি চেপেছিস। কারখানার একটা কুলি, তুই চড়বি সেকেণ্ড ক্লাসে? একটা গাঁজাখোরও তো একথা বিশ্বাস করবে না।'

অবর্ণনীয় ভয়ে ও বিস্ময়ে নবীনের সমস্ত শরীর শিথিল ও ঠাণ্ডা হয়ে গেল। কী করবে, কী সে করতে পারে, কিছুই সে দিশে পেল না। একবার তাকাল সমীরের দিকে, সে মাথা নিচু করে বসে আছে। একবার তাকাল মেজ-সাহেবের দিকে, তিনি বসে-বসেই ঘুমুচ্ছেন, যেন এ-সব তাঁর কিছুই নজরে পড়ে নি।

বড়-সাহেব তক্ষুনি আবার উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, ম্যানেজারকে ঠেলা দিয়ে বললেন, 'ওঠ, পরের স্টেশন এসে গেছে। আর স্টেশন মাস্টার নয়, সটান পুলিশে ধরিয়ে দিতে হবে। শুধু বিনা-টিকিটে ট্র্যাভেল করছে নয়, ও এই গাড়িতে উঠেছে আমাদের পকেট কাটার জন্যে, কে জানে বা, গলায় ছুরি বসাবার জন্যে। নইলে বিনা টিকিটে ও সেকেণ্ড ক্লাসে উঠেছে কেন? কী ওর উদ্দেশ্য? পুলিশ—পুলিশ—চেন টেনে দাও, সমীর।'

নবীন দুই চোখে প্রলয়ের অন্ধকার দেখল। যতক্ষণ পকেটে টিকিটটা ছিল ততক্ষণ ছিল সাহস আর তেজ, সেটা অন্তর্হিত হতেই চিরকালের অভ্যস্ত ভীরুতা তাকে গ্রাস করে ধরল। মনে হল, পালানো ছাড়া বুঝি আর কোন উপায় নেই। দাবি করা, প্রতিবাদ করা, মিথ্যার কাছে হার না মানা—এসব জিনিস সে ভাবতেও পারল না। মনে হল কী যেন বিপদ তাকে ঘিরে ধরেছে—কে জানে, সে হয়ত চোর, সে-ই হয়ত সত্যিকারের অপরাধী। গাড়িটার বেগ এখন কমে এসেছে বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ থামে নি, তার মধ্যে টলতে-টলতে নবীন এগিয়ে গেল দরজার কাছে।

সমীর একবার ক্ষীণ নিম্নকণ্ঠে প্রতিবাদ করল, 'একি, কোথায় যাচ্ছ? বসে থাক চুপ করে।'

কিন্তু নবীন তা শুনল না।

'পালাল, পালাল, ধর, ধর, গেল পালিয়ে! কী ঝিমুচ্ছ বসে-বসে!' বড়-সাহেব ম্যানেজারকে কনুইয়ের গুঁতো দিলেন, 'এদিকে চোর যে দরজা খুলে দে-দৌড়!'

দরজা খুলে নবীন লাফিয়ে পড়েছে বটে, কিন্তু দৌড়ুতে পারেনি, তার লম্বা কোঁচার সঙ্গে ট্রেনের চাকাটা জড়িয়ে গেছে। আতঙ্কিত একটা চিৎকার করে সমীর শিকল টেনে দিয়েছিল বটে, কিন্তু সামনের স্টেশনে পৌঁছুবার আগে গাড়ি আর থামল না। যখন থামল তখন নবীনের দেহ কি কার দেহ সনাক্ত করাই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সাত

কলকাতার হাসপাতাল—মাত্র এটুকু খবরই সমীর সংগ্রহ করতে পেরেছিল, কিন্তু কোথায় সে হাসপাতাল কে জানে। জানলেও কে বলে দেবে কানাই এখনো বেঁচে আছে কি না।

অনেক হ্যাঙ্গাম-হুজ্জুতের পর অনেক দেরি করে ট্রেন পৌঁছেছে স্টেশনে। আর, পৌঁছনো-মাত্রই সমীর একটা ট্যাক্সির সন্ধানে ছুট দিল।

'একি, কোথায় যাচ্ছ?' শ্রান্ত, বিরক্ত কণ্ঠে চন্দ্রবাবু প্রশ্ন করলেন।

সমীর ফিরেও তাকাল না। বললে, 'কানাইয়ের একবার খোঁজ করতে। কে জানে, হয়ত এখনো ওর প্রাণটুকু প্রতীক্ষায় ধুকধুক করছে!'

চন্দ্রবাবুর মুখ সহসা পাংশু হয়ে গেল। নবীনের মৃত্যুটা তিনি আকস্মিক দুর্ঘটনা বলেই চালিয়েছিলেন এবং সবাই তাই অম্লান বদনে মেনে নিয়েছিল। সেই মৃত্যুর জন্যে দায়ী ছিল নবীনের নিজের হঠকারিতা, বড়-জোর পৃথিবীর অন্ধ মাধ্যাকর্ষণ। সবায়ের সঙ্গে নিজেকেও তিনি তাই বুঝিয়েছিলেন শেষ পর্যন্ত, কিন্তু হঠাৎ তাঁর খেয়াল হল সমীর যেন সেই ব্যাখ্যাটা মেনে নিতে মোটেই রাজি নয়। তাঁর বুকের ভিতরটা কে যেন ঠাণ্ডা মুঠিতে চেপে ধরল, সমীরকে বাধা দেবার কোন ভাষাই তাঁর গলায় এল না।

হতবুদ্ধির মত দাঁড়িয়ে ম্যানেজার তাই দেখল। কানাইয়ের খোঁজে সমীর ছুটল একটা উর্ধ্বশ্বাস ট্যাক্সি নিয়ে আর প্রতিবাদে বড়-সাহেব 'কনিষ্ঠ আঙুলটি পর্যন্ত উত্তোলন করলেন না, এটা প্রায় অভাবনীয়।

আর, সবচেয়ে আশ্চর্য, আরেকটা ট্যাক্সি নিয়ে বড়-সাহেব যখন অনায়াসে বললেন, 'চল আমরাও একটু খোঁজাখুঁজি করে দেখি গে।'

প্রথম হাসপাতালেই সমীর কানাইয়ের খোঁজ পেল—যদিও অনেক কুস্তি-কসরত করে, কাঠ-খড় পুড়িয়ে। শুনল, এখনো সে মরেনি, কেননা চিরকালের জন্যে চোখ বোজবার আগে বাবাকে নাকি সে একবার দেখে যেতে চায়।

সমীরের বুকের ভিতরটা উদ্বেল হয়ে উঠল। কিন্তু অসময়ে রুগীর সঙ্গে দেখা করতে দিতে ইন-চার্জ ডাক্তারকে কিছুতেই রাজি করানো গেল না। ডাক্তার ঠাট্টা করে বললে, 'খুবই তো দরদ দেখছি, এতদিন ছিলে কোথায়?'

'খবর পাইনি যে আগে।'

'কী হও তুমি রুগীর?'

'বাইরেটা দেখে হয়ত বিশ্বাস করকে চাইবেন না,' সপ্রতিভ মুখে সমীর বললে, 'কিন্তু আসলে ও আমার ভাই, আমরা একই মায়ের ছেলে।'

কথাটা ডাক্তার আপাত-অর্থেই গ্রহণ করল ও কিছুটা অপ্রস্তুত হল বোধহয়। পরে হাসিমুখে বললে, 'হাসপাতালের আইন-কানুনগুলো ভাইয়ের বেলাতেও নড়ানো যায় না। ভয় নেই, কাল সময়মত এসো, তোমার কানাইকে ঠিক দেখতে পাবে।'

'কাল পর্যন্ত তাকে টেনে নিয়ে যেতে পারবেন তো?'

'অনায়াসে। কেননা, আমার হাতের সঙ্গে যে এখন তোমার হাত এসে মিলেছে।'

সিঁড়ির ধাপের নিচে সমীর থ হয়ে দাঁড়াল—আর কিছু নয়, তার

বাবা আর ম্যানেজারকে দেখে। এবং, তার বিস্ময়ের অবধি রইল না যখন চন্দ্রবাবু তাকে কোন তিরস্কার না করে সরাসরি জিগগেস করলেন কানাই আছে কি না এখানে। যখন শুনলেন আছে, এবং সেইহেতু বাঁচবার আশাও আছে ষোল আনা, মুখের এমন একখানা ভাব করলেন যেন অত্যন্ত আরাম পেয়েছেন। কোটের যে-দিকটায় তাঁর মনিব্যাগ থাকে তার উপর জোরে কয়েকটা চাপড় মেরে তিনি উৎসাহ-উদ্বেল কণ্ঠে বললেন, 'যে করে হোক, বাঁচাতে হবে ওকে। যা কিছু দরকার হবে, যত টাকা লাগবে সব আমি দেব। কী হয়েছে ওর? ক্যাবিন যদি একটা ভাড়া নিতে হয়—'

'ক্যাবিন নয়, আমি ভাবছি ওকে বাড়ি নিয়ে যাব।'

'কোথায়?' চন্দ্রবাবু যেন ধাক্কা খেলেন।

'আমাদের বাড়িতে। ডাক্তার বলছে ওকে বেশ কিছুদিন বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে।'

'ব্যারামটা কী?'

'ব্যারাম নয়, মোটর-অ্যাকসিডেন্ট। চোট বিশেষ লাগেনি, শুধু বাঁ পা-টা খোঁড়া হয়ে যাবার সম্ভাবনা।' সমীরের গলাটা একবার কেঁপে উঠল: 'প্রসারিত বিশ্রামই নাকি এখন ওর একমাত্র চিকিৎসা। শুয়েই যখন থাকতে হবে তখন এখানে, এই বিশ্রী অ্যাটমসফিয়ারে কেন? নিয়ে যাব ওকে আমাদের বাড়িতে। শকটা আরেকটু ও সামলে নিলেই নাকি ওকে নিয়ে যাবার অনুমতি পাওয়া যাবে।'

চন্দ্রবাবুর মুখের সেই আরামের ভাবটা দেখতে-দেখতে মিলিয়ে গেল। তবু, কেন কে জানে, গলায় প্রভুত্বের তেজ আনতে পারলেন না। হয়ত নবীনের সেই ক্ষণকালীন আর্তনাদটা এখনো তাঁর কানে লেগে আছে। তাই তিনি যন্ত্র-চালিতের মত তাঁর আগের কথাটার নিষ্প্রাণ পুনরাবৃত্তি করলেন: 'হ্যাঁ, যে করে হোক, বাঁচিয়ে তুলতে হবে ওকে।'

কিসের থেকে যে কী হয়ে গেল কানাই কিছুই ধারণা করতে পারে না। বহু পথশ্রম করে গিয়েছিল সে দিদিদের গ্রামে, কিন্তু দিদির সে সন্ধান পেল না। শুনল তার ভগ্নীপতি নাকি কলকাতায় গিয়েছে কলে চাকরি করতে, তার দিদিকেও নিয়ে গিয়েছে সঙ্গে করে। খবরটাকে কেউ বললে সত্যি, কেউ বললে নয়। যাচাই করবার সুযোগ ছিল না, কেননা, দিদির শ্বশুর তাকে ঢুকতে দেয়নি বাড়িতে। তবু ধারে-কাছে এখানে সেখানে দু-দিন সে অপেক্ষা করল, যদি কখনো আচম্বিতে দিদির সে দেখা পায়, ক্ষণিক শুধু একটু চোখের দেখা। এক সময় মনে হল দিদিও নিশ্চয় কলকাতা চলে গিয়েছে, নইলে মধ্যরাত্রে তার ঘরের বেড়ায় চুপি-চুপি কান পেতে থেকেও কি কানাই তার একটিও কথা শুনতে পেত না? ছোট ভাইয়ের নাম করে কি ডেকে উঠত না সে ঘুমের মধ্যে?

নিরুপায় হয়ে কলকাতার মুখেই সে রওনা হল—কিছুটা ট্রেনে, বাকিটা পায়ে হেঁটে। নিষ্ঠুর নগরী তার কাছে মনে হল একটা গহন অরণ্যের মত। এখানে কোথায় তার দিদি কে বলে দেবে! এক রাস্তা থেকে আরেক রাস্তায় সে চলে আসে আর প্রতিক্ষণ সে উপলব্ধি করে এখানে তার জন্যে কোথাও এতটুকু আশ্রয় নেই, স্নেহ নেই এক কণা। এখানে দিদি সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। তবু, দিদিকে না পাক যদি দু-মুঠো অন্তত খেতে পেত সে, আরো কিছুক্ষণ চলতে পারত ইতস্তত। রাস্তার ওপারে হঠাৎ চোখ পড়ল একটা খাবারের দোকানে। শেষ পয়সাটি পর্যন্ত খরচ হয়ে গেছে, তবু উদ্‌ভ্রান্তের মত কানাই চলল সেই দোকানের দিকে, যদি দোকানি একটা অসাধ্যসাধন করে বসে। পৌঁছুতে হল না শেষ পর্যন্ত, রাস্তার মাঝখানেই সেই আকস্মিক দুর্ঘটনা।

তারপর তার জীবনে যে পরিচ্ছেদ এসে দেখা দিল সেটা আগাগোড়া স্বপ্নের। স্বপ্নের সেই দেবদূত এসে দাঁড়াল তার শিয়রে, ভালবেসে স্পর্শ করল তাকে, আর তার অসহ্য যন্ত্রণা নিমেষে দূর

হয়ে গিয়ে বেজে উঠল সুরের আনন্দ-নির্ঝর। এই ইট-কাঠের মধ্যেও ঈশ্বর আছেন! আত্মীয় হাসপাতাল থেকে চলে এল সে স্নেহের সংসারে, অনাস্বাদিত প্রচুরতার মধ্যে। হাসপাতালে চারিদিকে একটা শুধু রং ছিল, সেটা নিরানন্দ সাদা, আর এখানে বৈচিত্র্যের যেন শেষ নেই! এখানে কোথায় সে শুয়েছে, কী সে খাচ্ছে, কী তোয়াজে সে আছে! সমস্তই একটা অবিমিশ্র স্বপ্ন ছাড়া আর কী!

একেবারে তেতলাতেই জায়গা দেবে, সমীরের শোবার ঘরে, চন্দ্রবাবু এতটা ভাবতে পারেন নি। তবু, আপত্তিটা তিনি ছেলের কাছে সরাসরি উত্থাপন করবার সাহস পেলেন না, পেশ করতে গেলেন স্ত্রীর কাছে।

'কেন, নিচের কোন ঘরে জায়গা হলে কি ওর চিকিৎসার কিছু ব্যাঘাত হত?'

'কে শোনে কার কথা!' কনকলতা হতাশ মুখে বললেন, 'কিছু বলতে গেলে বলে—আর যার বেলায়ই কৃপণতা কর মা, রুগীর বেলায় কোরো না। যতদূর সাধ্য ওকে বিস্তৃত আরাম পেতে দাও।'

'তাই বলে একটা অজাত-কুজাতের ছেলেকে ও বাড়ির মধ্যে তুলে নিয়ে আসবে?' চন্দ্রবাবুর নাসারন্ধ্রদুটো স্ফীত হয়ে উঠল।

'ও বলে রুগীর নাকি কোন জাত নেই।' কনকলতা অসহায়ের মত হাসলেন: 'আরো বড়-বড় সব কথা বলে। বলে, ভোগের বেলায় লোকের শ্রেণীভেদ আছে বটে, কিন্তু রোগের বেলায় সবাই সমান। দেহের যন্ত্রণা একের থেকে অন্যের তারতম্য করতে শেখেনি।'

'হুঁ।' চন্দ্রবাবু ছোট একটি হুঙ্কার করলেন। বললেন, 'কিন্তু ওকে বলে দিয়ো এ বাড়ির মালিক আমি, এখনো সশরীরে বেঁচে আছি।'

'বলেছি অনেকবার—অত বাড়াবাড়ি করিস নে, উনি ভীষণ বিরক্ত হবেন।'

'কী বলে ও তার উত্তরে?'

'হাসে। বিশ্বাসই করতে চায় না যে তুমি ওর এই রুগী-সেবায় বিরক্ত হতে পার।' কনকলতা স্থির চোখে চাইলেন একবার স্বামীর মুখের দিকে: 'বলে, তুমিই নাকি কানাইকে বাঁচিয়ে তোলবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছ। নবীন নাকি তোমারই হাতে ওকে সঁপে দিয়ে গেছে।'

চন্দ্রবাবু বুকের মধ্যে আবার সেই একটা ঠাণ্ডা, অশরীরী স্পর্শ অনুভব করলেন। নিজের অলক্ষ্যে চঞ্চল হয়ে উঠলেন মনে-মনে। বললেন, 'হ্যাঁ, ভাল হয়ে উঠলে ছোঁড়াটাকে ওর বাপের কাজেই বসিয়ে দেব। কিন্তু পরিচর্যার যা নমুনা দেখছি, তাতে সে সহজে ভাল হতে রাজি হবে বলে তো মনে হয় না।'

'মা! মা!' নিচে থেকে চামেলি হঠাৎ চিৎকার করে উঠল, 'ড্রয়িং-রুম থেকে রেডিয়োটা গেল কোথায়?'

কনকলতা জানতেন, তাই তিনি সামান্য একটু হাসলেন। চন্দ্রবাবু বললেন, 'তার মানে? কোথায় রেডিয়ো?'

'আর কোথায়! সমীরের শোবার ঘরে, তেতলায়।'

'সেখানে কী?'

'সেখানে রুগী রয়েছেন আরামের প্রতীক্ষায়। যথাসাধ্য আরামে রাখবে রুগীকে, বাপে-পোয়ে এই নাকি ব্রত নিয়েছ শুনতে পাই।'

'ইমপসিব্‌ল্!' চন্দ্রবাবু সামনের টেবলের উপর একটা প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করলেন।

সহ্যের সীমা ক্রমশই পেরিয়ে যাচ্ছে বলে চন্দ্রবাবুর মনে হতে লাগল। ম্যানেজারের সঙ্গে পরামর্শ করার দরকার আছে বলে মনে করলেন না, নিজেই রাশ টেনে ধরতে গেলেন। সরাসরি ডেকে পাঠালেন সমীরকে।

সমীর কাছে এসে দাঁড়াল। বহুদিন পর বাবার সঙ্গে তার মুখোমুখি কথা হচ্ছে।

'তোমার পরীক্ষা তো কাছে এসে পড়ল।'

'হ্যাঁ।'

'কেমন হচ্ছে পড়াশুনো?'

'খুব ভাল হচ্ছে না।' সমীর হাসল।

'তা তো সহজেই অনুমান করতে পারছি। ভূতের বেগার খেটে-খেটে চেহারাটাও তো ভূতের মতন করে তুলেছ। এবার একটু নিজের চরকায় তেল দাও, কী বল?'

সমীর চুপ করে রইল।

'তোমার জন্যে আরেক নতুন মাস্টার ঠিক করেছি—হোল-টাইম টিউটর। টেস্ট হয়ে যাবার পর এই দুটি মাসই তোমার গুছিয়ে নেবার সময়।' চন্দ্রবাবু বাঁকা কটাক্ষ করলেন, 'এখন পরের পরিচর্যায় না লেগে নিজের পরিচর্যায় মনোযোগ দাও। সেটা অধর্ম হবে না।'

'না, এবার মনোযোগী হব। আপনি ভাববেন না।'

'তোমার জন্যে তত নয়, যত ভাবছি তোমার রুগীটির জন্যে।' ইজি-চেয়ারে পিঠটা ছেড়ে দিয়ে চন্দ্রবাবু উদাসীনের মত জিগগেস করলেন, 'রুগী-মহারাজ আজকাল কেমন আছেন জানতে পারি?'

'এখনো সম্পূর্ণ সুস্থ হতে পারছে না।' শান্ত মুখে সমীর বললে।

'কোনদিন পারবে বলেও তো মনে হয় না। এমন ঘর, বিছানা, খাওয়া, রেডিয়ো—কী দরকার ভাল হবার! তুমি কী বল, ইচ্ছে করবে কোনদিন ওর ভাল হতে? এ অবস্থায় কারু করে কখনো?'

'দু-দিন ধরে কিছুটা করে ও হাঁটছে, বাবা—'

'হাঁটছে? পারছে হাঁটতে?' চন্দ্রবাবু উঠে বসলেন, তাঁর গলার স্বরে আকস্মিক উল্লাসের ঝাঁজ ফুটে উঠল: 'তবে আর কী! দরজা খুলে দাও, পাখি এবার উড়ে পালাক।'

'কিন্তু পা-টা ওর এখনো খুব দুর্বল আছে, খোঁড়া হয়ে গেছে ও। ডাক্তাররা বলছে—'

'শুনো না ঐ ডাক্তারদের কথা। ওরা নিজের পায়ের উপর দাঁড়াতে দেবার মোটেই পক্ষপাতী নয়। ছেড়ে দাও ওকে, দেখবে ও ঠিক রাস্তা

ধরে সোজা চলে যেতে পারবে। যদি চায় তো',—চন্দ্রবাবু একটু আমতা-আমতা করলেন, 'ওর বাপের কাজটা বরং দিয়ে দিতে পারি।'

'অসম্ভব। ওর এই পঙ্গু অবস্থায় অমন কোন দৈহিক পরিশ্রমের কাজ ওর উপর চাপিয়ে দেয়াটা ঠিক হবে না, বাবা। যার একখানা পা অক্ষম, সে তার বরাদ্দ কাজই বা করবে কী করে?'

'তবে ওকে দিয়ে তুমি কী করতে চাও?' চন্দ্রবাবু চোখের তারা-ছুটোকে ছোট করলেন।

'ওকে আমি অন্য দিক দিয়ে উপযুক্ত করে তুলব ভাবছি।'

'কোন্ দিক দিয়ে? চুরি?'

'না। ওকে আমি লেখাপড়া শেখাব।'

'লেখাপড়া শেখাবে?' চন্দ্রবাবু কথাটা যেন আয়ত্ত করতে পারলেন না। ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে জিগগেস করলেন, 'কোথায়?'

'আপাতত আমার কাছে, বাড়িতে। পরে স্কুলে ভর্তি করে দেব। একেবারে বর্ণপরিচয় থেকে শুরু করতে হবে কিনা!' সমীর একটু হাসল।

'এ কী অদ্ভুত খেয়াল তোমার!' চন্দ্রবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। ক্রুদ্ধ মুখে বললেন, 'কোথাকার একটা ছোটলোকের ছেলেকে তুমি বাড়ির মধ্যে স্থায়ী জায়গা দেবে? ও হয়ে উঠবে আমাদের পরিবারের একজন?'

'তা ছাড়া উপায় কী, বাবা? আমরা ছাড়া ওর আর কে আছে? ওর বাবা তো আমাদেরই হাতে ওকে তুলে দিয়ে গেছে।' সমীরের গলা ঈষৎ আর্দ্র শোনাল।

'তাই বলে একটা চোর-ছ্যাঁচড়কে রাখবে তুমি বাড়ির মধ্যে?'

'চুরি করবার আর ওর প্রয়োজন হবে না, বাবা।'

চন্দ্রবাবু এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইলেন। পরে খানিকটা যেন অনুনয়ের সুরে বললেন, 'লেখাপড়া শিখিয়ে কী ফল হবে ছাই-ভস্ম?

তার চেয়ে ওর পক্ষে যা সম্ভব তেমনই কোন হাল্কা কাজে ওকে ঢুকিয়ে দেয়া যাক। খেয়ে বাঁচতে পারবে তাহলে।'

'না, না, বাবা, ওকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করতে হবে। ওর বাবা মরবার সময় সেই কথাই আমাদের বলে গেছে।'

'কী বলে গেছে ?' চন্দ্রবাবু চমকে উঠলেন। 'বলে গেছে ওকে লেখাপড়া শেখান ?'

'হ্যাঁ।' অবিচলিত কণ্ঠে সমীর বললে, 'বলে গেছে, যেন অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে ও ভাষা পায়, নিজের অধিকার সাব্যস্ত করতে পায় সাহস, মিথ্যার কাছে যেন কোনদিন হার না মানে। মুখ বুজে এক কোণে পড়ে থাকার ভীরুতা থেকে যেন পায় মুক্তি। সেই ভার আমাদেরই নিতে হবে, বাবা।'

'তাই বলে গেছে নাকি ?' হঠাৎ কী ভেবে চন্দ্রবাবু হো-হো করে হেসে উঠলেন।

এর দিন-কয়েক পরে এক দুপুরবেলা চন্দ্রবাবু হঠাৎ কারখানা থেকে বাড়িতে এসে হাজির, এবং বলা-কওয়া নেই, সটান উঠে গেলেন তেতলায়। সমীর এখন কলেজে, তাই এখনই প্রশস্ত সময়।

সমীরের শোবার ঘরে গিয়ে দেখলেন তার খাটে নরম ধবধবে বিছানার উপর শুয়ে কানাই রেডিয়ো শুনছে।

'এই ছোঁড়া, উঠে আয় দেখি !' চন্দ্রবাবু কানাইয়ের ঘাড় ধরে সজোরে আকর্ষণ করলেন।

মূঢ় দৃষ্টিতে কানাই দেখল, বড়-সাহেব, আর তাঁর ভঙ্গিটা ভীষণ যুদ্ধ-উদ্যত। ব্যাপারটা কী সে কিছুই বুঝতে পারল না।

'উঠে দাঁড়া এক্ষুনি।' চন্দ্রবাবু জোর করে কানাইকে মেঝের উপর দাঁড় করিয়ে দিলেন। বললেন, 'হাঁট্, হাঁট্ এবার, দেখি কেমন হাঁটতে পারিস।'

ভীত বিবর্ণ মুখে কানাই অতি কষ্টে খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে হাঁটতে লাগল।

'বাঃ, এই তো দিব্যি সেরে গিয়েছিস দেখছি।' চন্দ্রবাবু মুখ-বিকৃতি করে বললেন, 'তবে মিছিমিছি আর পরের বাড়িতে থাকা হচ্ছে কেন? কী, চুরি করার মতলব? না, মাগনা খেতে খুব মজা লাগছে?'

চারদিকে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকাতে-তাকাতে কানাই বললে, 'কী করব তবে?'

'কী করবি মানে? সোজা বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবি। রাস্তায় খেটে খাবি গে।'

'এই ভাঙা পা নিয়ে আমি কাজ করতে পারব?' করুণ চোখে কানাই তাকাল তার পায়ের দিকে।

'ভাঙা পা! তোর পা আমরা ভেঙে দিয়েছি?' চন্দ্রবাবু কানাইয়ের কান মলে দিলেন। বললেন, 'খেটে খেতে না পাস, ভিক্ষে করে খা গে যা। মরতে এখানে পড়ে আছিস কেন?'

'ওর পা আমরা ভেঙে দিই নি বাবা, কিন্তু ওর মাথা—মানে, ওর আশ্রয় আমরা ভেঙে দিয়েছি।'

চন্দ্রবাবু চমকে পিছন ফিরে চেয়ে দেখলেন, সমীর।

'একি, তোমার কলেজ নেই?'

'না, টেস্ট হয়ে যাবার পর আমাদের আর ক্লাস বসে না।'

'ও, হ্যাঁ, ঠিকই তো—আমি একেবারে ভুলে গিয়েছিলুম—আশ্চর্য! তোমার নতুন টিউটর এসেছেন? কেমন বুঝছ তাঁকে? ও, হ্যাঁ, ঠিকই তো—হোল-টাইম টিউটর।' বলতে-বলতে চন্দ্রবাবু শ্লথ পায়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

আট

তেতলায় আজকাল চন্দ্রবাবু যখন-তখন উঠে আসেন। থেকে-থেকে একটা উদগ্র কৌতূহল তাঁকে অসহিষ্ণু করে তোলে। আঁস্তাকুড়ের আরস্যুলা কী করে ক্রমে-ক্রমে বিচিত্রবর্ণ প্রজাপতি হয়ে উঠতে পারে এ একটা নিশ্চয়ই দেখবার জিনিস।

কিন্তু সেদিন সন্ধের পর যা তিনি দেখলেন তাতে তাঁর চোখকে তিনি সহসা বিশ্বাস করতে চাইলেন না। ভোগের অনেক উপকরণ ছড়িয়ে আছে কানাইয়ের চারপাশে এবং নির্বিবাদে সে তা গ্রহণও করছে অপরিমিত, চোখে তা ক্রমশ সয়ে আসছিল; কিন্তু অভাবনীয় এই দৃশ্য দেখে চন্দ্রবাবু দুয়ারের কাছে থমকে দাঁড়ালেন।

টেবিলের সামনে দরজার দিকে পিঠ করে পাশাপাশি দু-খানা চেয়ারে বসে আছে কানাই আর সমীরের নতুন মাস্টার সত্যকিঙ্করবাবু। মোটা-মোটা অক্ষরের একটা বাংলা বই থেকে সত্যকিঙ্করবাবু কানাইকে অজ-আম শেখাচ্ছেন।

'আপনার ছাত্র কোথায়?'

আচমকা ভয় পেয়ে সত্যকিঙ্করবাবু চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠলেন। দেখাদেখি কানাইও উঠে দাঁড়াল।

'আহা হা, আপনি দাঁড়াচ্ছেন কেন? আপনি বসুন। দুর্বল পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে যে আপনার কষ্ট হবে।'

সত্যকিঙ্করবাবু ভেবেছিলেন তাঁকেই বুঝি বলা হচ্ছে কিন্তু লক্ষ্য করে দেখলেন চন্দ্রবাবুর চোখ রয়েছে কানাইয়ের উপর। ব্যাপারটা তাঁর কাছে অত্যন্ত ঘোরালো মনে হল।

'আপনার ছাত্র কোথায়?' চন্দ্রবাবুর চোখ এবার নিক্ষিপ্ত হল সত্যকিঙ্করবাবুর মুখের উপর।

'ছাত্র? আমার ছাত্র? মানে, সমীর?'

'তবে আপনার ছাত্র কি ও?' চন্দ্রবাবু কানাইয়ের মাথায় আঙুলের একটা খোঁচা মারলেন। 'ওকে পড়াবার জন্যেই কি আপনাকে চাকরি দেওয়া হয়েছে?'

'আমিও আগে জানতুম আপনার ছেলে—সমীরকেই আমার পড়াতে হবে। কিন্তু সমীর আমাকে সেদিন বুঝিয়ে দিল, আমি নাকি আগাগোড়া মস্ত ভুল করে বসে আছি। আমার ছাত্র নাকি আসলে কানাই, ওকেই নাকি আমাকে সকাল-দুপুর-সন্ধে তিন বেলা পড়াতে হবে, একেবারে অ-আ থেকে শুরু করে। ও খোঁড়া হয়ে গেছে বলেই নাকি ওর জন্যে একজন হোল-টাইম টিউটরের দরকার।'

'সমীর—সমীর গেল কোথায়?'

'পড়তে যাচ্ছি বলে বই-খাতা নিয়ে খানিকক্ষণ আগে বাইরে বেরিয়ে গেছে।'

'আর আপনি কিনা বাড়ির মধ্যে পরম সুখে বসে আছেন!'

'সমস্তক্ষণ বাড়ির মধ্যে থাকব এই তো আমার সঙ্গে কনডিশান।'

'চুপ করুন। কী কনডিশান তা আপনাকে মনে করিয়ে দিতে হবে না। কোথায় গেছে, বলে গেছে কিছু?'

'সে তো সবাই জানে।' সত্যকিঙ্করবাবু একখানা নির্লিপ্ত মুখ করলেন। 'অনেক দিন ধরেই তো সন্ধের সময় সেখানে সে যাচ্ছে।'

'অনেক দিন ধরে! বলুন শিগগির ঠিকানাটা।'

ভয়ে-ভয়ে সত্যকিঙ্করবাবু ঠিকানাটা বলে ফেললেন।

'ম্যানেজার! ম্যানেজার!' দোতলায় তাঁর আপিস-ঘরে নেমে এসে চন্দ্রবাবু হাঁক পাড়তে লাগলেন।

অদূরে একটা পিঠ-তোলা চেয়ারে ছোট হয়ে বসে বা কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে ম্যানেজার একটা কাগজ পড়ছিল, অচঞ্চল উদাসীন গলায় বললে, 'কী, ফায়ার ব্রিগেড ডাকতে হবে?'

'ও! তুমি এখানে। শোন।'

'অত চেঁচিয়ে বললে মোটের উপর আমি কিছুতেই শুনতে পাই না।'

'শুনতে হবে না, তুমি উঠে এস।' চন্দ্রবাবু একটা সাদা কাগজ টেনে নিয়ে খসখস করে তাতে কি লিখলেন। 'একবার এই ঠিকানায় গিয়ে দেখে এস এক্ষুনি সমীর আছে কি না।'

'কোন্ ঠিকানা?' ম্যানেজার তড়াক করে লাফিয়ে কাগজের টুকরোটা কেড়ে নিল। বললে, 'ওখানে কী?'

'জানি না বলেই তো তোমাকে পাঠাচ্ছি। গিয়ে দেখে এস সেটা কার বাড়ি। সেখানে গেছে কি না সমীর। গেছে তো কী করছে।'

'যদি দেখি সেখানে সে আছে?'

'ব্যস, কার বাড়ি তা জেনে নিয়ে চুপ করে চলে আসবে।'

'আর কিছু নয়?'

'না।'

'তাকে নিয়ে আসব না?'

'না।'

'মোটের উপর, যদি দেখি সেখানে সে খুব বিপদে পড়েছে—'

'তা হলেও না।' চন্দ্রবাবু টেবিলের উপর অভ্যস্ত মুষ্ট্যাঘাত করলেন।

আধঘণ্টার মধ্যেই ম্যানেজার ফিরে এল। বিমর্ষ মুখ করে বললে, 'সমীর সেখানে আছে। এবং বেশ সুস্থই আছে। কোন বিপদেই সে পড়েনি।'

'কোথায় আছে?'

'যেখানে গিয়েছিলাম।'

'সেটা কি কোন বাড়ি না গাছতলা?' চন্দ্রবাবু মুখ বেঁকালেন

'বাড়ি। একতলার একটা ঘর।'

'কী করছে সেখানে?'

'একটা লোকের সঙ্গে বসে পড়ছে।'

'পড়ছে? বাড়িটা কার?'

ম্যানেজার মাথা চুলকোতে-চুলকোতে বললে, 'মোটের উপর সেইটেই জিগগেস করা হয়নি।'

'ইডিয়সি পার্সনিফাইড!' চন্দ্রবাবু একটা ব্যঙ্গবিকৃত মুখভঙ্গি করলেন : 'যে লোকটার সঙ্গে বসে পড়ছিল তার নাম জিগগেস করেছিলে?'

'না।'

'কেন না?'

'কেননা লোকটাকে চিনি।'

'চেন? কে সে?'

'বিধুভূষণ দত্ত। সমীরের আগের মাস্টার।'

চন্দ্রবাবু চেয়ারের গায়ে পিঠটা ছেড়ে দিলেন। ব্যাপারটার কিনারা পেলেন এতক্ষণে। বললেন, 'তাহলে ওটা বিধুবাবুরই বাড়ি?'

'মালিকি অর্থে কখনোই নয়, কেননা উনি ভাড়াটের ভাড়াটে।'

'বুঝলাম। এবার তবে একবার ঐ কিঙ্কর মাস্টারকে ডাক।'

সত্যকিঙ্করবাবু এক ডাকে উপস্থিত।

চন্দ্রবাবু তাঁকে একবার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলেন। বললেন, 'আপনি প্রস্তুত?'

প্রশ্নের মর্মার্থ কিছু না বুঝেই সত্যকিঙ্করবাবু চিরবাধিতের মত মুখ করে বললেন, 'সর্বদা।'

'তবে যেখানে আপনার যাবার আপনি চলে যান এই মুহূর্তে।'

এবার বিশদার্থ বুঝতেও সত্যকিঙ্করবাবুর দেরি হল না। বললেন, 'আমার কী অপরাধ?'

'আপনার অপরাধ অনেক।' চন্দ্রবাবু ভাবহীন অর্থাৎ নির্মম মুখে বললেন, 'তার মধ্যে দুটো শুধু জেনে রাখুন। এক, কী আপনার চাকরি তা আপনি ভুল করেছেন ; দুই, কার আপনি চাকর তাও আপনার মনে

থাকে নি। অতএব কোন কথা আমি শুনতে চাই না, আপনি অন্তর্ধান করুন।'

সত্যকিঙ্করবাবু একেবারে ভেঙে পড়লেন। হাতজোড় করে শোকাচ্ছন্ন গলায় বললেন, 'আমাকে এমনি করে পথে বসাবেন না। আমি বড় দরিদ্র, বৃহৎ পরিবার আমাকে পালন করতে হয়। বহু কষ্টে এই চাকরিটি পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করেছিলুম। এখন যদি এই তুচ্ছ কারণে চাকরিটি যায়, কী বলব আমি সবাইকে ফিরে গিয়ে?'

'নিজের বেলায় পরিবারটি খুব বৃহৎ করে দেখছেন, আর পরের বেলায় কারণটা খুবই তুচ্ছ।' চন্দ্রবাবু দাঁতে দাঁত চেপে বললেন।

'আমি অতশত বুঝতে পারিনি, স্যর। আমাকে সমীর বললে কানাইই আমার ছাত্র, তিন মাসে তাকে বর্ণপরিচয় থেকে বোধোদয়ে নিয়ে যেতে হবে। আমিও তাই সরল বিশ্বাসে—'

'এখানেও দেখছি সেই ভাড়াটের ভাড়াটে।' ম্যানেজার টিপ্পনি কাটল।

'আমি মিনতি করছি,' সত্যকিঙ্করবাবু সামান্য অবনত হলেন, 'আমাকে বিতাড়িত করবেন না। এবার থেকে ছাত্র না-হয় বদলে নেব স্যর।'

'ছাত্র বদলে নেবেন--কেন, আমরা মাস্টার বদলাতে পারি না?' চন্দ্রবাবু গর্জন করে উঠলেন।

'আবার—বার-বার মিনতি করছি, স্যর, আমি বড় অভাবগ্রস্ত!'

'দেখুন, এখানে, এ-বাড়িতে মিনতি করার রেওয়াজ নেই।' ম্যানেজার ফোড়ন দিল, 'আগে যে দু-জন মাস্টার ছিল তারা দু-জনেই, "meanঅতি!" —বলে সতেজ ভঙ্গিতে চলে গেছে। আপনাকেও তেমনি ভাবেই যেতে হবে।'

খানিকক্ষণ শূন্য চক্ষে চেয়ে থেকে সত্যকিঙ্করবাবু আস্তে-আস্তে মিলিয়ে গেলেন।

চন্দ্রবাবু নেমে এলেন নিচে, ড্রয়িং-রুমে। রেডিয়োটা স্বস্থানে

নামিয়ে আনা হয়েছে এবং কনকলতা আর চামেলি তাই উৎকর্ণ হয়ে শুনছে।

'এটা কী হচ্ছে? আধুনিক, না কাব্য-সঙ্গীত, না রাগপ্রধান?' চন্দ্রবাবু ঘরে ঢুকে জিগগেস করলেন।

চামেলি হেসে উঠল। বললে, 'দিল্লি থেকে হনুমান সিং সরোদ বাজাচ্ছে।'

'ওকে সিংহলে যেতে বল।' চন্দ্রবাবু রেডিয়োটা বন্ধ করে দিলেন। পরে একটা সোফায় বসে স্ত্রীকে লক্ষ্য করে অতিশয় গম্ভীর মুখে বললেন, 'একটা জরুরি পরামর্শ আছে। বঙ্কুটাকে ছাড়িয়ে দেব ভাবছি।'

বঙ্কু এ-বাড়ির ছোকরা চাকর।

কনকলতা আকাশ থেকে পড়লেন: 'কেন, করেছে কী?'

'কিছুই করেনি। কিন্তু এ বাড়িতে চাকরের সংখ্যা খুব বেশি বলে মনে হচ্ছে।'

'আহাহা, এ আবার কোন্-দিশি কথা!' কনকলতা মুখ বেঁকালেন: 'দরোয়ান নিয়ে চাকর মোটে বাড়িতে চারটে। ফুট-ফরমাজ খাটবার জন্যে হাতের কাছে ছোকরা চাকর একটা না থাকলে চলে কী করে?'

'বঙ্কুর জায়গায় কানাই কাজ করবে।' চন্দ্রবাবু রোষপুষ্ট কণ্ঠে বললেন।

'কে কাজ করবে? কানাই?' কনকলতা অসহায়ের মত মুখভঙ্গি করলেন।

'কেন করবেন না শুনি? উনি কি আমার পুষ্যিপুত্তুর? উনি খাবেন দাবেন, বিদ্বেন হবেন, ফাই-ফরমাজ খাটতে পারবেন না? আমি তো শোবার আগে আজ রাত্রেই ওকে হুকুম করব আমার পা টিপে দিতে।'

চিন্তাকুল মুখে কনকলতা বললেন, 'দেখ, এ নিয়ে বাড়াবাড়ি কোরো না। ছেলেমানুষের শখ হয়েছে, পাখি কিম্বা কুকুর না পুষে নিরাশ্রয় গরিবের ছেলে পুষছে তাকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করবার জন্যে।

দেখা যাক না কতদূর কী দাঁড়ায়। বাইরে থেকে আমাদের বাধা দিয়ে লাভ কী? সমীর বলে, প্রত্যেক লোকেরই motto হওয়া উচিত—Each one teach one. অন্ধকার থেকে আলোতে আনার যে কথা আছে তা নাকি এই।'

'পোষা পাখি অন্তত একবার হরিনাম আওড়ায়, পোষা কুকুর অন্তত চোর তাড়াবার জন্যে ঘেউঘেউ করে; কিন্তু এ গোকুলের কানাই সংসারের কোন্ উপকারে লাগছে জিগগেস করি?' চন্দ্রবাবু দার্শনিকের মত বললেন, 'তোমার কথাটাই আমি বলি। কোনো কিছু নিয়ে বাড়াবাড়ি করাটা ভাল নয়।'

এমন সময় সমীরের মোটরের শব্দ শোনা গেল। হঠাৎ ভারি একটা স্তব্ধতার পর্দা নেমে এল সেই ঘরের মধ্যে। সেই পর্দাটা উড়িয়ে দেবার জন্যে চামেলি গেল রেডিয়োর টার্নারটা ঘুরিয়ে দিতে, কিন্তু চন্দ্রবাবু বাধা দিলেন।

'তোমার নিশ্চয়ই আজকাল বাড়িতে বসে পড়াশোনার খুব অসুবিধে হচ্ছে। কানাই ছোঁড়াটা বুঝি খুব ডিস্টার্ব করছে সব সময়, দিনে-দিনে ক্রমশই একটা ন্যুইসেন্স হয়ে উঠছে বুঝি!'

'না বাবা', হাসিমুখে সমীর বললে, 'এক প্রোফেসরের বাড়ি গিয়েছিলাম।'

'সেই বিধু মাস্টারের বাড়ি তো?'

বিস্মিত হলেও সমীর বিচলিত হল না। তেমনি হাসিমুখেই বললে, হ্যাঁ।'

'তাকে আমি বরখাস্ত করে দিয়েছিলাম না?'

'দিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর পড়াবার অযোগ্যতাটা হয়ত তার কারণ ছিল না।'

'কী কারণ ছিল তা যে বরখাস্ত করেছে সেই জানে। যে লোক এখান থেকে বিতাড়িত হয়ে গেছে তার বাড়িতে গিয়ে আত্মীয়তা দেখাবার অর্থ কী?'

‘তিনি আমাকে পড়ান। এবং পড়াবার জন্যে কোথাও-না-কোথাও একটা স্থান দরকার।’

‘পড়ান—তাকে মাইনে দাও?’

‘দিতে চেয়েছিলাম কিন্তু তিনি নিতে রাজি হননি। বলেন— এইখানে সমীরের মুখ লজ্জার ঈষৎ করুণ হয়ে উঠল: ‘বলেন— আমাকে পড়িয়ে তাঁর যে আনন্দ সে-ই নাকি তাঁর পরিশ্রমের পুরস্কার।’

‘আর, এদিকে বাড়িতে যে মাস্টার আছে তাকে তোমাকে পড়াবার আনন্দ থেকে বঞ্চিত করছ কেন?’

‘মাসান্তে মাইনেটাই তাঁর লক্ষ্য, ছাত্র বা অধ্যাপনার বিষয়টা তাঁর লক্ষ্য নয়। তাই তাঁকে কানাইকে পড়াতে নিযুক্ত করেছি।’

‘তোমার নিয়োগটা মোটেই সুখের হয়নি,’ চন্দ্রবাবুর গলা যেন সহানুভূতিতে আবার আর্দ্র শোনাল: ‘কেননা তোমাকে পড়াবার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে তিনি হতাশ মুখে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছেন। কলেজের ছেলে পড়াতে এসে তিনি এখন আর প্রথম ভাগ নিয়ে বসতে পারেন না। মাইনেটা লক্ষ্য হলেও প্রথম ভাগের জন্যে মাসান্তে একশো টাকাটা তাঁর কাছে কিছু বেশি মনে হচ্ছিল।’

সমীর সহজেই বুঝল ব্যাপারটা কোথায় দাঁড়িয়েছে।

চলে যাচ্ছিল, চন্দ্রবাবু তাকে ডাকলেন। বললেন, ‘মাস্টারের অভাবে কানাইয়ের এখন চলবে কী করে?’

সমীর শান্ত মুখে বললে, ‘এখন আমাকেই সময় করে বসতে হবে আর-কি।’

সমীর এক দরজা ও চন্দ্রবাবু আরেক দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

‘বাবা, বাঁচলাম! এত ঠাণ্ডাতেও ঘরের হাওয়া কি-রকম গরম হয়ে উঠেছে! আমি রেগুলার ঘামছি!’ চামেলি উঠে দাঁড়াল, রডিয়োর কাছে এগিয়ে যেতে-যেতে বললে, ‘যাক, লাক্ষ্ণৌটা একবার ধরি।’

চন্দ্রবাবু তখনো সম্পূর্ণ অপসৃত হয়ে যাননি, কাছেই কোথাও পায়চারি করছিলেন বোধহয়, বাজনা শুরু হতেই অন্ধকার নেপথ্য থেকে বলে উঠলেন, 'তোর হনুমান সিং এরি মধ্যে অযোধ্যায় ফিরে এল নাকি ?'

চন্দ্রবাবুর গলা শুনে মুহূর্তে চামেলির মুখ চুপসে ফ্যাকাসে হয়ে গেল, কিন্তু একটু স্থির হয়ে কথাটা অনুধাবন করেই বুঝল অর্থটা মোটেই মারাত্মক নয়। তাই নির্ভয়ে সে একটু হাসির ঢেউ তুলল।

'বাবার গলা শুনে বুকটা এমন কাঁপছিল, মা!' কনকলতার কাছ ঘেঁষে বসে চামেলি ফিসফিস করে বললে।

তেমনি নিম্ন কণ্ঠে কনকলতা বললেন, 'কিন্তু আমার বুক কাঁপে সমীরের গলা শুনে।'

পরদিন সকালে নিয়মিত সময়ে পড়ার টেবিলে কানাইকে দেখতে না পেয়ে সমীর চিন্তিত হয়ে উঠল। কাউকে না বলে কোথাও চলে গেল নাকি ছেলেটা! ঘর-দোর কেমন যেন সব ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকছে। তেতলায় কোথাও সে নেই।

সমীর ডেকে উঠল, 'মা!' তরতর করে নেমে এল সে সিঁড়ি দিয়ে। কনকলতাকে পেল নিচে, বঁটি পেতে তরকারি কুটছেন। বললে, 'মা, কানাই কোথায় ?'

কনকলতা ভিতরে-ভিতরে চিন্তিত হলেও মুখে ঔদাসীন্য আনবার চেষ্টা করে বললেন, 'গাড়ি ধুচ্ছে।'

সমীর যেন ধাক্কা খেল। বললে, 'কোথায় ?'

'কোথায় আবার! গ্যারেজে।' কনকলতা চোখ নামিয়ে বললেন।

'কেন, চাকর নেই ?'

'থাকলেই বা। চাকর থাকলেও কি সংসারের কিছু ও সাহায্য করতে পারবে না ?'

কনকলতার চোখ এবারো আনমিত রইল।

সমীর ব্যস্ত হয়ে বাইরে বেরুল। যা দেখল তাতে তার গায়ের সমস্ত রক্ত জমে বরফ হয়ে গেল। দেখল দুই হাতে করে জল-ভর্তি ভারি একটা বালতি নিয়ে কানাই বাঁ পা-টা টানতে টানতে অতি কষ্টে গ্যারেজের দিকে এগিয়ে চলছে। আর এ-কাজের জন্যে প্রাত্যহিক যে চাকর নিয়োজিত সেই বংশীধর পরম নির্লিপ্ত মুখে বিড়ি টানছে বসে-বসে।

সমীর আবার দ্রুত ফিরে এল বাড়ির মধ্যে। বিচলিত, একটু-বা অভিভূত গলায় বললে, 'এ-কাজ একে কে করতে বলেছে মা?'

কনকলতা এক মুহূর্ত দ্বিধা করলেন। পরে নিজেই সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে বললেন, 'কে আবার বলবে! আমি বলেছি।'

'তুমি বলেছ? মা হয়ে তুমি তা বলতে পারলে, মা? একটা অনাথ রুগ্ন খঞ্জ ছেলেকে দিয়ে বালতি-বালতি জল বওয়াতে তোমার মা-র প্রাণ কেঁদে উঠল না?'

বঁটির উপরে কনকলতার হাতদুটো একবার কেঁপে উঠল।

'বেশ, তোমার চাকর-বাকরের এতই যদি অসুবিধে মা, আমাকে ডাকলে না কেন? আমি সব গাড়ি ধুয়ে দিতাম। এখনো আমিই না-হয় ধুয়ে দিচ্ছি।' বলে সমীর একটানে গা থেকে র‍্যাপারটা খুলে ফেললে, পা থেকে জুতোদুটো দিল ছুঁড়ে, মালকোচা মেরে শার্টের হাতা গুটিয়ে ছুট দিল বাইরে এবং অর্ধপথে কানাইয়ের হাত থেকে ছিনিয়ে নিল বালতিটা।

শ্রান্ত, কুণ্ঠিত মুখে কানাই বললে, 'আমিই পারব, আমার একটুও কষ্ট হচ্ছে না।' তবু বালতিটা সে ধরে রাখতে পারল না জোর করে। জল খানিকটা চলকে পড়ল সমীরের গায়ের উপর।

হাঁ-হাঁ করে ছুটে এল সব চাকর-বাকর, বংশীধরও নিশ্চিন্তে বিড়িটা শেষ করতে পেল না। কনকলতা পর্যন্ত ছুটে এলেন। এবং সবাই মিলে নিবৃত্ত করলে সমীরকে।

আকুল, উদ্বিগ্ন কণ্ঠে কনকলতা বললেন, 'তুই কি পাগল হয়েছিস খোকা?'

সমীর শান্ত অথচ দৃঢ় গলায় বললে, 'যে কাজ আমাকে দিয়ে করাতে পার না সে কাজ কখনো দিতে পারবে না কানাইকে।'

নয়

ঘরে বসে কানাই যেন কী করছিল, সমীরকে ঢুকতে দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে কী যেন সে লুকিয়ে ফেললে তাড়াতাড়ি, তার দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবার জন্যে দেয়ালের একটা ফোটোর দিকে চোখ তুলে খাপছাড়ার মত সে জিগগেস করলে: 'ওটা কার ফোটো?'

'আমার কাকামণির ফোটো।' সমীরের গলা ঈষৎ ম্লান শোনাল: 'আজ থেকে বছর চারেক আগে তাঁর কুড়ি বছর বয়সে তিনি মারা যান। আমার জীবনে তিনিই প্রথম আদর্শ পুরুষ ছিলেন—তিনিই প্রথম আমাকে শিখিয়েছিলেন ধনী আর গরিব ভগবানের সৃষ্টি নয়, মানুষের সৃষ্টি। প্রত্যেক পরীক্ষায় তিনি সোনার মেডেল পেয়েছেন আর সেগুলো আজ আমার কাছে আছে—ওদের দিকে যখনই আমি তাকাই, আমার চোখের সামনে তাঁর সেই দৃঢ়, দীপ্ত, সতেজ মুখ অবিকল ভেসে ওঠে।' বলে দুই হাত জোড় করে সেই ফোটোর উদ্দেশ্যে সমীর প্রণাম করল।

দেখাদেখি কানাইও যুক্তকরে প্রণাম করল সেই ফোটোকে। তার হাত দু-খানি আর সে লুকিয়ে রাখতে পারল না।

কৌতূহলী হয়ে সমীর চেয়ে দেখল কানাইয়ের দুই হাত কালি-মাখা। বুঝতে বাকি রইল না কালিটা কিসের।

'এ সব কী হচ্ছে?' সমীর ধমক দিয়ে উঠল।

কানাই আনত চক্ষে বললে, 'ভাবলাম আপনার জুতোগুলোই বা বাকি থাকে কেন?'

'আমি বলেছি আমার জুতোয় কালি লাগিয়ে দিতে?'

'বলেন নি। কেউ বলে নি। কিন্তু বাড়ির আর-সবাইয়ের জুতো পালিশ করে দেব, শুধু আপনার জুতোই ধুলো-মাখা হয়ে পড়ে থাকবে, তাই বা আমি সহ্য করি কী করে?'

রহস্যটা উদ্‌ঘাটিত হল এতক্ষণে। শক্ত কাজ তার শরীরের পক্ষে অনুকূল নয় বিবেচনা করে বড়-সাহেব কানাইকে হাল্‌কা কাজে নিযুক্ত করেছেন। যেমন, জুতোয় কালি দেওয়া, ঘর ঝাঁট দেওয়া, বিছানা পাতা, টেবিল গুছিয়ে রাখা, দরকার-মত কাছাকাছি দোকান থেকে এটা-ওটা কিনে নিয়ে আসা। এ-সবে তার একবিন্দু গ্লানি নেই, বরং বাড়ির সবাইকার কাজে সে লাগতে পারছে সাধ্যমত, তাতেই সে কৃতজ্ঞ, সুপ্রসন্ন।

কিন্তু গম্ভীর হয়ে গেল সমীরের মুখ। বললে, 'যাও, সাবান দিয়ে শিগগির হাত ধুয়ে এসো। জুতোয় কালি দেবার জন্যে চাকরের অভাব নেই এ-বাড়িতে।'

পরদিন আপিস যাবার প্রাক্কালে ঘরে ঢুকে যে-দৃশ্য চন্দ্রবাবুর চোখে পড়ল সেটা একেবারে রোমহর্ষক। দেখলেন, কালি আর বুরুশ নিয়ে মেঝের উপর বসে সমীর তাঁর জুতো সাফ করছে। নিমেষে তাঁর সমস্ত শরীর পাথর হয়ে গেল। জড়িত গলায় জিগগেস করলেন, 'একি? তুমি?'

সলজ্জ একটু হেসে সমীর বললে, 'হ্যাঁ বাবা, আমি। জিনিসটা নোংরা হলেও কাজটা মোটেই নোংরা নয়। তাই এতে কিছুই অপমান নেই। তা ছাড়া, কে জানে, হয়ত একদিন এই জুতো-পালিশ করেই জীবিকা নির্বাহ করতে হবে। সময় থাকতে একটু অভিজ্ঞতা করে রাখা মন্দ কী!'

'কিন্তু, কানাই—কানাই কোথায়?'

'সে পড়ছে আশা করি।'

জ্বলন্ত শলাকার মত উত্তরটা বিদ্ধ করল চন্দ্রবাবুকে। তবু ভিতরের

রাগ অতি কষ্টে দমন করে রেখে বললেন, 'কিন্তু এসব কাজ তো নিতান্ত হাল্‌কা। এ কাজ করতেও শ্রীমানের হাতে ফোস্কা পড়ে নাকি?'

'পড়বার কথা নয়, নিজেই দেখতে পাচ্ছি করে। আর আমাকে দিয়েই কাজটা যখন হয়, তখন ভেবে দেখলুম মিছিমিছি ওকে বিরক্ত করে কিছু লাভ নেই।'

চন্দ্রবাবু তবু বিরত হলেন না। চেঁচিয়ে ডেকে উঠলেন: কানাই, কানাই!'

ডাকটা সমীরের কানে ভাল শোনাল না। ক্ষুব্ধ গলায় বললে, 'আপনার কাজ হওয়া নিয়ে হচ্ছে কথা, কাজটা কে করে দিল সেটা মোটেই জিজ্ঞাস্য নয়। আর এটা নিশ্চয় ঠিক যে কানাইয়ের চেয়ে আমার কাজ অনেক ভাল খুলেছে। অক্স-ব্লাড আব ডার্ক ট্যানের তারতম্য ও কিছুই বুঝতে পারত না। দেখুন না আয়নার মত কেমন ঝকঝক করছে আপনার জুতো।'

চন্দ্রবাবু তবু প্রবোধ মানলেন না। কানাইয়ের উদ্দেশ্যে ডেকে উঠলেন পুনর্বার।

'বলুন, আর কী করতে হবে। আমিই করে দেব না-হয়।'

চোয়ালদুটো দৃঢ় করে চন্দ্রবাবু বললেন, 'কিছুই করতে হবে না তাকে। শুধু শ্রীমানের চেহারাটা আমি একবার দেখব। দেখব, তার ঘাড়ে কটা মাথা গজিয়েছে। আর দেখব, আমার এই মুঠোর মধ্যে তার ঘাড়টা ধরা যায় কি না।'

হাতের কাজ রেখে সমীর উঠে দাঁড়াল। সংযত, একটু-বা দৃঢ় গলায় বললে, 'আচ্ছা, তাকে ডেকে আনছি।'

কানাই তখন চামেলির ঘর ঝাঁট দিচ্ছিল—একটু-বা অভিনব প্রথায়। ঘর-ঝাঁট একবার সাঙ্গ হয়ে যায়, চামেলি আবার অমনি এক-কোয়া কমলালেবু চুষে ছিবড়েটা মেঝের উপর ছুঁড়ে মারে, বলে: 'ঐ তো ওখানে!' ছিবড়েটা কানাই ঝেঁটিয়ে নিয়ে যেতে-না-যেতেই আবার আরেকটা। ছিবড়ে ঘরের অন্য কোণ লক্ষ্য করে নিক্ষিপ্ত হয়, সঙ্গে সঙ্গে

চামেলির কণ্ঠে অভিযোগ ফুটে ওঠে : 'চোখে দেখতে পাস না? ঐ তো ওখানে।' এমনি করে বারে বারে ঝাঁটা চালিয়েও ঘর সে কিছুতেই সম্পূর্ণ পরিষ্কার করতে পারছে না।

এমনি সময় সে ঘরে আবির্ভাব হল সমীরের। কানাইয়ের হাত থেকে ঝাঁটাটা কেড়ে নিয়ে বললে, 'যাও, তোমাকে বাবা ডাকছেন।'

কানাই বোকার মত মুখ করে দাঁড়িয়ে রইল, আর চামেলির গলা দিয়ে কমলানেবুর রস যেন আর গলতে চাইল না। কোমর ভেঙে সমীর নির্বিবাদে ঝাঁট দিয়ে চলেছে।

চেয়ার ছেড়ে চামেলি তাড়াতাড়ি ছুটে এল, ঝাঁটাশুদ্ধু সমীরের হাতটা চেপে ধরে বললে, 'এ আবার কোন্ বাহাদুরি হচ্ছে?'

'বাহাদুরি তো তোর! নিজের ঘরটা পর্যন্ত ঝাঁট দিতে পারিস না, শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে তোর উপায় হবে কী!' ঝাঁটাটা চামেলির হাতে ছেড়ে দিয়ে সমীর তাকাল একবার কানাইয়ের দিকে। বললে, 'এখনো দাঁড়িয়ে আছ কেন? বাবা ডাকছেন যে।'

কোন্ কাজে না-জানি কী ত্রুটি করে বসেছে—সেই ভয়ে যেন কানাই এগুতে পারছে না। আর যার কাছ থেকে তার বল-ভরসা পাবার কথা সেই কিনা তাকে ঠেলে দিচ্ছে বিপদের সম্মুখে!

ভয়ে-ভয়ে কানাই জিগগেস করলে : 'কেন ডাকছেন বড়-সাহেব?'

'তোমার ঘাড়ের শক্তিটা পরীক্ষা করবার জন্যে।'

নিষ্পলক, নিষ্প্রাণ চোখে কানাই তাকিয়ে রইল।

'অর্থাৎ তোমার ঘাড় ধরে তোমাকে বাড়ির বার করে দেবার জন্যে। তার জন্যে ভয় করলে চলবে কেন? জীবনে সব রকম অবস্থার সম্মুখীন হবার সাহস না থাকলে বেঁচে সুখ কী? কিছু ভয় নেই,' সমীর কানাইয়ের হাত ধরে এগিয়ে গেল দরজার কাছে, 'সিঁড়ির নিচেই আমি দাঁড়িয়ে থাকব। তোমাকে যদি চলে যেতে হয় এ-বাড়ি থেকে ভয় নেই, আমিও তোমার সঙ্গে যাব। ঐ ঝাঁটা আর একটা বুরুশ

শুধু সঙ্গে নেব আমরা। পৃথিবীতে অনেক ময়লা, অনেক আবর্জনা জমা হয়ে আছে—আমাদের তা পরিষ্কার করতে হবে। যাও, জেনে এস কী হুকুম বড়-সাহেবের!'

নিচে, সিঁড়ির মুখে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে সমীর, কিন্তু কানাইয়ের আর দেখা নেই। অনেক পরে যখন সে এল, দেখা গেল দু-হাতে তার দুটো করে মস্ত কমলানেবু। মুখ তার হাসি-হাসি, চলার ধরনটা বেশ হাল্‌কা।

সমীর অবাক হয়ে গেল তার চেহারা দেখে। বললে, 'কই, তাড়িয়ে দিলেন না তোমাকে?'

তার চেয়েও বেশি বিস্মিত হয়েছে কানাই নিজে। বললে, 'কই, না তো! সে সব কথা তো কিছুই বললেন না। বরং আদর করে আমাকে চার-চারটে এই কমলানেবু খেতে দিলেন।'

'আমারই ভুল হয়েছিল তবে।' প্রফুল্ল মনে সমীর বললে, 'মাটির কলসী রাখতে-রাখতে কঠিন পাথর পর্যন্ত ক্ষয় হয়ে যায়, আর এ তো মানুষের মন।'

হিসেবে কিছু ভুল হয়েছিল সমীরের, কেননা সেদিন কারখানা থেকে ফেরবার পথে গাড়িতে চন্দ্রবাবু ম্যানেজারের কাছে কাতর মুখ করে বললেন, 'আমি আর পারলুম না হে বটকৃষ্ণ। এবার তুমি এর একটা বিহিত কর।'

ম্যানেজার উদাসীন ভঙ্গিতে বললে, 'কিসের?'

'এই কানাই ছোঁড়াটাকে কী করে তাড়ানো যায়, কোন দিকেই কোন পথ পাচ্ছি না। শেষ পর্যন্ত ঠিক করলুম ব্যাটার ঘাড় ধরেই সটান তাড়িয়ে দেব, শুনলুম তাহলে নাকি সমীরও তার অনুগামী হবে। ছোঁড়ার দৌরাত্ম্যে তো আমি হাঁপিয়ে উঠেছি, শেষকালে আমাকেও কিনা নৈবিদ্যি দিয়ে ওকে তোয়াজ করতে হচ্ছে! মারব ভাবলুম রদ্দা, দিতে হল কমলালেবু। নইলে উপায় কী বল? পথের ছেলের জন্যে তো আর ঘরের ছেলেকে খোয়াতে পারি না!'

'এখন আমাকে কী করতে হবে?' দু হাতেই বাইসিকেলের হ্যাণ্ডেল-দুটো দুলিয়ে ম্যানেজার একটা বীরত্বব্যঞ্জক ভঙ্গি করলে।

'যাতে ঐ ছোঁড়াটাকে আলগোছে বাড়ির বার করে দেয়া যায় তার একটা ব্যবস্থা তোমাকে করে দিতে হবে। নিজে কিছুই সুরাহা করতে পারলুম না, তাই এখন আমি তোমার শরণাপন্ন হচ্ছি।'

'মোটের উপর কোন্ কাজটা আপনি নিজে করতে পেরেছেন? এত বড় যে কারখানা, তাও এই ম্যানেজার না হলে চলত না। সেই আমার কাছেই যখন আসতে হবে, মোটের উপর, নিজে তখন ফোঁপরদালালি করতে গেছলেন কেন? আমার হাতে ভার দিন, এক হপ্তার মধ্যেই বাছাধনকে দেশছাড়া করে দেব।'

'পারবে—পারবে তুমি?' উৎসাহিত হয়ে চন্দ্রবাবু ম্যানেজারের হাতদুটো চেপে ধরলেন।

'যদি না পারি, তবে কী আর প্রতিজ্ঞা করব, আমার এই বাইসিকেলের হ্যাণ্ডেল ছেঁটে টুথ-ব্রাশ বানিয়ে ফেলব।'

অত্যন্ত ভীষণ প্রতিজ্ঞা, সন্দেহ নেই। কেনন, আর কেউ না হোক, চন্দ্রবাবু জানতেন কী নিষ্ঠুর অধ্যবসায়ের সঙ্গে সে সারা জীবন গুম্ফচর্চা করে এসেছে। তার সামান্যতম শিরশ্ছেদও স্বপ্নের বহির্ভূত।

কিন্তু, তবু, তাকে একটু সাবধান করে দেয়া দরকার। তাই চন্দ্রবাবু বললেন, 'তোমার কথায় আশ্বস্ত হলুম। কিন্তু, একটা কথা সর্বদা মনে রাখতে হবে। কানাইকে তাড়াবে বটে, কিন্তু দেখো, সমীর যেন ঠিক থাকে, তার মনে যেন না আঁচড় লাগে এতটুকু। মুস্কিল তো হয়েছে ঐখানে। নইলে ধার-ধারি-না এমন একটা লোককে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতে হাঙ্গাম কোথায়?'

'সেজন্যে আপনি কিছু ভাববেন না।' ম্যানেজার বহুদর্শীর মত অবিচলিত ভাবে বললে, 'মোটের উপর সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙবে না। আর তাই যদি না হবে, তবে এ-ব্যাপারে আমার মত লোকের মাথা গলিয়ে লাভ কী? আমার শরণ যখন নিয়েছেন,

তখন, মোটের উপর, আর ভয় নেই ; এখন শুধু গাড়িটা ফিরিয়ে নিয়ে চলুন।'

চন্দ্রবাবু চমকে উঠলেন : 'কোথায় ?'

'কারখানায়।'

'সেখানে কী ?'

'সেখানেই রয়েছে এর উপায়।'

চন্দ্রবাবু আর কোন প্রশ্ন করলেন না। গাড়ি কারখানায় ফিরে চলল।

সেদিন বিকেলে বেড়িয়ে বাড়ি ফিরে সমীর দেখতে পেল ড্রয়িং-রুমে একটা লম্বা সোফার উপর শরীর এলিয়ে দিয়ে ম্যানেজার শুয়ে আছে, আর কে-একটা ছেলে নিচু হয়ে টিপে দিচ্ছে তার-পা। ছেলেটা কিশোরবয়স্ক বলেই সমীরের সন্দেহ হচ্ছিল, কয়েক পা এগিয়ে এল সে কৌতূহলী হয়ে।

'ভয় নেই হে ভয় নেই,' ম্যানেজার ঘাড় কাত করে বললে, 'এ তোমার ব্রজের কানাই নয়।'

ছেলেটাকে যেন সমীরের খুব চেনা মনে হচ্ছে, কোথায় যেন সে দেখেছে তাকে। বললে, 'কে এ ?'

'আমি অধর, বাবু।' ছেলেটা সপ্রতিভের মত বললে, 'কারখানার কুলি-বস্তিতে আমি ছিলাম। আমাকে দেখে থাকবেন হয়ত।'

'এখানে এ এল কী করে ?' সমীর জিগগেস করলে ম্যানেজারকে।

'আর যাই হোক উড়ে এসে জুড়ে বসেনি।' ম্যানেজার ভুরু কুঁচকোলো : 'মোটের উপর, একে আমি চাকরি দিয়েছি এ-বাড়িতে।'

'কিসের চাকরি ?'

'আমার প্রাইভেট সেক্রেটারি। কিম্বা বলতে পার পার্সন্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট।' বলে ম্যানেজার গোঁফ দুলিয়ে হেসে উঠল। পরে নিজেকে সংশোধন করল হয়ত, বললে, 'নিজের বলে তো চাকর নেই একটাও, তাই এটাকে বহাল করেছি। বিদ্যাবুদ্ধির দৌড় তো আমার

জানই, তাই, মোটের উপর, উচ্চাশা বিশেষ নেই। একে মানুষ করতে না পারি, চাকরের দেশে একে একটি আদর্শ চাকর বানিয়ে তুলতে পারলেই আমি সার্থক।'

সমীর উপরে চলে গেল। দেখল কানাই টেবিলের উপর ভারতবর্ষের একটা মানচিত্র মেলে ধরে তীক্ষ্ণ চোখে সেটাকে পর্যবেক্ষণ করছে। সমীর তার তন্ময়তা ভেঙে দিয়ে বললে, 'একটা সুখবর আছে, কানাই। তোমার কারখানার সেই বন্ধু অধর এসেছে এ-বাড়িতে। মেজ-সাহেবের চাকর হয়ে। যাও, দেখা করে এস।'

আনন্দে চঞ্চল হয়ে উঠল কানাইয়ের মন। পুরোনো পরিচিত বন্ধুর দর্শনলাভের জন্যে তত নয়, যত তার সঙ্গে তুলনায় নিজের বহুলতর সম্পদ-সৌভাগ্যের উপলব্ধিতে। অধরটা আজও চাকর, তেমনি মাটির নিম্নস্তরে পড়ে আছে, আর সে দস্তুরমত বড়লোক, গর্বিত সুখশীর্ষে সমাসীন। তাকে ছুঁতে পারে অধরের আজ এমন সাধ্য নেই; তার নাগাল এই তেতলা পর্যন্ত পৌঁছুতে পারবে না। ইচ্ছে করলে অধরকে সেও চাকর বলে ব্যবহার করতে পারবে। অহঙ্কারে কানাইয়ের বুক ফুলে উঠল। পরনে ছিল তার সামান্য শার্ট, সেটার উপর চাপাল সে তার নতুন বুক-খোলা গরম কোট—যেটার বুক-পকেটের কোণে রুমালের রঙিন প্রান্তটা উঁকি মারছে। কোট চাপিয়ে চেহারায় সে একটা উদ্ধত আভিজাত্য আনল। পায়ের স্যাণ্ডেল বদলে পরে নিল সে নিউকাট অ্যালবার্ট—চলনে তেমনি একটা স্পর্ধিত মর্যাদা আনতে। অধর আজ চোখ মেলে দেখুক, সে-দিনের সেই অবজ্ঞেয় কানাই আর নেই, ইতিমধ্যে পৃথিবীর হাওয়া গিয়েছে বদলে।

কানাই সিঁড়ি দিয়ে নামছে দেখতে পেয়ে ম্যানেজার হকচকিয়ে উঠে বসল। সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে বললে, 'ঐ যে মিস্টার ল্যাং আসছেন। ল্যাং-সাহেবকে সেলাম, কর, অধর।'

অধর লম্বা এক কুর্নিশ ঠুকে বললে, 'সেলাম ল্যাং-সাহেব।'

সিঁড়ির মুখে কানাই নিস্পন্দের মত দাঁড়িয়ে রইল।

অধর ম্যানেজারকে প্রশ্ন করল: 'ওর নাম তো ছিল কানাই, এ বাড়িতে এসে ল্যাং-সাহেব হয়ে গেল কী করে?'

'দয়া করে উনি নেমে আসুন সিঁড়ি দিয়ে, অনায়াসেই বোঝা যাবে কেন ওঁর নাম হয়েছে ল্যাং-সাহেব।' ম্যানেজার তীক্ষ্ণ ভ্রূকুটি করল: 'মোটের উপর উনি তো কানা নন যে নাম কানাই হবে। উনি যে খোঁড়া, তাই ওঁর নাম হয়েছে ল্যাং। যেমন তৈমুর খোঁড়া ছিল বলে তার নাম হয়েছিল তৈমুর ল্যাং।' বলে ম্যানেজার উচ্ছ্বসিত হেসে উঠল।

খবরটা শুনে আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল অধরের চোখ, প্রতিহিংসার আনন্দে। কানাইয়ের দিকে চেয়ে বিদ্রূপ-বক্র গলায় বললে, 'আপনি খোঁড়া হয়েছেন, ল্যাং-সাহেব? হবেনই তো, হওয়াই তো উচিত একশো বার। মনে নেই, ঐ পায়ে আমাকে একদিন আপনি লাথি মেরেছিলেন? গরিবের শাপ কি না ফলে পারে?' বলে সেও বিকট অট্টহাস্য করে উঠল।

কানাই ধীরে-ধীরে ফিরে গেল তার ঘরে।

দশ

দিন-কয়েক যেতে-না-যেতেই একটা কাণ্ড ঘটে গেল। প্রাতরাশ সেরে আপিস-ঘরে গিয়ে বসতেই চন্দ্রবাবুর নজরে পড়ল টেবিলের উপর তাঁর ঘড়ি নেই। রোজ রাত্রে ঘুমুতে যাবার আগে হাত থেকে ঘড়ি খুলে রেখে যান তিনি টেবিলের উপর, আর রোজ সকালে কাঁটায়-কাঁটায় আটটার সময় তিনি তাতে চাবি দেন। ভীষণ দামী ঘড়ি, ব্যাণ্ডটা অবিকল সোনার। সে ঘড়ি আজ কিনা তিনি দেখতে পাচ্ছেন না!

'আমার ঘড়ি কোথায় গেল?' বর্জনির্ঘোষে চেঁচিয়ে উঠলেন চন্দ্রবাবু।

মুহূর্তে সমস্ত বাড়ি তোলপাড় হয়ে উঠল। বড়-সাহেবের টেবিলের উপর থেকে তাঁর হাত-ঘড়ি চুরি গেছে—এ অভাবনীয় দুঃসংবাদটা কেউ আয়ত্ত করতে পারছে না। ভয়ে সবাই উর্ধ্বদৃষ্টি, ভয়ে সবাই চোর বনে গিয়েছে। এমনকি সবাইয়ের চাউনি আর চেহারা বদলে গেল দেখতে-দেখতে।

শুধু ম্যানেজারই আসতে পারল এগিয়ে।

'আমি এখুনি পুলিশে টেলিফোন করে দিচ্ছি, নিশ্চয়ই এ কানাই হারামজাদার কাজ! দুধকলা দিয়ে ঘরে আমি কালসাপ পুষছি, ছোবল না দিয়ে কি ছাড়বে? দেখ দেখ—আর কিছু সরিয়েছে কি না এইসঙ্গে—মেয়েদের গয়নাগাটি, বাসনকোসন—'

'আপনি এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন?' ম্যানেজার আশ্বাসের সুরে বললে, 'মোটের উপর টেলিফোন হাতের কাছেই আছে, আর পুলিশও পালিয়ে যাচ্ছে না। আমরা নিজেরাই একটু খোঁজাখুঁজি করে দেখি না চোর ধরা যায় কি না।'

'চোর তো সবাইয়ের জানা-ই।' চন্দ্রবাবু নাসারন্ধ্রের ভিতর থেকে ক্রুদ্ধ হুঙ্কার করলেন, 'কিন্তু জিনিস পাওয়া যাবে কি না তাই বল।'

'আমার তো খুবই আশা বমালশুদ্ধ চোর আমি ধরে ফেলব।' ম্যানেজার অভয় দিল: 'আর মোটের উপর, হাতে-নাতে যখন ধরা যায়নি তখন অকাট্য প্রমাণ না পেলে কাউকে অযথা সন্দেহ করা আমাদের ঠিক হবে না। আপনি যদি অনুমতি করেন তো আমি একটু গোয়েন্দাগিরি করে দেখতে পারি। আর, আমার অনুরোধ, মোটের উপর আপনি অমন চেঁচামেচি করবেন না। বেশি হৈ-চৈ হলে চোর হয়ত মাল সরিয়ে ফেলবে।'

নিতান্ত ইচ্ছার বিরুদ্ধেই চন্দ্রবাবু গাম্ভীর্য অবলম্বন করলেন।

আর, ম্যানেজার সটান তেতলায় এসে উপস্থিত হল। সমীরের পড়ার ঘরে। পাশাপাশি দুই টেবিলের কাছে বসে সমীর আর কানাই যেখানে পড়ছে।

'তুমি যদি অনুমতি কর তো তোমার ঘরটা একটু খানাতল্লাসি করে দেখতে পারি।'

সমীর চমকে উঠল। 'তার মানে?'

'তার মানে, বড়-সাহেবের রিস্ট-ওয়াচটা পাওয়া যাচ্ছে না, নিজের থেকে পাখা মেলে সেটা উড়ে পালায় নি বলেই তাঁর ধারণা। মোটের উপর, এ ব্যাপারে তিনি আমাকে টিকটিকি নিযুক্ত করেছেন।'

'টিকটিকি মানে?'

'ডিটেকটিভের বাঙলা চেহারা। আমার উপর ভার পড়েছে ঘড়ির কিনারা করা। অনেক ঘরই ঘুরে এসেছি, এবার একবার তোমার ঘরটা খুঁজতে হবে।'

এক ঝটকায় সমীর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। বললে, 'আপনি কি তবে বলতে চান আমিই সেই ঘড়ি চুরি করেছি?'

'আমি কিছুই বলতে চাই না। ঘড়ি পাওয়া যাবার পর তুমি কী বলতে চাও সেইটেই জিজ্ঞাস্য।'

'দেখুন খুঁজে।' সমীর আবার তার পড়ায় মনোনিবেশ করলে।

প্রথমটা ম্যানেজার টেবিলের তলা, দরজার আড়াল, ছেঁড়া-কাগজের ঝুড়ি এমনি কয়েকটা অরক্ষিত জায়গা পর্যবেক্ষণ করলে। পরে এগিয়ে এসে বললে, 'ব্র্যাকেটের ঐ জামাগুলোর পকেট একবার হাঁটকানো দরকার।'

দেয়ালের ঐ ব্র্যাকেটে সাধারণত কানাইয়েরই জামা রাখার কথা, কিন্তু তার সঙ্গে কোন তফাৎ নেই দেখাবার জন্যে সমীরও দরকার-মত সেটা ব্যবহার করে।

'যা ইচ্ছে হয় আপনি করুন। কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হবার আপনার কারণ নেই।'

সলজ্জ মুখভাব করে ম্যানেজার বললে, 'যে-কোন অবস্থাতেই হোক, মোটের উপর, অন্য কারু পকেটে হাত দেওয়াটা আমি শিষ্টাচার বলে মনে করি না। তোমার শিষ্যটি কী মনে করেন?'

ভয়ে ও লজ্জায় কানাই পাংশু হয়ে গেল।

'আচ্ছা, আমিই খুলে দেখাচ্ছি আপনাকে জামার পকেটগুলো।' বলে সমীর ব্র্যাকেট ঘাঁটতে শুরু করল। আর, এমনি অসম্ভব ব্যাপার, প্রথম কোটটাতে হাত দিতেই তার পাশের পকেট থেকে বেরুল সেই ঘড়ি।

হতবদ্ধির মত সমীর দাঁড়িয়ে রইল কতক্ষণ। একটু-বা জড়িত গলায় বললে, 'কী আশ্চর্য, এই ঘড়ি এইখানে, এই জামার পকেটে এল কী করে?'

ম্যানেজার একটি তীক্ষ্ণ ও বঙ্কিম দৃষ্টি কানাইয়ের দিকে নিক্ষেপ করল। বললে, 'তুমি বুদ্ধিমান, মোটের উপর, নিজেই সহজে অনুমান করে নিতে পারবে। ঘড়ি নিশ্চয়ই আর হেঁটে উঠে আসেনি উপরে।' বলে সমীরের হাত থেকে ঘড়িটা সে তুলে নিলে। একটু গর্বের ভাব করে বললে, 'এত সহজেই যে চোর ধরা পড়বে গোড়াতে আশা করা যায়নি। সন্দেহটা ঠিকই করেছিলাম মোটের উপর। অঙ্গারঃ শতধৌতেন—কী না-জানি বলে তোমাদের সংস্কৃতে--' ঘড়ি হাতে করে প্রফুল্লমুখে ম্যানেজার প্রস্থান করল।

আবার শান্ত নির্লিপ্ত মুখে সমীর তার পড়া নিয়ে বসল। ভয়ানক কিছু একটা ঘটে গেছে এমন কোন আভাস নেই তার চেহারায়। আশ্চর্য, পাশে-বসা কানাইকেও সে কোন কথা জিগগেস করলে না।

কোন একটা কিছু বলতে না পেয়ে কানাই মরে যাচ্ছিল। এতক্ষণ ভয়ে তার বুকের ভিতরটা দপ্-দপ্ করছিল, এখন এই ভয়ঙ্কর স্তব্ধতায় তার মনে হল সে যেন নিশ্চল পাথর হয়ে গিয়েছে। তার দেহে যেন আর রক্ত বইছে না, সে যেন চোখে আর দেখতে পাচ্ছে না পৃথিবী।

'আমি এ-ঘড়ি চুরি করিনি'—প্রাণপণে বলতে চাইল সে চেঁচিয়ে, কিন্তু গলা দিয়ে তার আওয়াজ বেরুল না, কে যেন নৃশংস মুঠিতে তার টুঁটি টিপে ধরেছে।

'আমি এর কিছুই জানি না।' অনেক কষ্টে আর্দ্র কণ্ঠে কানাই বললে।

'চুপ কর!' সমীর ধমক দিয়ে উঠল।

কতক্ষণ পরেই সিঁড়িতে বড়-সাহেবের ভারি পায়ের শব্দ শোনা গেল। কানাইয়ের মনে হল সমস্ত দিঙ্মণ্ডল যেন একাকার হয়ে গিয়েছে অন্ধকারে, প্রকাণ্ড আকাশটা যেন ঝুপ করে খসে পড়েছে মাটির উপর। রাস্তার সে একজন, রাস্তাতেই সে আবার নেমে যাবে; কিন্তু চতুর্দিকে তার পথ গিয়েছে বন্ধ হয়ে। এই ঘর যেন একটা জেলখানা, একটা আতঙ্কময় অন্ধকূপ!

চন্দ্রবাবু হুঙ্কার করলেন, 'একি, তুমি এখনো হতভাগাকে বাড়ির বার করে দাওনি?'

সমীর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। নম্র অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বললে, 'না। কেননা আপনার ঘড়ি ও চুরি করেনি।'

'চুরি করেনি?' চন্দ্রবাবু একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। 'ওরই কোটের পকেট থেকে আমার ঘড়ি বেরুল আর তুমি বলতে চাও ও চোর নয়?'

'তাই যদি বলেন তবে চোর আমি। কেননা কোটটা আমার।'

'তোমার?'

'হ্যাঁ, আমার। আসল যে চোর সে কানাইয়ের সবগুলি কোট এ অল্প কয়দিনের মধ্যে চিনে নিতে পারেনি। তাড়াতাড়িতে ভুল করে আমারই কোটের পকেটে রেখে গেছে। আমার জামা কাপড় যে অস্পৃশ্যতা মেনে চলে না, তারা যে কখনো-সখনো কানাইয়ের জামা-কাপড়ের সঙ্গে ঘেঁষাঘেঁষি করে একই ব্র্যাকেটে থাকে, চোরের তা জানবার কথা নয়।'

চন্দ্রবাবুর ধাঁধা লেগে গেল। তবু ঝাঁঝালো গলায় বললেন, 'কে জানে হয়ত কানাই-ই কারসাজি করে তোমার কোটের পকেটে ঘড়িটা সরিয়ে রেখেছে।'

'আমি তা বিশ্বাস করি না। কেননা যদি ওর ঘড়ির দরকার হত তবে সকলের আগে জানাত তা আমাকে।'

'তোমার বুদ্ধির তারিফ করতে পারলুম না। ঘড়ির ব্যাণ্ডটার কথা ভেবে দেখেছ?'

'দেখেছি। ব্যাণ্ড বেচে পয়সা জোগাড় করার চেয়ে আমার কাছে তা চেয়ে নেয়া অনেক সহজ।'

'তবে ঘড়ি এখানে এল কী করে?' চন্দ্রবাবু পুনরায় ঝাঁঝিয়ে উঠলেন।

'কানাই আপনার টেবিলের উপর থেকে চুরি করে এনেছে—সেই প্রশ্নের এই মাত্র ব্যাখ্যা নয়।'

'তবে ব্যাখ্যাটা কী, বল।'

'তা বরং মামাবাবুকে জিগগেস করুন। তিনি যেমন ধুরন্ধর গোয়েন্দা, তাঁর পক্ষেই সমাধানটা সহজ হবে।'

'সে তো তোমার ঐ শ্রীমানকেই সন্দেহ করছে।'

'যে-যুক্তির বলে করছে তাতে আমারই চোর বলে সাব্যস্ত হওয়া উচিত। আমার ঘর, আমার কোট, আর কানাই আমারই সাকরেদ। অতএব এর জন্যে কাউকে যদি বাড়ির বার করে দেবার দরকার হয় তবে শুধু আমাকে।'

চন্দ্রবাবু বুঝলেন এতেও কানাইকে তাড়াবার সে পক্ষপাতী নয়। যুক্তিটা প্রবল না দুর্বল সেটা তাঁর লক্ষ্য নয়, একটা উপলক্ষ পাওয়া গেলেও তাকে তাড়ানো যাবে না সেইটেই অসহ্য। তিনি তাই ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'তবে ওর হাতে শেষ সর্বনাশের জন্যে তুমি আমাদের অপেক্ষা করতে বল নাকি?'

'আমাদের একটা সোনার ঘড়ি বা আর-কিছু নিয়ে ও আমাদের

কী সর্বনাশ করবে, বাবা ? সমীর একটু হাসল, 'ওর আমরা যা সর্বনাশ করেছি তার তুলনায় তা কী !'

আবার সেই অদৃশ্য নরম ক্ষতে সমীর আঙুল ঠেকাল, শিউরে উঠলেন চন্দ্রবাবু। অসহায়ের মত চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ম্যানেজার! ম্যানেজার! বার কর তবে কে চুরি করেছে! আমি হাতে-নাতে প্রমাণ চাই। ওপর-ওপর অমন সন্দেহ করলে চলবে না। প্রুভ টু দি হিল্ট। ম্যানেজার!' বলতে বলতে তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

সমীর ফিরে দাঁড়িয়ে দেখল কানাই কান্নায় ভেসে যাচ্ছে। এত তাকে কেউ ভালবাসে, এত তাকে কেউ বিশ্বাস করে এ যেন কল্পনা করা যায় না। এই বিশ্বাসের সে উপযুক্ত হবে কী করে, এই ভালবাসার সে প্রতিদান দেবে কী ভাবে—এই ভেবেই কান্না তার উদ্বেল হয়ে উঠল।

'একে এতক্ষণ এই বাজে হাঙ্গামা, তার উপর তুমি যদি এখন কাঁদতে বস তাহলে আমার আর পড়া হয় কী করে ? তুদিন বাদে যে আমার পরীক্ষা তা তোমার খেয়াল নেই বুঝি ?' সমীর বসল আবার চেয়ার টেনে। কানাইয়ের মুখের কাছে মুখ এনে ফিস্‌-ফিস্‌ করে বললে, 'একটা কথা আমার শোন। অধরের সঙ্গে বেশি মিশো না। আর ওকে আসতে দিও না তেতলায়।'

পরাক্ষাটা নির্বিঘ্নে সাঙ্গ হয়ে গেল সমীরের। পরবর্তী ছুটিছাটায় সে এখন কোথায় যায় এই নিয়ে বাড়িতে অনেক জল্পনা-কল্পনা চলছে : কাশ্মার থেকে কুমারিকা অনেক কিছুই ভেসে উঠছে সবাইয়ের চোখের উপর, কিন্তু সমীর সবাইয়ের চোখ ধাঁধিয়ে দিল যখন ঘোষণা করল যে সে যাবে কানাইয়ের পিসি-বাড়িতে, আকাট অজ-পাড়াগাঁয়ে সঙ্গে কানাইও যে যাবে সেটা আর স্পষ্ট করে বলে দিতে হবে না।

'কোন ভদ্রলোক যায় নাকি ওসব বুনো জায়গায় ?' কনকলত আপত্তি করলেন।

'এখনো যে অত ভদ্রলোক হতে পারিনি সেই একমাত্র সান্ত্বনা, মা।

সমীর হাসল। 'নইলে তেমন একটা নামজাদা কিছু হতে পারলে, আমি গ্রামে যাব শুনে রাতারাতি সেটা শহর বনে যেত। কাঁচা মাটির রাস্তা সব মেরামত হয়ে যেত, কোথাও এতটুকু ধুলো-কাদা থাকত না, যেখান দিয়ে জল ভেঙে চাষারা হাটে যায় সেখানে নতুন বাঁশের সাঁকো বসে যেত, চাষাদের ঘর ছাওয়া হয়ে যেত নতুন হলদে খড়ে, যাদের মাটির দেয়াল তাদের চুনকাম হয়ে যেত আগাগোড়া। রোগা-রোগা গরুগুলোকে সরিয়ে রেখে পশ্চিমি গয়লাদের জাঁদরেল সব গাই চেয়ে এনে দেখিয়ে দিত কেমন জোরালো এখানকার জলবায়ু। আমার জন্যে ডে-লাইট আসত, ভাবতুম এখানকার কারুর ঘরেই অন্ধকার নেই এক-রাত। আমার জন্যে বাজত ব্যাণ্ড, ভাবতুম সবারই ঘরে চলেছে এমন আনন্দের ঢেউ। গাই দুয়ে দুধ দিত টাট্‌কা আর চাক ভেঙে মধু দিত সোনালি; খেয়ে ভাবতুম এখানকার সবাই এমনি দুধে আর মধুতে হাবুডুবু খাচ্ছে। সত্যিকার গাঁয়ের চেহারাটা তাহলে আমার দেখা হত না।'

কিছুতেই ঠেকানো গেল না সমীরকে। অনেক দিন ধরেই নবীনের বুড়ো বোন চিঠি লিখে-লিখে বিরক্ত করছিল কানাইকে। কানাই সম্প্রতি বড়লোক হয়েছে এই খবর তার কানে যাওয়া অবধি তার আর শান্তি নেই। নবীন মারা যাবার পর তার দিকে চাইবার আর কে আছে? তার নিজের যে ছেলে সে জন খেটে দু-বেলার খাওয়া জোটাতে পারে না। বিয়ে করেছে, সংসারে এসেছে একটি নতুন অতিথি, দুধের বদলে নুন-মাখা ফ্যান আর তাকে সে কত খেতে দেবে? কানাইয়ের নাম করে মাঝে-মাঝে সমীর পাঠিয়েছে তাকে টাকা, কিন্তু তার অতলান্ত দারিদ্র্যের কাছে সে-টাকা কিছুতেই পর্যাপ্ত নয়। তাই সমীর ঠিক করেছে নিজের চোখে একবার সব দেখে আসবে। দেখে আসবে কোন একটা কিছু পাকাপাকি বন্দোবস্ত করে দেয়া যায় কি না। আর, সেই সুযোগে দেখে আসবে সত্যিকারের দেশ, নিরন্ন আর নিরাভরণ।

ঠিক হয়েছে আজ রাত্রের ট্রেনেই তারা রওনা হবে। বিকেলবেলা, কানাই গিয়েছে দোকানে তার নতুন ভাইপোর জন্যে রঙিন খেলনা কিনে আনতে আর সমীর গুছোচ্ছে তার সুটকেস, হঠাৎ সমীর লক্ষ্য করল ঘরের মধ্যে বিচিত্রিত বিশাল এক প্রজাপতি। তার মনে হল সে গ্রামে যাবে শুনে সবুজ মাঠ আর নীল আকাশ তাকে তাদের অভিনন্দন দিয়েছে পাঠিয়ে। হাত বাড়িয়ে প্রজাপতিটা সে আলগোছে ধরে ফেলল। কানাইকে ভীষণ আশ্চর্য করে দেয়া যাবে মনে করে রেখে দিল সে সেটা কানাইয়ের বাক্সের মধ্যে।

সমীরের কবেকার একটা পুরোনো ভাঙা সুটকেস। সমীর চেয়েছিল একটা নতুন কিনে দিতে, কিন্তু কানাই রাজি হয়নি। যদিও চাবি ওতে আর ঘোরে না, যদিও কলকব্জাগুলো ওর দুর্বল তবুও নতুনের চাইতে সমীরের ব্যবহৃত জিনিসটাই কানাইয়ের বেশি পছন্দ।

কিন্তু কানাই এতক্ষণেও বাড়ি ফিরছে না কেন? যেহেতু ওর পা একখানা অশক্ত সেহেতু ওর জন্যে সমীরের বেশি উদ্বেগ। এগিয়ে দেখতে গেল সে তাই রাস্তায় কানাইয়ের দেখা পাওয়া যায় কি না।

বেশি দূরে যেতে হল না তাকে। গলির মাথায় এসেই দেখতে পেল বড় রাস্তার ফুটপাথ ধরে কানাই আসছে, দুই হাতে তার ছোট-বড় কতগুলি কাগজের বাক্স। নিশ্চিন্ত হয়ে সমীর বাড়িতেই ফিরে গেল, কিন্তু বাড়িতে পা দিয়েই শুনতে পেলে তুমুল কী একটা হুলুস্থুল চলছে।

সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড! কতক্ষণ আগে বৈকালিক গা ধুতে চামেলি গিয়েছিল দোতলার বাথরুমে, তার টেবিলের ড্রয়ারে গলার নেকলেসটা খুলে রেখে। এখন বাথরুম থেকে ফিরে এসে সে দেখে ড্রয়ার শূন্য, নেকলেসের লেশও কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। মুহূর্তে একটা রোমহর্ষক চুরি হয়ে গেল।

চোরের দেখা নেই বটে কিন্তু গোয়েন্দা রয়েছে ওৎ পেতে। বাড়ির চাকর-বাকরদের বাক্স-প্যাঁটরা ভেঙে জিনিসপত্র তছনছ করে ফেলেছে

সে চারদিকে, স্থান-অস্থান কিছুই সে বাকি রাখছে না ঘাঁটাঘাঁটি করতে, কিন্তু হারের কোথাও দেখা নেই। চুরিটাও যেমনি দ্রুত, তেমনি তল্লাসিও চলেছে বিদ্যুৎগতিতে।

'এই যে তুমি এসে পড়েছ।' সমীরকে দেখতে পেয়ে ম্যানেজার আশ্বস্তের মত বললে, 'চল, এবার দাগী-বাবাজীর বাক্সটা একবার দেখে আসি। তোমার সাক্ষাতেই সার্চ হওয়াটা ঠিক হবে।'

'কেন?' সমীর তেজী গলায় বললে, 'নইলে অন্যরকম সন্দেহ করতে পারি বলে বুঝি ভয় আছে?'

'তা একটু আছে বৈকি।' ম্যানেজার সপ্রতিভের মত বললে, 'তুমি তো ব্রজদুলালের দোষ কিছু দেখতে পাও না, তাই ফাঁকা নালিশ শুনলে তুমি বিশ্বাস করবে কেন? তাই ওর বাক্সটা তুমিই নিজে খুঁজে দেখবে।'

'চলুন।'

যা আশঙ্কা করছিল সমীর, কানাইয়ের ভাঙা বাক্সটা আস্তে-আস্তে অতি সন্তর্পণে খুলে ফেলতেই চামেলির নেকলেসটা ঝলমল করে উঠল। কিন্তু, কিন্তু তার সেই প্রজাপতি গেল কোথায়?

'পাওয়া গেছে পাওয়া গেছে নেকলেস!' ম্যানেজার উন্মত্তের মত উৎফুল্ল হয়ে উঠল। 'নেকলেস কানাই-ই চুরি করেছে।'

সমীর গম্ভীর ও কঠিন কণ্ঠে বললে, 'এ আমি বিশ্বাস করি না।'

'তার মানে?' ম্যানেজার ঘাড় ফেরাল।

'তার মানে এ নেকলেস কানাই তার বাক্সে এনে রাখে নি। আর কেউ চুরি করে এনে রেখে গেছে।'

'তার প্রমাণ?'

'তার প্রমাণ—প্রজাপতি।'

'তার অর্থ?'

'তার অর্থ অত্যন্ত সোজা। খানিক আগে, দশ-পনের মিনিট হবে হয়ত, আমি এই ঘরে মস্ত বড় একটা প্রজাপতি ধরে কানাইয়ের এই বাক্সের মধ্যে রেখে দিই। রেখে দিয়ে রাস্তায় বেরুই কানাইয়ের খোঁজ

করতে—কানাই তার ঢের আগেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে। প্রজাপতিটা ভিতরে আছে এই আশা করেই আমি অত আস্তে-আস্তে সন্তর্পণে বাক্সের ডালাটা খুলছিলুম। কিন্তু ডালা খোলবার পর প্রজাপতিকে যখন আর দেখা গেল না তখন নিঃসন্দেহে এই সিদ্ধান্তই করতে হয় যে আমার বাইরে বেরুবার পর তার কেউ এসে এই বাক্স খুলেছে ও নেকলেসটা রেখে গেছে। আর সেই ফাঁকে প্রজাপতি গেছে উড়ে।'

'তুমি কী যে বাজে বকো তার ঠিক নেই।' ম্যানেজার আমতা-আমতা করে বললে।

'আমি একবিন্দু মিথ্যা বলি নি।'

ততক্ষণে দু-দিক থেকে কানাই আর চন্দ্রবাবু এসে গিয়েছেন। বাক্সের মধ্যে জলজ্যান্ত হার পাওয়া গেছে—এ অবস্থায় কে চোর সে সম্বন্ধে চিন্তা করার কোন অবকাশ আছে বলে চন্দ্রবাবু ভাবতে পারলেন না। ঘটনাটা ও তার পিছনের যুক্তিটা সমীর আবার তাঁর কাছে আনুপূর্বিক নিবেদন করল, কিন্তু সমস্তটা তলিয়ে বোঝবার মত স্নায়ুতে তাঁর সহিষ্ণুতা নেই। সবচেয়ে বড় আর মোটা কথা, কানাইয়ের বাক্সর মধ্যে সোনার হার পাওয়া গিয়েছে—তার এই বাক্স নিয়েই সে আজ পিসি-বাড়ি বেড়াতে যাচ্ছিল। এক লাথিতে কানাইয়ের বাক্সটা ছিটকে ফেলে দিয়ে তার কর্ণমূল আকর্ষণ করে ঘরের বাইরেতে নিয়ে এসে চন্দ্রবাবু দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, 'পুলিশে চালান দিয়ে হাঙ্গামা বাধাতে চাই না, পত্রপাঠ বিদায় হও আমার বাড়ি ছেড়ে!'

কানাই হয়ত চলেই যাচ্ছিল, কিন্তু পিছন থেকে সমীর তাকে ডাকল। বললে, 'দাঁড়াও। আমাদের ট্রেন যদিও রাত্রে, আমরা এখুনিই বেরুব বাড়ি থেকে।'

'তুমি কোথায় যাবে?' চন্দ্রবাবু স্বপ্নোত্থিতের মত বললেন।

'কেন, আগে থেকেই তো ঠিক হয়ে আছে, আমিও কানাইয়ের সঙ্গে যাব তার পিসি-বাড়ি, গ্রাম দেখতে।'

‘ও, হ্যাঁ, আগে থাকতেই ঠিক হয়ে আছে বটে। আমিও মত দিয়েছিলুম শেষ পর্যন্ত। সত্যিই তো।’ চন্দ্রবাবু বললেন বটে কথাগুলো, কিন্তু সমস্ত শরীরে নিজেকে ভারি দুর্বল বলে অনুভব করতে লাগলেন।

নিজের ঘরে গিয়ে গলা ছেড়ে চেঁচিয়ে ডাকতে লাগলেন : ‘ম্যানেজার, ম্যানেজার!’

আর মুখ কাঁচুমাচু করে ম্যানেজার তাঁর সামনে এসে দাঁড়াতেই তিনি বাঘের মত হুঙ্কার দিয়ে পড়লেন : তুমি আমাকে কী বলেছিলে? বলেছিলে না, এমন ব্যবস্থা করবে যাতে শুধু কানাই বিদেয় হয়ে যাবে আর সমীর থাকবে তার নিজের জায়গায় বসে? তার তুমি কী করলে? এ যে দেখছি সব উল্টো হতে চলেছে! শেষকালে তোমার জন্যে আমি আমার ছেলে হারাব নাক? তুমি যে দেখছি একটা ঘোরতর আহম্মক! একটা গাধা! একটা অখাদ্য।’

ম্যানেজার গোঁফ নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

এগারো

সমীর ফিরে আসতে রাজি হল এই শর্তে যে তার সঙ্গে কানাইও ফিরে আসবে, আর ফিরে এসে অধরকে তারা আর বাড়িতে দেখতে পাবে না।

ছেলের বিরহে কিছুটা কাতর বলেই হোক বা তার যুক্তির প্রবলতায় কিছুটা বিচলিত বলেই হোক, চন্দ্রবাবু সম্মত হলেন। ম্যানেজারকে ডেকে বললেন, ‘ছাখো, তোমার অধরটা কোন কাজের নয়।’

‘ওটা একটা অখাদ্য!’ ম্যানেজারও একবাক্যে রাজি হল।

‘আর, আমার যদ্দুর মনে হয়, ও-সব চুরির মধ্যে কানাইয়ের কোন হাত ছিল না। ঐ অধরটাই—’

ম্যানেজার দ্বিরুক্তি করল না। বললে, 'এখন ক্রমশ তলিয়ে গিয়ে আমারো তাই মনে হচ্ছে বটে।'

'অতএব—'

ইঙ্গিতটা ধরতে দেরি হল না ম্যানেজারের। 'অতএব আমি ওকে এখুনি তাড়িয়ে দিচ্ছি। মোটের উপর, ও-রকম পাবলিক সেক্রেটারি নিয়ে আমার কোন লাভ নেই। তা ছাড়া এ-বাড়িতে লোক শুধু যেতেই আসে, থাকতে আসে না।'

'শুধু একজন ছাড়া।'

'হ্যাঁ, একজন ছাড়া। Men may come and men may go, but I go on for ever.'

অতএব ফিরে এল সমীর আর কানাই, দেখল, যেমনটি তারা চেয়েছে—এ-বাড়ি থেকে আস্তানা উঠে গিয়েছে অধরের।

কিন্তু দু-দিন যেতে না যেতেই, জায়গারটা জায়গায় ঠিক বসতে না বসতেই, সমীরের জ্বর হল। চন্দ্রবাবু আর কনকলতা যুগপৎ দুটো বিরক্ত-বিষাক্ত সঘৃণ দৃষ্টি কানাইয়ের উপর নিক্ষেপ করলেন।

'তখনি বলেছিলাম ও-সব অজ-পাড়াগাঁয়ে ভদ্রলোক কেউ যায় না।' কনকলতা চিন্তিত মুখে বললেন, 'এখন একখানা কেমন অসুখ বাধিয়ে বসেছে! কার না কার পিসি—যত দায় পড়েছিল আমার!'

চন্দ্রবাবু কানাইয়ের প্রতি রুখে এলেন: 'পচা ডোবায় খুব স্নান করিয়েছিস বুঝি?'

'ও স্নান করাবে কী বাবা!' সমীর হাসিমুখে বললে, 'এমন সুন্দর নদী সেই গাঁয়ে! শুকিয়ে সরু হয়ে এসেছে বটে, কিন্তু কী ধারালো স্রোত! একবার নামলে আর উঠে আসতে ইচ্ছে করে না। আমাদের এখানকার ট্যাঙ্কে-স্কোয়ারে জলের সে শান্তিও নেই, স্ফূর্তিও নেই।'

আবার মুখিয়ে উঠলেন চন্দ্রবাবু: 'জল খেতে দিয়েছিস কোথা থেকে?'

সমীর আবার হাসল। বললে, 'খাবার জলেরই ভীষণ অসুবিধে

দেখে এলাম। গাঁয়ের জন্যে একটা টিউবওয়েল বরাদ্দ হয়েছিল, সেটা বসানো হয়েছে গাঁয়ের ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের বাড়ির দুয়ারে, সবাই সেটার নাগাল পায় না। সামনের ইলেকশানে এ প্রেসিডেন্ট যদি হারে, তবেই সবাইয়ের আশা, নতুন প্রেসিডেন্টের বাড়ির দুয়ারে আরেকটা বসতে পারে কোনদিন। ততদিন ওরা নদীর জলেই পিপাসা মেটাচ্ছে। বর্ষায় সে জল হলদেটে ঘোলা হয়ে উঠলেও কোন উপায় নেই।'

'আর তুই কিনা দিব্যি এখানে ফিলটার-করা কলের জল খাচ্ছিস! ব্যাটা নেমকহারাম!' চন্দ্রবাবু কানাইকে ফের ভেঙচিয়ে উঠলেন।

'অকৃতজ্ঞ ওরা, না আমরা, যারা ওদের কাছ থেকে এত পেয়েও পিপাসার সামান্য জলটুকু ওদের কেড়ে রাখছি?'

'আর শুতে দিতিস কোথায়? মাটির উপর? চেটাইয়ে?'

'চেটাইয়ে ওরা শুতেই জানে বাবা, কিন্তু লাখ টাকার স্বপ্ন দেখতে জানে না।'

'কিন্তু অত সব অত্যাচার করে অসুখে পড়লে তো তুমিই, ওর তো কিছুই হল না।' কনকলতা খাটের উপর সমীরের পাশে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। 'আমি আগেই বলেছি ও-সব বনে-জঙ্গলে আমাদের সহুরে ছেলেদের পোষায় না।'

'গিয়ে দেখলাম, মা, আমরা একেবারে খাপছাড়া। যতই ওদের কাছে যাই না কেন কিছুতেই ওরা আপনার লোক বলে ভাবতে পারে না আমাদের। ভাল করতে চাই শুনলে অবিশ্বাস করে। আর, যতক্ষণ দের একজন না হয়েছি ততক্ষণ কী করে ওদের আপনার হব, কী করেই বা ভাল করব বল! কী তফাৎ! শুধু মুখের সহানুভূতিতে তো এক হলে চলবে না, খাওয়া-দাওয়া রীতি-নীতি সুখ-দুঃখ সব কিছুতে সমান হতে হবে। তাই বুঝে এলাম মা, ওদের লোক ওদের থেকেই আসবে, আমরা বিদেশী, আমরা বেজাত।'

'জ্বর দেখি হু-হু করে বেড়ে যাচ্ছে!' সমীরের গায়ে হাত দিয়ে কনকলতা শঙ্কিত মুখে বললেন।

'ম্যালেরিয়া আর-কি!' চন্দ্রবাবু কানাইয়ের দিকে তাকিয়ে আবার একটা ভ্রূকুটি করলেন: 'একসঙ্গে ছিলি তো তোর কিছু হল না কেন?'

'তাই আমি ঠিক করেছি মা,' জ্বরের ঘোরে বিহ্বল গলায় সমীর বলতে লাগল, 'কানাইকে আমি ফের তার নিজের জায়গায় পাঠিয়ে দেব। ওকে খুব বড়লোক বানিয়ে দেব বলে ভেবেছিলাম আগে, কিন্তু এখন দেখছি গরিব না হলে গরিবের দুঃখ, গরিবের দোষ, গরিবের দায় কেউ ঠিক বুঝতে পারে না মা। ও তাই তেমনি গরিবই থাকবে, শুধু ওকে লেখাপড়া শিখিয়ে দেব, ওর বুকে আলো জ্বেলে দেব! সেই আলো নিয়ে ও ফিরে যাবে, আর জান তো মা, এক আলোর শিখা থেকে আরেক আলোর শিখাতেই দীপান্বিতা সৃষ্টি হয়।'

'ও তো এরি মধ্যে অনেক শিখে ফেলেছে শুনেছি।' চন্দ্রবাবু টিপ্পনি কাটলেন।

'না বাবা, আরো - আরো—আরো—'

ডাক্তার এল, বলে গেল, একদিনেই কিছুই বোঝা যাবে না।

সমস্ত রাত কানাই ঘরের সামনেকার বারান্দায় মেঝের উপর পড়ে রইল। ঘরে মা শুয়েছেন সমীরের পাশে। তার মা নেই বটে, পাশে এসে তিনি শোবেন না ঠিক, তবু, তবু তার অসুখ করুক। সমীরের না হয়ে তার কেন এই অসুখ হল না? এক-একবার তন্দ্রা ভেঙে যায় আর ভাবে, এই বুঝি তার গা-হাত-পা টাটিয়ে জ্বর এল আর সঙ্গে-সঙ্গে সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণা মুছে গেল সমীরের গা থেকে। কেন, কেন এমন হয় না? গাগাগোড়া সেই তো অপরাধী, তার জন্যেই তো কষ্ট এই সমীরের। তবে তার কোন শাস্তি হবে না কেন? শাস্তি হবে না তো সে নিজের স্বাস্থ্য নিজের আরাম সহ্য করবে কী করে?

দেখতে-দেখতে কয়েক দিনের মধ্যেই নানা ঘোরপ্যাচের মধ্য দিয়ে সমীরের অসুখটা খুব জটিল হয়ে এল। বাড়ির সবাই ঘাবড়ে গেল

ভয়ানক। এ-বেলা ও-বেলা ডাক্তার আসে, কেউ একটু হাসে না, হাল্‌কা করে কথা বলে না এক-আধটাও। পালা করে দু-জন নার্স আসে ঘুরে-ঘুরে, কিন্তু তারা যেন দম-দেয়া কলের পুতুল, নিষ্প্রাণ, নিষ্কম্প ; তারা কর্তব্যের ছবি, আশার ছবি নয়। কানাই তাই আশ্রয় পায় না কোথাও, নিজের ভীত বুকের মধ্যে অপরিচিত ঈশ্বরের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়।

রুগীর ঘরে তার প্রবেশ নিষেধ, সে এখন চলে এসেছে নিচে। কিন্তু কতক্ষণ পর-পরই ঘুরে-ঘুরে চলে আসে তেতলায়, বাইরে থেকে জানলা দিয়ে চেয়ে থাকে একদৃষ্টে, যদি সমীরের সঙ্গে কখনো কোন ফাঁকে সামান্য চোখাচোখি হয়। আর চোখাচোখি হলেই সমীর ম্লান একটু হাসে। এত-র মধ্যেও সমীর তাকে ভোলে নি। একদিন তাকে দেখিয়ে সমীর নার্সকে বললে, 'ও আমার কে জানেন ? জানেন না ? কী করেই বা জানবেন। ও আমার একটা আইডিয়া, স্রষ্টার কাছে যা কল্পনা, তাই। আর্টিস্টের কাছে যেমন তার ছবির আইডিয়া, কবির কাছে যেমন কবিতার, বৈজ্ঞানিকের কাছে যেমন তার আবিষ্কারের, তেমনি আমার কাছে ও মানুষের আইডিয়া, দুঃস্থ ও পতিতের পরিত্রাতার আইডিয়া। ওকে একটু আসতে দেবেন আমার কাছে ? ওর সঙ্গে কতদিন কোন কথা কই নি !'

'কিন্তু তোমার কথা কওয়া যে বারণ।' নার্স বললে।

'বেশিক্ষণ কইব না। দেখছেন না, ওর চেহারা কেমন খারাপ হয়ে গেছে, জামা-কাপড়গুলো কেমন ময়লা, চুল কাটেনি কতদিন, রাতে ঘুমুতে পারে না, এমনি পাগলের মত চাউনি। সবাইকে এত করে বলি ওর যেন কোন অযত্ন না হয়, কিন্তু কেউ লক্ষ্য করে না। আমার হয়ে আপনি আবার সবাইকে বলে দেবেন।'

নার্সের ডাকে কানাই ঘরের ভিতরে চলে এল, এক ছুটে একেবারে খাটের পাশটিতে। তাকে ধরবার জন্যে শীর্ণ হাত বাড়িয়ে দিল সমীর, আর হাতখানা স্পর্শ করেই কানাই ঝরঝর করে কেঁদে ফেললে।

'একি, কাঁদছ কেন?'

'এ অসুখ আমার না হয়ে আপনার হল কেন?'

'আমার হয়েছে তাতে কী? অসুখ হলে কি লোকে ভাল হয় না? আমার ভাল না হলে চলবে কী করে? আমার কত কাজ, কত স্বপ্ন!'

কান্নার ভিতর থেকে কানাই বললে, 'আমি এ-বাড়ি থেকে চলে যাই।'

'কোথায়?'

'জানিনা। রাস্তায়। যেখানে হোক।'

'কেন, কেউ বুঝি আর ভালবাসেনা এ-বাড়ির?'

'না, তা নয়,' কানাই ফুঁপিয়ে উঠল: 'আমার জন্যেই আপনার এ অসুখ হয়েছে।'

'আর তোমার জন্যেই যে আমাকে ফের ভাল হয়ে উঠতে হবে তা বুঝি জান না! ভাল হয়ে উঠে তোমাকে কাছে না পেলে আমার চলবে কেন?'

কিন্তু, কই সমীর ভাল হয়ে উঠছে? আজ কতক্ষণ জানলা দিয়ে চেয়ে আছে কানাই, কিন্তু একবারো চোখাচোখি হল না। কাল রাত থেকেই চোখ বোজা, এমন দুর্বল, যেন চোখের পাতাদুটিও খোলা যাচ্ছে না। নার্সদের মুখ বিষণ্ণ, ডাক্তারদের মুখ গম্ভীর। আর বাড়ির সবাইকার মুখ রক্তহীন, আতঙ্কগ্রস্ত। কানাই এর-ওর মুখের দিকে শুধু তাকায়, পড়তে চেষ্টা করে কোথাও একটি রেখা সে খুঁজে পায় কি না, আশা বা সান্ত্বনার, সাহসের বা নিশ্চয়তার। না, সকলের মুখই রেখাহীন।

এত সব আয়োজন-প্রয়োজনের মধ্যে কানাই একেবারে অনাবশ্যক। কত লোক কত কাজ নিয়ে কত দিকে ছুটোছুটি করছে, চিকিৎসা ও সেবার তাগিদে, সবাইয়ের কত আপ্রাণ চেষ্টা যাতে সমীর একটু আরাম পায়, যাতে সমীর একটু সুস্থ বোধ করে; কিন্তু কোন কাজেই কেউ তাকে ডাকে না, কোনখানেই তাকে কেউ জায়গা দেয় না এতটুকু।

অথচ সমীরের জন্যে কিছু একটা করবার জন্যে তার সমস্ত প্রাণ আকুলি-ব্যাকুলি করছে। কিন্তু কী সে করতে পারে—কতটুকু?

তবু দরজার কাছটিতে সে বসে থাকে—যদি ভুলেও তাকে একটা কেউ ফরমাজ করে বসে, কখনো যদি কোন একটা অকিঞ্চিৎকর কাজেও সে লাগতে পারে সমীরের। একদিন সকালবেলার নার্স তাকে বললে, 'চাকর এখনো আসছে না কেন উপরে? এসব জিনিস-পত্র সরাবে কখন? কখনই বা ফের ধুয়ে এনে দেবে? চাকর একটাকে ডেকে দাও শিগগির।'

'আমাকেই দিন,' স্তূপীকৃত প্যান-গামলার দিকে চেয়ে কানাই বললে, 'আমিই ওগুলো ধুয়ে নিয়ে আসছি।'

'তুমি?' নার্স অবাক হয়ে গেল: 'তুমি কেন? বাড়িতে কতই তো চাকর রয়েছে।'

'না, না, আপনি জানেন না, আমিও একজন চাকর। আমি শুধু চাকর হতে চাই, আমাকে ওঁর চাকর করে নিন। ওঁর জন্যে আমাকে কিছু একটা কাজ দিন করতে। কিছুই করতে না পেয়ে আমি মরে যাচ্ছি।'

কিন্তু তুচ্ছ দুটো ফরমাজ খেটে কতটুকু সে করতে পারে শুনি? তার আরো কত কী করা উচিত। কিন্তু বল, কী করলে, কী দিলে সমীরকে সে তুলতে পারে বাঁচিয়ে? বল, কে তাকে বলে দেবে তা কী! কেন সে এত অক্ষম, এত অসহায়! এত করে ডাকছে সে ভগবানকে, তবু বল, তেমন করে সে ডাকতে পারছে না কেন? নিচে নিজের বন্ধ ঘরে বসে অন্ধকার মধ্যরাত্রে সে দুই হাতে দেয়াল চেপে ধরে বারে-বারে মাথা কোটে, কাঁদে আর বলে, ভগবান, কেন, কেন তোমাকে পারছি না আমি তেমন করে ডাকতে! আমাকে শিখিয়ে দাও সেই ডাক যাতে তুমি সাড়া দেবে, যাতে তুমি আর চুপ করে বসে থাকবে না।

সেদিন বড় ডাক্তার যখন তাঁর মোটরে উঠছিলেন আর ম্যানেজার

তাঁর মুঠোর মধ্যে মোটা ফি-টা গুঁজে দিচ্ছিল, কোথা থেকে ছুটে এসে কানাই তাঁর পা জড়িয়ে ধরল। বিগলিত গলায় বললে, 'যেমন করে হোক দিন আমার দাদাবাবুকে বাঁচিয়ে।'

ডাক্তার বিরক্ত হয়ে পা ছাড়িয়ে নিতে গেলেন, তাকালেন একবার কানাইয়ের মুখের দিকে। উস্ক-খুস্ক চুল, উদ্‌ভ্রান্ত দুটো চক্ষু, উপবাসক্লিষ্ট চেহারা, দুই গাল বেয়ে অশ্রুর দুই ধারা নেমে এসেছে।

'এমন কোন উপায় নেই যাতে করে দাদাবাবুর ঐ অসুখ আমার শরীরে চালিয়ে দিতে পারেন, যাতে করে আমি শুধু কষ্ট পাই আর দাদাবাবু ভাল হয়ে ওঠেন? রোগের সেই কষ্টের চেয়ে এই কষ্ট যে অনেক বেশি!'

'কে এই ছোঁড়া?' ডাক্তার নিষ্ঠুর ঝট্‌কা দিয়ে পা ছাড়িয়ে নিলেন।

'কে জানে কে!' ম্যানেজার ততোধিক নিষ্ঠুরের মত বললে।

'আমি এ বাড়ির চাকর, আমি রাস্তার ভিখারি, আমি কেউ নই। তবু আমি দাদাবাবুর সমস্ত অসুখ নিজের বুক পেতে নিতে রাজি আছি। এত হয়, আর এটুকু হয় না? আমি না-হয় সরে গেলাম, কিন্তু দাদাবাবু ভাল হয়ে উঠতে পারেন না কিছুতেই?'

ডাক্তারকে টলানো গেল না বটে, কিন্তু সেও কি এমনি একজন যে নড়বে না তার ডাকে, গলবে না তার চোখের জলে? কানাইয়ের মনে পড়ে গেল তার পিসির গাঁয়ের সেই বুড়ো বটগাছের তলার বুড়ো শিবের কথা। সে নাকি বড় জাগ্রত শিব, কত লোক সেখানে হত্যে দিয়ে পড়ে থেকে হাতে-হাতে ফল পেয়েছে। কানাইও সেখানে যাবে, বটগাছের তলায় কাঁচা মাটির উপর উপুড় হয়ে পড়ে থাকবে, রোদ আর বৃষ্টির মধ্যে, খোলা আকাশের নিচে; উঠবে না, নড়বে না, পাশ ফিরবে না, যতক্ষণ না বুড়ো শিব তাকে ওষুধ বলে দেয়। কিন্তু চিন্তাটা শেষ না-হতেই আবার সে বিমর্ষ হয়ে গেল। সে যাবে যে, কিন্তু সমীর যদি একদিন শ্রান্ত চোখ তুলে তাকে খুঁজে বেড়ায়?

যদি সে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে শুনে সমীরের দুঃখ হয়, কেন গেছে তা না জেনে যদি সমীর তাকে অকৃতজ্ঞ ভাবে, স্বার্থপর ভাবে! কী দরকার সেখানে গিয়ে? এখানে, এই ঘরের মধ্যে, কানাইয়ের নিজের বুকের মধ্যে কি সেই বুড়ো শিব বসে নেই? কানাইকেই তার কাছে যেতে হবে কেন, সে আসতে পারে না কানাইয়ের কাছে? ছেলে যখন একা-একা অসহায় অবস্থায় কাঁদে তখন মা কি ছুটে এসে তাকে বুকের মধ্যে তুলে নেয় না? দেবতা যদি জাগ্রত, তবে সে তো নিজের চোখে সবই দেখতে পাচ্ছে ঠিক-ঠিক।

কানাই টিকতে পারে না বাড়ির মধ্যে, রাস্তায় বেরিয়ে আসে, এখানে-ওখানে ঘোরাঘুরি করে, রাস্তায় সাধু-সন্ন্যাসী পেলে ওষুধ চায়, আবার কতক্ষণ পরে সশঙ্ক মনে বাড়িতে ফিরে আসে। একদিন হঠাৎ এমনি ফিরে এসে বাড়ির ফটকের সামনে অধরের সঙ্গে দেখা। দেখেই, কেন কে জানে, কানাইয়ের মন আনন্দে ভরে গেল। আর যাই হোক, অধর তার বন্ধু, অধর তার সমবয়সী, তার দুঃখ সে কিছুটা বুঝতে পারবে হয়ত।

'হ্যাঁ রে দাদাবাবুর নাকি খুব অসুখ?' অধর জিগগেস করলে।

'হ্যাঁ, ভীষণ অসুখ, কত চিকিৎসা হচ্ছে, কত ডাক্তার নার্স, কত ওষুধ-পত্র, কিন্তু কিছুতেই ভালোর দিকে যাচ্ছে না।' কানাইয়ের দু-চোখ ছাপিয়ে জল উঠল টলটল করে। 'কী করে দাদাবাবু ভাল হবে তুই বলতে পারিস? তুই নিশ্চয়ই দাদাবাবুর উপর খুব চটে আছিস, না রে অধর? মনে তুই রাগ রাখিস নে, দাদাবাবু ভাল হোক, আমি তাঁকে বলে-কয়ে আবার তোকে চাকরি দেব দেখিস। কিম্বা যদি বলিস তো আমি চলে যাব না-হয়, তুই আমার জায়গায় দাদাবাবুর ছাত্র হবি। মনে তুই রাগ রাখিস নে।' কানাই অধরের হাত ধরল।

'আমার কিছু রাগ নেই। দাদাবাবু তো খুব ভাল লোক, যত পাজি হচ্ছে ঐ ম্যানেজার।' অধর গলা নামিয়ে আনল: 'সে-ই তো আমাকে বলত ঘড়ি আর হার চুরি করে তোর জামার পকেটে আর

বাক্সে রেখে দিতে। ও-ই তো হচ্ছে আসল বাটপাড়। নইলে, দাদাবাবু তো দেবতুল্য লোক। ওর ভাল হবার জন্যে আমরা কী না করতে পারি ?'

অধরের কথা শুনে কানাইয়ের দেহ-মন যেন জুড়িয়ে গেল। বললে, 'তুই এত ভাল অধর, দাদাবাবুকে এত ভালবাসিস ! কিন্তু বলে দে, কী করে ভাল করব দাদাবাবুকে।'

'সেই কথাই তো তোকে বলতে এসেছি !' উৎসাহে ও উত্তেজনায় অধরের দু-চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল : 'বাবুদের কারখানার কাছে আমাদের সেই বাজারের মধ্যে নানকু মিস্ত্রির দোকানের পাশে যে একতলা একটা ইঁটখসা পোড়ো ঘর ছিল সেই ঘরে ক-দিন থেকে এক সন্ন্যেসী এসেছে। তোকে বলব কী ভাই, একেবারে খাঁটি সিদ্ধপুরুষ, খোদ হিমালয়-ফেরৎ। সভারামের সেই পিত্তশূল ছিল জানতিস তো ? বাবাজী দু-আঙুলে করে খানিকটা ভস্ম তার জিভে ঠেকালেন আর অমনি ভোজবাজির মত ব্যথাটাও তার ভস্মসাৎ হয়ে গেল। সমস্ত এলাকা জুড়ে প্রকাণ্ড রব উঠে গেছে, দলে-দলে মেয়ে-পুরুষ সব ওষুধ নিতে আসছে। সেইখানে যাবি দাদাবাবুর জন্যে ওষুধ চেয়ে আনতে ?'

'যাব, এক্ষুনি যাব !' কানাই লাফিয়ে উঠল।

'কিন্তু বাবাজী শুধু সন্ধেবেলা কয়েক ঘণ্টার জন্যে আসেন সেই পোড়ো ঘরে। বাকি সময় শ্মশানে-মশানে ঘুরে বেড়ান। তুই বলিস তো কাল সেখানে নিয়ে যাব।'

কানাই একবাক্যে রাজি হয়ে গেল। হয়ত বুড়ো শিব মুখ তুলে চাইল এতদিন।

পরদিন সন্ধ্যাসন্ধিতে দুই বন্ধু অধর আর কানাই চলে এল সেই সন্ন্যাসীর আস্তানায়। তখন হোম হয়ে গেছে, কুণ্ডের আগুন প্রায় নিবু-নিবু, আবছা অন্ধকারে বাবাজী সমাগত আর্ত দুঃস্থকে ভস্ম বিতরণ করছেন ও হঠাৎ থেমে পড়ে একেক জনের উদ্দেশে বলে উঠছেন,

'উঁহুঁ, শুধু ভস্মে কিছু হোবে না, সোনা লাগবে।' অন্য কাউকে-বা অন্য রকম শর্ত দিচ্ছেন। বেশ গোলগাল হৃষ্টপুষ্ট চেহারা, একগাল পাকা দাড়ি, মাথায় জটিল জটাজুট, পরনে ডোরা-কাটা বাঘ-ছাল, চোখদুটো জ্বলজ্বল করছে। দেখেই কানাইয়ের মন ভক্তিতে নুয়ে পড়ল। অধরকে চুপি-চুপি জিজ্ঞেস করলে, 'আমার কাছে কঠিন কিছু চাইবেন নাকি?'

অধর গম্ভীর চালে বললে, 'দাদাবাবুর অসুখের চেয়ে আমাদের কাছে কঠিন আর কী হতে পারে?'

সত্যিই তো, কানাই লজ্জা পেল, দাদাবাবুর জন্যে কিছুই তো তার অদেয় নেই, অসাধ্য নেই।

সভারাম কখন থেকে বাবাজীর পায়ের গোড়ায় উবু হয়ে পড়ে আছে, দেখাদেখি কানাইও আভূমি প্রণত হয়ে পড়ল।

প্রণাম সেরে উঠে বসতেই কানাই দেখতে পেল সাধু চোখ বুজে ধ্যানে বসেছেন। অলৌকিক কি-একটা নির্দেশ পেয়ে হঠাৎ জোরে কয়েকটা নিশ্বাস ফেলে তিনি বলে উঠলেন, 'অসুখ খুব সাঙ্ঘাতিক।'

'কার বাবাজী?' কারখানার ভিখু মাহাতো জিগগেস করলে।

'দাঁড়াও নাম বলে দিচ্ছি।' বাবাজী আবার চোখ বুজোলেন। আবার তাঁর শরীরে অলৌকিক সাড়া এল। বললেন, 'তোমাদের কারখানার বড়-সাহেবের লেড়কা সমীর বাবুর।'

'অসুখ ভাল হবে না বাবাজী?' কানাই আর্তনাদ করে উঠল।

'হোবে, যদি তুই বেটা এক কাজ করিস। বাবুর লেড়কাকে তুই খুব খাতির করিস, তুই করলেই হোবে। দাঁড়া, দেখি।' বলে বাবাজী আবার নিমীলিত নেত্রে ধ্যানস্থ হলেন। বললেন, 'হ্যাঁ, আর কেউ নয়, শুধু তুই কোরলেই হোবে, গুরুজীর হুকুম।'

'নিশ্চয়ই করব, নিশ্চয়ই!' উৎসাহে কানাই আগুনের মত লেলিহান হয়ে উঠল: 'যদি আপনি বলেন দাদাবাবু ভাল হবেন, আমি তবে আমার প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারি বাবাজী।'

'অত শক্ত কিছুই করতে হোবে না।' বাবাজী আশ্বাস দিলেন এবং

অতঃপর যা তিনি করতে বললেন কানাইকে, কানাই ভেবে দেখলে তার মত সহজ আর কিছুই হতে পারে না। সমীরের রোগমুক্তির জন্যে বাবাজী আহুতি চান আর সেটা তেমন কোন জিনিসের যেটা রোগীর কাছে সবচেয়ে প্রিয়, সবচেয়ে মূল্যবান। সেই জিনিসটা রোগীকে না জানিয়ে নিয়ে আসতে হবে এবং রোগী যদি কখনো জানতে পারে জিনিসটা নেই তবে তার নেওয়াটা অক্লেশে স্বীকার করতে হবে কিন্তু কিসের জন্য নিয়েছে তা বলতে পারবে না।

'খুব পারব! কালকেই নিয়ে আসব আমি।' কানাই উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

'কিন্তু কী আনবি তুই কাল?' বাবাজী প্রশ্ন করলেন।

'ওঁর সবচেয়ে দামি যে শালটা আলনার উপর এখনো পাট করা আছে—সেটা।'

'ওর চেয়ে আর কোন দামি জিমিস নেই? দাঁড়া, দেখি।' বাবাজী আবার চোখ বুজোলেন। সমাধি থেকে উঠে এসে বললেন, 'সোনার ঘড়ি নেই সমীরের?'

'না, ঘড়ি যেটা আছে তার চেয়ে শালের দাম অনেক বেশ।'

'আচ্ছা', বাবাজী আবার আত্মনিমগ্ন হলেন। উঠে এসে বললেন, 'আচ্ছা, মেডেল নেই ওর?'

'ওঁর নেই, কিন্তু ওঁর কাকামণির আছে। কাকামণি মারা যাবার সময় তাঁর সোনার মেডেলগুলো ওঁকে দিয়ে যান। প্রায় ছ-সাতটা হবে, সেগুলি উনি হারের মত করে গেঁথে রেখেছেন।'

'তবে তাই,' অলৌকিক প্রেরণা পেয়ে বাবাজী উচ্ছ্বসিত গলায় বলে উঠলেন, 'চাই সেই সোনার মেডেল, স্বর্ণাহুতি। সে-মেডেলগুলির চেয়ে প্রিয় জিনিস দুনিয়ায় আর কিছু নেই তার। সেগুলোই এনে দিতে হবে। পারবি তো রে, ব্যাটা?'

'আমার দাদাবাবু ভাল হবে এনে দিলে?'

'নিশ্চয়ই হোবে—তবে ওই তিন শর্ত—না জানিয়ে আনতে হবে,

জানলে পরে স্বীকার করতে হবে যে তুই নিয়েছিস, আর কেন নিয়েছিস জিগগেস করলে কথাটি বলতে পারবি না। যদি পারিস এই শর্তে নিয়ে আসতে সে-মেডেলগুলো, বলে দিচ্ছি, গুরুজী বলে দিচ্ছেন, ভাল হয়ে উঠবে তোর দাদাবাবু। ছাখ্, বল্ ঠিক করে, পারবি তো?'

'একশোবার পারব। আমার দাদাবাবু ভাল হবে, আমার আর কী চাই! এ তো খুব সোজা কাজ বাবাজী, আমাকে যদি হাতির পায়ের তলায় শুতে বলতেন, তাতেও আমি রাজি হতুম।' বলে বাবাজীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে কানাই ঝড়ের মত বেরিয়ে গেল, যাতে হাওয়ার আগে সে বাড়ি চলে যেতে পারে, তার আর নিশ্বাস ফেলবার দেরি সইছে না।

'ছোঁড়া যে অমন তাড়াহুড়ো করছে, মোটের উপর কাজটা কিন্তু করতে হবে খুব সাবধানে।' বাবাজী চিন্তান্বিত মুখে বললেন, 'শেষকালে না সব পণ্ড করে দেয়।'

'আমি যাচ্ছি ওকে ভাল করে বুঝিয়ে-সুজিয়ে সাবধান করে দিতে।' অধর একটু-বা বিদ্রূপের সুরে বললে, 'অত তাড়াহুড়ো করছে বটে ও, কিন্তু ট্রেন ছাড়া তো গতি নেই। কলকাতার ট্রেন সেই ন-টায়। ইস্টিশানে যাচ্ছি আমি ওর পিছু-পিছু।'

বারো

নিঝুম মধ্যরাত্রে পা টিপে-টিপে কানাই তেতলায় উঠে গেল।

কত দিন থেকে তেতলায় ওঠা তার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, চন্দ্রবাবুর কর্তৃত্বের দাপটে। নিচে থেকে সমস্ত কিছুর সে ঠিক-ঠিক সন্ধান পেত না। শুধু আভাসে যা বুঝত ভাসা-ভাসা। বুঝত, যখন নিয়মিত ডাক্তার আসত দুবেলা, নার্স আসত পালা-বদল করে। বুঝত, যখন সবাইয়ের মুখে রয়েছে এখনো অটল গাম্ভীর্য, যখন কোথাও এতটুকু

একটা হাসির টুকরো বা গানের রেখা পাওয়া যাচ্ছে না খুঁজে। বুঝত সমীরের অসুখটা এখনো গিঁট পাকিয়ে জটিল হয়ে আছে। বুঝত দুশ্চিন্তার বুঝি এখনো শেষ নেই।

বারান্দার আলো নেবানো; শেডের নিচে স্তিমিত একটি সবুজ আলো জ্বলছে সমীরের ঘরে। দরজায় মোটা পর্দা ঝুলছে, হাওয়ায় কাঁপছে মৃদু-মৃদু। অনেক দিন পর সব যেন কেমন নতুন, অচেনা লাগতে লাগল কানাইয়ের। কোথাও যেন এতটুকু ব্যস্ততা নেই, দুর্ভাবনা নেই। সব যেন কেমন ঘুমে আচ্ছন্ন, বিশ্রামে শিথিল। আশ্চর্য! কানাইও তো তাই চায়। সে তো এমন সময়ই বেছে নিয়েছে যখন সবাই থাকবে ঘুমে অচেতন হয়ে, তার পায়ের শব্দটুকুও কেউ শুনতে পাবে না। কিন্তু, সত্যি কথা বলতে কি, এতটা ঘুম, এতটা নিঃশব্দতা যেন সে আশা করতে পারে নি। এ-ঘুম যেন রোগীর ঘুম নয়।

কানাইয়ের বুকের ভিতরটা কি-রকম ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকতে লাগল। কে যেন তাকে ঠেলে নিয়ে এল ঘরের মধ্যে। এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল সে, দেখল তার খাটে সমীর নিঃসাড় হয়ে ঘুমুচ্ছে; নার্সও আর জেগে নেই, সেও যেন শোধ নিচ্ছে তার অনেক রাত্রি-জাগরণের। ঘরময় কি-রকম একটা অদ্ভুত শান্তি! স্তিমিত সবুজ আলোর আভায় সেই শান্তির আবহাওয়া।

এ ঘর থেকে চলে যেতে হবে পাশের ঘরে, মাঝখানের দরজা দিয়ে। পাশের ঘরেই সমস্ত জিনিস-পত্র বাক্স-প্যাঁটরা রয়েছে স্তূপীকৃত হয়ে, রাশীভূত বিশৃঙ্খলায়। গোলকধাঁধা হলেও অলি-গলি কানাইয়ের মুখস্থ। জানে সে কোথায় আছে চাবি, জানে সে কোন্ বাক্সে আছে মেডেল। যেমন গভীর ঘুমে বিস্তীর্ণ বিশ্রাম নিচ্ছে এরা, কানাইয়ের মনে হল, তাতে পাশের ঘরে গিয়ে দরজায় খিল দিয়ে আলো জ্বেলে দিব্যি বাক্স বেছে নিয়ে উদ্ধার করে আনতে পারবে সে মেডেলের গুচ্ছটা। বুড়ো শিব তার জন্যে আজ প্রশস্ত করে রেখেছেন পথ।

নিঃশব্দে কানাই চলে এল পাশের ঘরে। ঘরে গিয়ে দরজায়

খিল লাগালো। আলো জ্বালালো। টেবিলের টানার ভিতরে পেল সেই নির্ভুল চাবির তোড়াটা। তুই-দাঁতওয়ালা লম্বামুখো এই পিতলের চাবিটা। আর এই হলদে রঙের ট্রাঙ্ক। কতগুলি প্যাণ্ট-কোটের নিচে মখমলের চৌকো একটা বাক্স। আর তার ডালাটা খুলে ফেলতেই ঝকঝক করে উঠল সেই সোনার মেডেলগুলো। একটা রুমালে করে বাঁধল সেগুলো খুব আঁট করে। তারপর পুঁটলিটা রাখল তার পেট-কাপড়ে বেঁধে।

এতটুকু ভুলচুক হল না, এতটুকু ঠেকল না কোথাও। মখমলের বাক্স রইল তেমনি জামা-কাপড়ের তলায়, বন্ধ হল ট্রাঙ্ক, নিবল আলো, খুলে গেল দরজা। আস্তে বেরিয়ে এল কানাই। এতটুকুও শব্দ হল না।

'কে ?'

কানাইয়ের হাত-পা ঠাণ্ডা, জিভ শুকনো আর দু-চোখ অন্ধকার হয়ে এল। যেন এই ঘরের মধ্যে তার নিশ্বাস নেবার জন্যে আর বাতাস নেই !

ক্ষীণ কণ্ঠে আবার প্রশ্ন এল : 'কে ? কে ওখানে দাঁড়িয়ে ?'

গলায় দলা পাকাচ্ছিল, তবু প্রাণপণ চেষ্টায় কানাই বললে, 'আমি।'

'কে, কানাই ?' মশারির থেকে সমীর মুখ আনল বের করে, বললে, 'আমার ঘরে, এত রাতে ?'

কানাই এক মুহূর্ত দ্বিধা করল না, বললে, 'আপনাকে একটু দেখতে এসেছিলাম লুকিয়ে।'

'তা, এতদিন বাদে হঠাৎ রাত করে আমাকে দেখতে এলে !' সমীরের গলায় অভিমান ফুটে উঠল।

'আমাকে দিনের বেলায় আসতে দেয় না যে তেতলায়।'

'কেন ?'

'আমি আপনার কোন কাজেই লাগি না যে। আপনার সামান্য একটা চাকর পর্যন্ত আমি নই। তাই বড়-সাহেব বারণ করে দিয়েছেন যেন তেতলায় আমি আর না আসি।'

'আশ্চর্য, আমি জানতুম না তো এসব! আমি বরং রাগ করে-ছিলুম তুমি আমাকে আর দেখতে আসো না বলে। খোঁজ নিতুম মার কাছে, শুনতুম তুমি ঠিকই আছ বাড়িতে আর বেশ ভালই আছ, অথচ আমাকে আর দেখতে আসো না। কী কষ্ট যে হত তা কী বলব।'

'আর আমার যে কী হত তা বুঝিয়ে বলার আমার সাধ্যি নেই।' কানাই ঢোঁক গিলল: 'এখন কেমন আছেন আপনি?'

'আমি? আমি তো এখন ভাল আছি।'

'ভাল আছেন?' প্রশ্নটাতে আনন্দের চেয়ে যেন বিস্ময়ের ভাগই বেশি।

'হ্যাঁ, আর আমার জ্বর নেই।'

'নেই?' উত্তেজনায় অনেকটা কানাই এগিয়ে এল।

'কাল সকাল থেকে নেই। চব্বিশ ঘণ্টার উপর হয়ে গেছে আর আসে নি। সবাই আশা করছে আর আসবেও না।'

মূঢ় চোখে কানাই তাকাতে লাগল চারদিকে। বললে, 'একদিনেই হঠাৎ ম্যাজিকের মত সেরে গেল অসুখটা!'

'না, পাগল, একদিনে কি সারে! যা জট পাকিয়ে গিয়েছিল!' রোগা মুখে সমীরের চোখদুটো খুব বড় ও উজ্জ্বল দেখাতে লাগল। 'গত এক হপ্তা থেকেই অসুখটা মোড় ফিরেছিল, শেষে কাল বিয়াল্লিশ দিনের দিন, একেবারে বিদায় নিয়েছে। তুমি তো এ কদিন আর কোনই খবর নাও নি।'

তবে আর কী! ভালই তো হয়ে গেছে সমীর! তবে আর মেডেলগুলো নিয়ে গিয়ে কী হবে!

কিন্তু তাই বলে আর ফিরিয়েই বা দেয়া যায় কী করে?

'কিন্তু এখনো খুব সাবধানে থাকতে হবে। বড় পাজি রোগ, আবার না আক্রমণ করে বসে, এখন এই হয়েছে সবাইয়ের ভাবনা।'

বুড়ো শিবকে নিয়ে ছেলেখেলা করা চলবে না, কানাইয়ের বুকের মধ্যে থেকে কে বলে উঠল। দেবতার নামে যা শপথ করেছ তা রাখতে হবে অক্ষরে-অক্ষরে। বিপদের দিন এখনো ফুরিয়ে যায় নি।

'তুমি আর ভেবো না, রাত জেগো না ভেবে-ভেবে।' সমীর স্নেহ-কোমল কণ্ঠে বললে, 'এবার ঘুমোও গে লক্ষ্মী ছেলের মত। দেখছ না সবাই কেমন ঘুমুচ্ছে নিশ্চিন্ত হয়ে! তোমার সঙ্গে এতক্ষণ ধরে কথা বলছি, নার্স পর্যন্ত টের পাচ্ছে না—এমন গভীর তার ঘুম। আমার সম্বন্ধে ভাবনা করবার আর কিছুই নেই এমনি এখন সবাইয়ের ধারণা।'

'কিন্তু অসুখ যদি আবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে?'

'উঠবে না।' সমীর হাত বাড়িয়ে কানাইয়ের একখানি হাত স্পর্শ করল: 'তোমার এত প্রার্থনার ফল না ফলে কি পারে? যাও, নার্স এখুনি জেগে উঠে দেখে ফেলবে আমি কথা কইছি, আর তোমাকে ধরিয়ে দেবে বাবার হাতে।'

কানাই তাড়াতাড়ি নিচে নেমে গেল।

কঠিন প্রতীক্ষার মধ্য দিয়ে কেটে গেল সমস্ত দিন। এতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ করবার নেই, বাবাজীতেই সেই বুড়ো শিব এসে ভর করেছেন। সন্দেহ নেই, অলৌকিক মহাপুরুষ সেই সন্ন্যাসী, প্রথম দর্শনের দিন থেকেই আরোগ্যের সূচনা। এখন প্রতিশ্রুতি রক্ষা না-করাই হচ্ছে বিপদ ডেকে আনা অনিবার্য, পারে এনে ভরাডুবি হতে দেওয়া। এমন কথা মনের কোণে স্থান দেয়াও স্বপ্নাতীত।

সন্ধের পর কানাই চলে এল সেই সন্ন্যাসীর আখড়ায়। বাবাজী যথারীতি কুণ্ড জ্বালিয়ে বসেছেন। তার প্রণামের ভঙ্গীতে ভক্তের দল বসেছে কুণ্ডলী পাকিয়ে।

'এনেছি, এনেছি বাবাজী!' উৎসাহ-উজ্জ্বল চোখে কানাই বললে।

'এনেছিস? কই দেখি?' অধীর আগ্রহে বাবাজী হাত বাড়িয়ে দিলেন।

পেট-কাপড়ের ভিতর থেকে কানাই মেডেলগুলি বের করে ধরল।

'জীতা রহো বেটা!'

মেডেলের হারটা বাবাজীর হাতের মধ্যে ছেড়ে দিতে-দিতে কানাই জিগগেস করলে, 'অসুখ একদম সেরে যাবে তো বাবাজী?'

'সেরে যাবে মানে ?' বাবাজী উত্তেজিত হয়ে উঠলেন : 'সেরে গেছে।'

'হ্যাঁ, দাদাবাবু বলেছিলেন যে পর্শু তাঁর জ্বর নেমে গেছে, আর আসে নি।'

'নামতেই হবে জ্বর, না নেমে উপায় আছে ?' বাবাজী গম্ভীর গলায় বললেন, 'পর্শুই যে প্রথম আমাকে তুই স্মরণ করেছিলি, আমাকে সমর্পণ করেছিলি তোর মন, তাই পর্শুই তোর দাদাবাবুর জ্বর নেমে গেল। কী রে সভারাম, আমাকে স্বপ্ন দেখেই তো তোর সেই পিত্ত-শূলের ব্যথাটা প্রথম নরম পড়ল ?'

সভারাম হাতজোড় করে বসে ছিল, ঘাড় দোলাতে-দোলাতে গদগদ গলায় বললে, 'আমি তো তবু স্বপ্ন দেখেছিলাম, গঙ্গারাম তো সেরে উঠল গায়ে শুধু আপনার ছায়া পড়েছিল বলে।'

'হতেই হবে যে। এত ভক্তি, এত বিশ্বাস কি কখনো মিথ্যে হতে পারে ?' বাবাজী কানাইয়ের দিকে একবার করুণ দৃষ্টিপাত করলেন : 'পর্শু আমার কাছে আসতে চেয়েছিস বলে পর্শুই নেমে গেছে জ্বর, কাল সশরীরে এসে শপথ করে গিয়েছিস বলে কাল চলে গিয়েছে আর-আর সব জটিল উপসর্গ, আর আজ সত্যি-সত্যি স্বর্ণাহুতি নিয়ে এসেছিস বলে ঘুচে গেছে তার অকালমৃত্যুর ভয়। জীতা রহো বেটা ! বাড়ি ফিরে যা, ছাখ্ গে তোর দাদাবাবু গা-ঝাড়া দিয়ে বিছানায় উঠে বসেছে।'

কানাইয়ের দু-চোখ আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। বললে, 'শুনেছি অসুখটা নাকি খুব বেয়াড়া। ফিরে এসে আক্রমণ করবে না তো ?'

'সাধ্য কী তার ফিরে আসে ? শুধু তোর তিন-সত্য তুই মনে রাখিস। তাহলেই তোর দাদাবাবু সম্পূর্ণ নিরাপদ।' বাবাজীর গলা কঠিন হয়ে এল : 'আর যদি কোনদিন সত্যভ্রষ্ট হোস, মানে, যা কথা দিয়েছিস তা মেনে না চলিস তাহলে ঘোরতর সর্বনাশ হবে বলে রাখছি ! দেখিস, মনে আছে তো সে কথাগুলো ?'

কানাইয়ের যদিও মনে ছিল, বাবাজী দৃঢ় করে তার উপর বার-বার দাগা বুলিয়ে দিতে লাগলেন।

সমবেত ভক্তের মধ্যে থেকে বাবাজীর উদ্দেশ্যে তুমুল জয়ধ্বনি উত্থিত হল। এমন শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ তারা দেখেনি এ পৃথিবীতে।

সমীর ভাল হয়ে উঠল, ডাক্তাররা ভাবল তাদের চিকিৎসার জোরে ; নার্সরা ভাবল তাদের পরিচর্যার গুণে ; চন্দ্রবাবু ভাবলেন তাঁর অপার অর্থব্যয়ে ; আর কানাই ভাবল, তারই গোপন আপ্রাণ প্রার্থনায়, বাবাজীর অজস্র আশীর্বাদে। আর কিছুই কানাই চায় না, সুন্দর থাক এ-পৃথিবী, সুখময় থাক এই সংসার, আর নীরোগ থাক তার দাদাবাবুর দেহ, অফুরন্ত থাক তার পরমায়ু।

জায়গার জিনিস জায়গায় এসে বসেছে, নতুন করে গোছানো হচ্ছে সব ঘর-দোর। নবতর পৃথিবীতে নতুন জন্ম হয়েছে যেন সমীরের, আকাশের নীলিমা থেকে ঘরের দেয়ালের শুভ্রতাটুকু পর্যন্ত তার অসম্ভব সুন্দর মনে হচ্ছে। রৌদ্রে উড়ন্ত একটা পাখি, দেয়ালের গায়ে হৃষ্ট-পুষ্ট একটা টিকটিকি, আকাশের এক কোণে আলস্যে স্তূপীকৃত একটুকরো মেঘ, টেবিলের উপর অবিন্যস্ত তার বইগুলি—সমস্তই কেমন আশ্চর্য নতুন, আশ্চর্য আনন্দময়। নতুন পৃথিবী রচনা করবার স্বাদ পাচ্ছে সে নতুন ভাবে নতুন পরিবেশে ঘর-গুছোনোতে।

দিনে-দিনে ক্রমে-ক্রমে এল সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্ত, হলদে-রঙের ট্রাঙ্ক খুলে মখমলের বাক্সে সোনার মেডেলগুলো যখন সমীর দেখতে পেল না।

'একি, কোথায় গেল সোনার মেডেল ?' সমীর চিৎকার করে উঠল।

ট্রাঙ্কে চাবি দেয়া আছে নির্ভুল, মখমলের বাক্সটা রয়েছে অটুট, অথচ সোনার মেডেলগুলো গিয়েছে অদৃশ্য হয়ে। এ কী অভাবনীয় চুরি ! কী করে এ সম্ভব হতে পারে ?

সমীরের চেঁচামেচিতে প্রথমেই আবির্ভূত হল ম্যানেজার। সহজেই ব্যাপারটা অনুধাবন করে সে রায় দিলে, এ কোন পাকা চোরের কাজ, আর সেই চোর এই বাড়িতেই অধিষ্ঠান করছে বলে তার অনুমান।

সমীর বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইল ম্যানেজারের মুখের দিকে।

'বেচারা অধর তো আর আমার প্রাইভেট সেক্রেটারি নেই যে, মোটের উপর, প্রাইভেট পাবলিক সমস্ত অপরাধই তার কাঁধে চাপাবে।' ম্যানেজার তার লম্বমান যুগ্ম গুম্ফে হাত বুলুতে লাগল : 'এই বাড়িতে এখন যিনি একচ্ছত্র চৌর্য-সম্রাট তিনি ছাড়া আর কারুরই এই কীর্তি নয়।'

সমীর রাগ করে উঠল। বললে, 'এ আমি মরে গেলেও বিশ্বাস করব না।'

'জীবিত অবস্থাতেই এর চেয়ে অনেক ভয়ঙ্কর জিনিস বিশ্বাস করতে হয়। মোটের উপর, ব্রজদুলালকে ডেকে একবার জিগগেস করলে দোষ কী?'

'অসম্ভব।' আহত অভিমানের সঙ্গে সমীর বললে।

'তাহলে তোমার বেচারি নার্সদের সন্দেহ করতে হয়। কিন্তু তারা কী করে জানবে কোন্ ট্রাঙ্কে কী মেডেল, কোন্ গর্তে কী চাবি। দেখছ তো, ঠিক আলাদা করে বেছে আলগোছে চুরি করে নেয়া।'

'ছি ছি, নার্সদের আমি সন্দেহ করব কেন?'

'তবেই তো বুঝতে পারছ, মোটের উপর, এ জানা চোরের কাণ্ড একাধারে চোর, অন্যাধারে জানা, ব্রজদুলাল ছাড়া আর কে আছেন এ গোকুলে? মোটের উপর, ননীচোরকে ডেকে একবার জিগগেস করলে ক্ষতি কী? পুলিশে ডায়েরি করবার আগে সব সন্ধান-সুলুক তো নিতে হবে!' বলে সমীরের কোনো জবাবদিহির অপেক্ষা না করে ম্যানেজার কানাইয়ের উদ্দেশ্যে হাঁক পাড়তে লাগল।

শান্ত ও স্নিগ্ধ মুখে কানাই কাছে এসে দাঁড়াল, সমীরের মনে হল এমন একখানা নির্মল পবিত্র মুখ সে কখনো দেখেনি, কোন অশুভ চিন্তার লেশ পর্যন্ত সেখানে লেখা নেই।

'এর ট্রাঙ্ক থেকে সোনার মেডেলগুলো উধাও হয়েছে,' ব্যস্ত হয়ে ম্যানেজার বলতে লাগল, 'তোমার ছাড়া আর কারুর এ কাজ নয় বলে আমাদের বিশ্বাস। বল, সত্যি করে—'

ম্যানেজারের মুখের থেকে কথা কেড়ে নিয়ে সমীর স্নিগ্ধ স্বরে

বললে, 'তুমি বলতে পার, কোথায় গেল সেই মেডেলগুলো ? আমি ভুল করে আর কোথাও রাখিনি তো ? কিন্তু, এই ট্রাঙ্কে ছিল বলেই কি তোমার মনে হয় না ?'

'হ্যাঁ এই ট্রাঙ্কেই ছিল, আর এই মখমলের বাক্সে।' কানাই ভয়হীন স্পষ্ট কণ্ঠে বললে।

'কিন্তু এখন আর দেখতে পাচ্ছি না সেগুলো। কোথায় গেল বল দেখি ?'

'লাফ দিয়ে আকাশে উঠে তারা হয়ে গেছে ; এত দূরে চলে গেছে যে চর্মচক্ষে দেখাই যাচ্ছে না।' ম্যানেজার টিপ্পনি কাটল। পরে অসহিষ্ণু গলায় বললে, 'অত ভণিতা করার দরকার কী ? মোটের উপর, সোজা প্রশ্নের সোজাসুজি উত্তর চাই। বল্ সত্যি করে, তুই নিয়েছিস কি না মেডেল ?'

অম্লান মুখে পরিষ্কার গলায় কানাই বললে, 'হ্যাঁ, আমিই নিয়েছি।'

সমীরের মুখের উপর বিশাল মুষ্টিতে কে যেন প্রবল ঘুসি মারল, যেন তার অনুভূতিতে আলো নেই, শব্দ নেই, সমস্ত যেন লেপে-মুছে একাকার হয়ে গিয়েছে।

'তুমি নিয়েছ ?' আর্ত কণ্ঠে সমীর চেঁচিয়ে উঠল।

কিন্তু কানাই যেন তার মনের মধ্যে কোন ভয়, কোন লজ্জারই লেশমাত্র আভাস পেল না। তেমনি সতেজ, নির্মল কণ্ঠে বললে, 'হ্যাঁ, বলছি তো, স্বীকার করছি আমি, আমিই নিয়েছি ঐ মেডেলগুলো।'

মুহূর্তে সব যেন ওলোট-পালোট হয়ে গেল। যেন বিশাল একটা বনস্পতি মাটির বহুদূর গভীরে শিকড় মেলে দিয়েছিল, কোন্ অন্ধ ঝটিকায় ব্যাকুল সেই স্নেহের গ্রন্থিগুলি আজ ছিঁড়ে-ছিঁড়ে যাচ্ছে।

'তুমি জান না ঐ মেডেলগুলো আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়, সবচেয়ে মূল্যবান ?'

'জানি।' কানাই তেমনি শান্ত-স্মিত মুখে বললে, 'জানি বলেই তো সেগুলো নিয়েছি।'

'কেন নিয়েছ ?' কর্কশ রেখা ফুটে উঠল সমীরের গলায়।

উত্তরে কী বলতে গিয়ে কানাই অর্ধপথে বাকরোধ করল। বুঝতে পারল এতক্ষণে, সে কত অসহায়, কত বড় বিপদের সে সম্মুখীন। ত্রস্ত চোখে তাকাল একবার চারদিকে, চারদিকেই দেখল প্রকাণ্ড শূন্য, কিছুই ধরবার নেই, কোথাও দাঁড়াবার নেই। ম্যানেজারের তীব্র চক্ষু তাকে তপ্ত শলাকার মত বিদ্ধ করছে। তবু জিহ্বা তার অসাড়, বলার অর্থই হচ্ছে দেবতার কাছে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা আর তার ফল হচ্ছে দাদাবাবুর সর্বনাশ ডেকে আনা। সে নিজে হাতির পায়ের তলায় গিয়ে শুতে পারে, কিন্তু তার দাদাবাবুর গায়ে ক্ষীণ একটি আঁচড়ও সে লাগতে দিতে পারে না।

'কই, উত্তর দাও কেন নিয়েছ ঐ মেডেল ?' সমীর কানাইয়ের হাত ধরে কঠিন ঝাঁকুনি দিতে লাগল।

ততক্ষণে কনকলতা ও চামেলি উঠে এসেছে তেতলায়। সমীর কানাইয়ের প্রতি রূঢ়ভাষী হয়েছে, এ-বাড়িতে এটা একটা অলৌকিক ঘটনা।

'কী, কথা বলছ না কেন ? কেন, কেন নিলে আমার মেডেল ?'

কানাই আনত চোখে আর্দ্র কণ্ঠে বললে, 'তা আমি বলতে পারব না।'

এমন অসম্ভব উত্তর কে কবে শুনেছে ? সমীর হতবুদ্ধির মত বললে, 'বলতে পারবে না মানে ? নিতে পারলে, অথচ কেন নিলে তা বলতে পারবে না ?'

ম্যানেজার ফোড়ন দিল। বললে, 'এ নিয়ে পীড়াপীড়ি করে লাভ নেই। যখন বলতে পারছে না কেন নিয়েছে, তখন, মোটের উপর, সহজেই বোঝা যাচ্ছে নেয়ার উদ্দেশ্য কী। আমি কি আর সাধে চৌর্য-সম্রাট উপাধি দিয়েছি ? নতুন ইতিহাসে মৌর্য-সম্রাটের পরেই এ চৌর্য-সম্রাটের স্থান হবে।'

সমীরের বাক্স থেকে কানাই জিনিস সরাতে পারে, কনকলতা ও

চামেলির কাছে সেটা একেবারে স্বপ্নেরও বাইরে। কিন্তু প্রত্যক্ষ দিনের বেলায় এ কী দেখতে হচ্ছে চোখ মেলে!

'নিয়েছ আমার মেডেল, বেশ, ফিরিয়ে দাও সেগুলো।' সমীর হাত পাতল।

এ রকম ভাবে যে শেষে সর্বনাশের মুখে এসে দাঁড়াতে হবে কানাই তা ঘূণাক্ষরেও ধারণা করতে পারেনি। তার হাত-পা অবশ, জিভ আড়ষ্ট, দৃষ্টি নিষ্প্রভ হয়ে আসতে লাগল। তবু, দাদাবাবুর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কাছে তার নিজের সর্বনাশটা কত তুচ্ছ, কত অকিঞ্চিৎকর! দুই বিগলিত চোখে কানাই বললে, 'আমার কাছে তা নেই।'

'নেই? কোথায় তবে রেখেছ সেগুলো? ভালো চাও তো শিগগির বের করে দাও বলছি।' সমীর নিষ্ঠুরের মত ধমক দিয়ে উঠল।

গাল বেয়ে অশ্রুর ধারা নেমে এল কানাইয়ের। মনে-মনে ভাবল একবার সেই মহাপুরুষ সন্ন্যাসীকে; বললে, 'তা আমি বলতে পারব না।'

'বলবার আর আছে কী!' ম্যানেজার বললে, 'মোটের উপর সেই সোনা এখন গলে-গলে গোল-গোল রুপোর আকার ধারণ করেছে।'

সমীর হাত ছেড়ে দিল কানাইয়ের। ক্লান্ত, করুণ গলায় বললে, 'শেষকালে তুমি চুরি করলে, আর, আমারই বাক্স থেকে? আর, বেছে-বেছে এমন জিনিস চুরি করলে যা কিনা আমার কাছে সবচেয়ে দামি, সবচেয়ে সযত্নে রক্ষা করবার! তোমার কিসের অভাব ছিল এ সংসারে? অভাব ছিল তো বল নি কেন আমাকে? তোমার কোন্ অভাবটা আমি অপূর্ণ রেখেছি? আর, বলতেই যদি পার নি, তবে ওর বদলে আমার সোনার বোতাম কিম্বা ঘড়ি, জামা-কাপড় বা অন্য কিছু কেন চুরি করনি? কেন তুমি সব জেনে-শুনে কাকামণির মেডেলগুলি চুরি করলে?'

'বা, আমি চুরি করলাম কোথায়।' কানাই ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল, বললে, 'আমি তো বলছি যে আমি নিয়েছি'

চামেলি খিলখিল করে হেসে উঠল। বললে, 'কী বুদ্ধি দিগ্‌গজের!

নেয়াটা স্বীকার করছেন বলে তিনি চোর নন। চোর নোস তো, ফিরিয়ে দে জিনিস। না বলে বাক্স খুলে জিনিস নেবে, ধরা পড়বার পরও জিনিস ফিরিয়ে দেবে না, অথচ তাঁকে চোর বলা যাবে না, তাঁকে বলতে হবে সিদ্ধ মহাপুরুষ! নির্লজ্জ কোথাকার!'

ম্যানেজার মুখ-বিকৃতি করে বললে, 'সাধে কি আর আমি চৌর্য-সম্রাট উপাধি দিয়েছি!'

'এমন অকৃতজ্ঞ তো কোথাও দেখিনি!' কনকলতা বিষণ্ণ-বিস্মিত গলায় বললেন, 'এত দয়া, এত স্নেহ, আর তার বদলে এই ব্যবহার! শেষকালে যে সত্যি-সত্যি দুধ-কলা দিয়ে সাপই পোষা হল দেখছি! ছি-ছি, শেষকালে এমনি করে ছোবল মারলি তুই?'

'গরিব, ছোটলোক—এর চেয়ে আর তুমি কী প্রত্যাশা করতে পার?' চামেলি নাক কুঁচকোল।

'দেবে না—দেবে না আমার জিনিস?' সমীর আবার হাত পাতল, 'তার বদলে যত চাও তোমাকে আমি টাকা দিচ্ছি, কাকামণির স্মৃতিচিহ্ন আমার সেই আদরের মেডেলগুলি শুধু ফিরিয়ে দাও। কোনদিন যদি আমার থেকে কোন স্নেহ, কোন উপকার পেয়ে থাকো, তার বিনিময়ে এটুকু ভিক্ষা শুধু আমাকে দাও।'

কানাই দাঁত দিয়ে তার স্ফুরিত নিচের ঠোঁটটা চেপে ধরল। বললে, 'তা আর আমার ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়।'

'তুমি আমার সমস্ত স্বপ্ন এক নিমেষে ভেঙে দিলে, কানাই!' সমীর অভিভূতের মত বলতে লাগল, 'গরিব বা বড়লোক বলে কোন ভেদ আমি মানি নি, বড় বেশি বিশ্বাস ছিল আমার মনুষ্যত্বে; তুমি আমার সেই বিশ্বাস পায়ে মাড়িয়ে শুকনো ঢেলার মত গুঁড়ো করে দিলে। ভেবেছিলুম তোমাকে নিয়ে আমি নতুন সমাজ নতুন পৃথিবী রচনা করব, কিন্তু দেখলুম আমি ভুল লোক বেছেছি, যে জায়গা থেকে অঙ্কুর তুলে এনেছি, দেখলুম সেটা শুধু আবর্জনার দেশ, সেখানে আগাছারই জন্ম হয়, মহীরুহের জন্ম হয় না। কী করবে আর দাঁড়িয়ে থেকে?

মানুষের অপরাধ করার প্রবৃত্তিটা যে কখনো-কখনো রক্তের মধ্যেই থাকে, সব সময়েই যে সেটা পারিপার্শ্বিক অবস্থার ফল নয় এটা আজ তোমাকে দেখে বুঝলুম। কাজে-কাজেই, তোমাকে দিয়ে আমার কোন কাজ হবে না, তুমি চলে যাও আমার সুমুখ থেকে।'

সমস্তগুলি কথা কানাই বোঝেনি, শুধু দাদাবাবু যে তাকে তাঁর সমুখ থেকে চলে যেতে বলছেন সেই কথাটাই বিষাক্ত তীরের মত তার বুকের মধ্যে বিঁধে রইল। দু-হাতে মুখ ঢেকে অঢেল কান্নায় সে ফুঁপিয়ে উঠল, আস্তে-আস্তে পা বাড়াল সে দরজার দিকে, কিন্তু এমন একটা দুঃখের মুহূর্তেও সে একটি কথাও প্রকাশ করল না।

'ওকে অমনি চলে যেতে দিচ্ছ কী, দাদা?' চামেলি লাফিয়ে উঠল, 'ওকে পুলিশে দেবে না? স্টেটের প্রতি তোমার কোন কর্তব্য নেই?'

আশ্চর্য, কানাইকে পুলিশে দেওয়ার বিরুদ্ধে ম্যানেজারই যুক্তি প্রয়োগ করতে বসল। সেটা তত যুক্তি নয়, যত করুণা। বললে, 'জিনিস যখন পাওয়া যাবে না তখন পুলিশে ধরিয়ে দিয়ে লাভ কী! শুধু-শুধু মারই খাবে, জিনিসের কোন কিনারা হবে না।'

'না,' সমীর সঘৃণ ভঙ্গিতে বললে, 'আমি জিনিসও চাই না, ওর মুখ দেখতেও চাই না।'

'না, আমাকে পুলিশে ধরিয়ে দিন, আমাকে মারুন, আমাকে মার খাওয়ান!' কানাই ব্যাকুল স্বরে আর্তনাদ করে উঠল।

'যা তোমার স্বভাব, রাস্তায় বেরুলে পুলিশের হাতে যেতে তোমার বেশি সময় লাগবে না।'

কানাই কান খাড়া করে শুনল সমীরই তাকে বলছে এ কথা। মনে হল, এর চেয়ে গলায় একটা ধাক্কা বা গায়ে একটা লাথিও যেন মৃদু লাগত। দু-হাতের পিঠে চোখের জল মুছে কোন দিকে না তাকিয়ে সে টলতে-টলতে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

'এ কী কথা! চোরকে তোমরা পুলিশে দেবে না? হাউ ফানি!' চামেলি ব্যস্ত হয়ে উঠল: 'দাঁড়াও, আমি বাবাকে ডেকে আনছি।'

আপিস-ঘরে কোন কোলাহলই এ পর্যন্ত চন্দ্রবাবুর কর্ণগোচর হয়নি। এতক্ষণে মেয়ের মুখে সমস্ত কথা জেনে তিনি অপরিমিত উল্লসিত হয়ে উঠলেন। ক্রুদ্ধ নয়: উল্লসিত। পুলিশে দেওয়া হয়নি বলে ক্রুদ্ধ নয়, সমীরই যে স্বেচ্ছায় কানাইকে তাড়িয়ে দিয়েছে তারই জন্যে উল্লসিত।

দ্রুত পায়ে নেমে এলেন নিচে। বললেন সমীরকে লক্ষ্য করে, 'কী, আমার কথাটাই শেষ পর্যন্ত ঠিক হল কি না? আমি বলেছিলুম কি না তেলে-জলে মিশ খায় না। বলেছিলুম কি না যে চোর, তার কাছে স্নেহ-ভালবাসার চেয়ে সোনা-রুপোই দাম বেশি। বলেছিলুম কি না—'

সমীর জানলা দিয়ে দেখতে পেল কানাই চোখ মুছতে-মুছতে খোঁড়াতে-খোঁড়াতে প্রখর রৌদ্র মাথায় করে রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছে।

আরেক বার, শেষবার, সে চেঁচিয়ে উঠল: 'এখনো বল কেন নিয়েছ আমার মেডেল, কোথায় রেখেছ সেগুলো লুকিয়ে। এখনো বল, ফিরে তাকাও একবার আমার মুখের দিকে। আবার ফিরে এস আমাদের ঘরে—'

'একি,' চামেলি আবার একটা ঘাই মারল: 'চোরকে তোমরা জেলে পাঠাবে না নাকি? এমন একটা পাজি দাগি চোর—'

ম্যানেজার আবার বাধা দিল; গোঁফ দোলাতে-দোলাতে বললে, 'বেশি খেতে করে আশা, তার নাম বুদ্ধিনাশা। বাড়ি ছেড়ে ভালোয়-ভালোয় চলে গেছে তাই যথেষ্ট।' এই বলে চন্দ্রবাবুর দিকে চেয়ে সে একটা গর্বদৃপ্ত ভঙ্গি করল।

আশ্চর্য, সেই ভঙ্গির সামনে চন্দ্রবাবুও কেমন নিস্তেজ হয়ে এলেন।

রাস্তা দিয়ে অনেক দূর হেঁটে গিয়েছে কানাই, হঠাৎ শুনতে পেল পিছন থেকে তাকে কে ডাকছে। চেয়ে দেখল, ম্যানেজার।

ম্যানেজার তার কাঁধে স্নেহে একখানা হাত রাখল। বললে, 'কেঁদে কিছুই লাভ নেই ভাই। বড়লোকেরা কেউ কখনো গরিবের দুঃখ বোঝে না। সহানুভূতি যেমন দেখায় তেমনি অপমানিত করতেও ছাড়ে না। কথায়ই তো বলে, বড়র পীরিতি বালির বাঁধ, ক্ষণেক হাতে দড়ি ক্ষণেক চাঁদ।'

কানাই কোন কথা বলল না, নীরবে নিরুদ্দেশ পথ ভাঙতে লাগল।

'আর, কোথায় যাচ্ছিস তুই একা-একা? কী করে চলবে তোর দিন?'

মূঢ়ের মত কানাই তাকাল একবার ম্যানেজারের দিকে।

ম্যানেজার তার হাতে দশ টাকার নোট গুঁজে দিয়ে বললে, 'এই নে কটা টাকা, কটা দিন চালিয়ে দিতে পারবি হয়ত। মোটের উপর, বুঝলি কানাই, সংসারে স্নেহ-ভালবাসা ভক্তি-বিশ্বাসের কোন দাম নেই, যে যার ঘুরছে শুধু স্বার্থের সন্ধানে।'

'না, না, আছে!' বলে রাস্তার মাঝখানেই কানাই ম্যানেজারের পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ল।

গোঁফে হাত বুলুতে-বুলুতে চিন্তান্বিত মুখে ম্যানেজার বললে, 'আর কত প্রণাম করবি, কানাই?'

এর কিছুকাল পরে ইউরোপগামী এক জাহাজে দেখা গেল সমীরকে। চন্দ্রবাবু কনকলতা ও চামেলি তাকে বিদায় দিতে এসেছে, এবং বলা বাহুল্য, সঙ্গে আছে সর্বত্র-উপস্থিত ম্যানেজার।

এক ফাঁকে সমীরকে একটু নিরিবিলি পেয়ে ম্যানেজার তার হাতে একটা রুমালের পুঁটলি উপহার দিল।

'কী এটা?' খুলে দেখে সমীরের তো চক্ষুস্থির! আর কিছু নয়, তার কাকামণির সেই মেডেলের তোড়া!

'একি, এ আপনি পেলেন কী করে?'

'মাপ কর, তা বলতে পারব না।' ম্যানেজার তার বাইসিকেলের হ্যাণ্ডেলদুটোতে হাত বুলুতে লাগল। বললে, 'তোমার কানাইও

সেদিন বলতে পারে নি কেন নিয়েছিল সে এই মেডেলগুলো, তেমনি আমারও বলা বারণ, কেমন করে এগুলো ফিরে এল আমার হাতে।'

'আমি বিলেত যাচ্ছি খবর পেয়ে এগুলো সে আপনাকে ফিরিয়ে দিয়ে গেছে বুঝি?'

'যা-কিছু তুমি ভাবতে পার।' ম্যানেজারের গলা কেমন বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে এল। 'এও ভাবতে পার মোটেই সে চুরি করেনি। এও ভাবতে পার তার বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার পর আর আমার দেখাই হয়নি তার সঙ্গে। এও ভাবতে পার তার চোরাই মাল আর কেউ চুরি করে এনেছে। যা তোমার খুশি। যা তোমার ভাবতে ভাল লাগে, ভাবতে সুবিধে মনে হয়।'

'কানাই কোথায়? সে কি এসেছে জাহাজে?' সমীর অস্থির হয়ে উঠল।

'কে জানে কোথায়? পথের ছেলে, জনসমুদ্রে গিয়েছে মিশে। পৃথিবীটা ঘুরে দেখে এস, লেখাপড়া শিখে বড় হও, কানাইয়ের আর দেখা পাবে কি না কে জানে, কিন্তু তাকে না পাও, পাবে তার অনেক-অনেক গরিব সহচর, সমস্ত পৃথিবী জুড়ে। তারই মত দুর্বল, তারই মত নির্বাক, তারই মত স্নেহময়। তখন বুঝবে, আমাদের জন্যে, বড়লোকদের জন্যে তাদের কী স্বার্থত্যাগ, কী আত্মোৎসর্গ!'

জাহাজ ছাড়বার সময় হল, সবাই নেমে গেল জেটিতে। উড়তে লাগল অসংখ্য রুমাল, কিন্তু বিদায়ের চরম মুহূর্তে সমীরের অশ্রু-আপ্লুত দুই চক্ষু দূর থেকে দূরতর তটরেখায় খুঁজে বেড়াতে লাগল তার কানাইকে, তার স্বপ্নময় উজ্জ্বল ভবিষ্যৎকে।

গল্প

ফিরিঙ্গি

এক

ফিরিঙ্গিকে নিয়ে কিছুতেই ট্রেনের এক কামরায় উঠতে দিল না। আলাদা টিকিট কেটে তাকে অন্য গাড়িতে চালান দিতে হবে। উপায় নেই, সমীর চলেছে কলকাতায়, জ্যাঠাইমার কাছে,—পৃথিবীতে বন্ধু বলতে তার এই ফিরিঙ্গি, তাকে সে ফেলে যেতে পারে না।

শিলচরের এক চা বাগানে সমীরের বাবা কেরানির কাজ করতেন। সেবার বছরের গোড়ার দিকে হঠাৎ তাঁর জ্বর হল—জংলি জ্বর, সহজে আর নামতে চায় না। সত্যিই যখন নামল, তখন সমীরের বাবা চির-দিনের জন্য ঠাণ্ডা হয়ে গেছেন। মা তো গেছেন কবে—সমীরের কিছু মনেও পড়ে না এখন। এক-একবার—মাঝরাতে যখন ঘুম ভেঙে যায় তখন ঘরের অন্ধকারকে তার মা বলে মনে হয়—যেন তাঁর স্নেহ তাকে ঘিরে এই অন্ধকারে ঘন হয়ে উঠেছে।

বাগানের ম্যানেজার এক সাহেব—নাম গার্থ। সে বললে, 'কী করতে কলকাতা যাবে? এখানেই থাকো—তোমাকে একটা ছোটখাট কাজ দি। তারপর আর-একটু বড় হলেই তোমাকে সঙ্গে করে বিলেত নিয়ে যাব।'

কিন্তু এদিকে বাবা মারা যেতেই জ্যাঠাইমা লিখে পাঠিয়েছেন—সমী যেন আর ঐ বুনো পচা জায়গায় পড়ে না থাকে। টিকিট কেটে সোজা সে কলকাতায় চলে আসুক। সংসারে তার আত্মীয় বন্ধুর অভাব নেই।

সমীর সাহেবকে বললে, 'কলকাতায় আমার জ্যাঠাইমা আমাকে যেতে লিখেছেন, এ বিপদের সময় আমাকে দেখতে পেলেও তাঁরা অনেকটা সান্ত্বনা পাবেন। আমার এখন সেখানে যাওয়াই কি উচিত নয়?'

গার্থ তার কাঁধ চাপড়ে বললে, 'বেশ, তাই যাও তবে। কিন্তু আমি

তোমাকে কোনদিন ভুলব না, সমী। আমাকে নিয়ম-মত চিঠি লিখো, কেমন? আপিসের কাজে যখন কলকাতায় যাব তখন আমার সঙ্গে দেখা কোরো।' বলে সে সমীরের চামড়ার বেল্টের নিচে চওড়া মানিব্যাগে কতকগুলি দশটাকার নোট গুঁজে দিল। 'তোমার বাবা কোম্পানির অনেক ভাল কাজ করে গেছেন, সেইসব কাজের পুরস্কার পাবার ভাগ্য তাঁর হল না। কিন্তু তুমি তাঁর উত্তরাধিকারী—সে কথা আমার সব সময়েই মনে থাকবে, সমী।'

গার্থ তার অস্টিন কারে করে সমীর আর ফিরিঙ্গিকে স্টেশনে নিয়ে এল। সমীরের বয়স এই ষোল—প্রাইভেটে ম্যাট্রিক পাশ করেছে—দেখতে ভোরের প্রথম আলোর মত টাট্‌কা, ধানের শিসের মত কচি। পরনে খাকির হাফপ্যান্ট, টুইল শার্টের হাতাদুটো কনুইয়ের কাছে গুটোনো, চওড়া কলারটা হাওয়ায় ঘাড়ের উপর উঠে উঠে যাচ্ছে।

গার্থ বললে, 'তোমরা একেবারে সব শূন্য করে চলে যাচ্ছ, সমী। তোমার বাবা যখন প্রথম চাকরি করতে এলেন তখন তুমি হও নি। তোমাদের বাড়িতে তখন তোমার মার হাতের কত পিঠে খেতাম রোজ—কী সব অদ্ভুত নাম—চানার জেলপি, মালপু—ওকি, তোমার চোখ ছলছল করে উঠল যে! এই দেখ—এই জঙ্গলে একদিন বাঘ দেখা দিয়েছিল, যদি এখন তেড়ে আসে, কী করবে বল তো সমী?'

সমীর কথা বললে না।

গার্থ বললে, 'খুব জোর হেড-লাইট ফেলে পুরো দমে বেরিয়ে যাব। ছেলেমানুষি কোরো না সমী, চোখের জল মোছ। কলকাতায় তো তোমার জ্যাঠাইমা আছেন। মার চেয়ে তিনি কম কিসে?'

স্টেশনে গাড়ি এসে পৌঁছুল। কিন্তু ফিরিঙ্গিকে নিয়ে এক কামরায় ওঠা যাবে না শুনে সমীরের মন মুষড়ে পড়ল একেবারে।

গার্থ বললে, 'তাতে কী? কলকাতায় পৌঁছেই তো ওকে ফিরে পাবে।' বলে ফিরিঙ্গিকে সে হঠাৎ কোলে নিল।

গার্থ সব বন্দোবস্ত করে দিলে। কিন্তু ফিরিঙ্গি কিছুতেই সমীরকে

ছেড়ে অন্য গাড়িতে উঠবে না। হাত-পা ছুঁড়ে, চেঁচামেচি করে সে এক প্রলয় কাণ্ড শুরু করলে। কিন্তু তার এই অসম্ভব আবদারে কান না পেতে ট্রেনের গার্ড তাকে পেছন দিকে একটা ছোট কুঠুরির মধ্যে পুরে বাইরে থেকে চাবি ঘুরিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলে।

তারপর আকাশময় ধোঁয়া উগরে ট্রেন দিল ছেড়ে। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে গার্থ রুমাল নাড়ছেন। সমীরের দুই চোখ তখন জলে ঝাপসা হয়ে এসেছে—শুধু গার্থকে ছেড়ে যাচ্ছে বলে নয়, ফিরিঙ্গিকে একলা ঘরে অমনি আটক করে রাখা হল বলে। কী না জানি সে ভাবছে, অন্ধকার ঘর থেকে ছুটে আসবার জন্যে অস্থির হয়ে কত না-জানি সে দেওয়ালে মাথা কুটছে, ক্ষিদে পেলে ভাবভঙ্গিতে কাউকেই সে জানাতে পারবে না। কোলের উপর মাথা রেখে কেই বা আজ তাকে ঘুম পাড়িয়ে দেবে!

প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে গার্থের চোখও শুকনো নেই। ভারতবর্ষে এসেছে সে আজ পঁচিশ বছর, কিন্তু এই আসামের পাহাড়ি জঙ্গলে এই বাঙালী পরিবারটির সঙ্গে তার অন্তরঙ্গতার অন্ত ছিল না। কিন্তু সেই বাসা আস্তে আস্তে ধ্বসে পড়ল—শেষকালে সমীরও তাকে ছেড়ে চলল—বিপুল রাজধানীতে বড় হবার সাধনা করতে। ট্রেনটা ঐ ছোট একবিন্দু পাখি হয়ে মিলিয়ে গেল দিগন্তে।

দুই

শেয়ালদায় আসতেই সেই বন্ধ কামরাটার দরজা গেল খুলে। হ্যাঁ, ফিরিঙ্গি বেঁচে আছে, কিন্তু এক রাত্রেই সে একেবারে বুড়ো, চিমসে হয়ে গেছে। কাছাকাছি প্ল্যাটফর্মের সিমেন্টের উপর সমীরের জুতোর আওয়াজ পেতেই তার কান খাড়া, হাত-পা কঠিন, অসহিষ্ণু হয়ে উঠল। দরজার বাইরে সমীরকে একবার সশরীরে দেখতে পেয়েই আর তাকে কে রাখে! এক লাফে নেমে পড়ে আর-এক লাফে সে সমীরের গলা জড়িয়ে বুকের উপর উঠে পড়ল। সমীর তাকে যত নামিয়ে দিতে

চেষ্টা করে ততই সে ভয়ার্ত কণ্ঠে প্রতিবাদ করে প্রাণপণ শক্তিতে তাকে আঁকড়ে থাকে।

যদিও আগে সে খবর পাঠিয়েছিল, স্টেশনে কেউ তাকে নিতে আসে নি। তাতে ভয় পাবার ছেলে সে নয়। সোজা সে একটা ট্যাক্সি নিলে—ড্রাইভারকে ঠিকানা দিতেই সে নির্ভাবনায় স্টার্ট দিলে। গভীর নিস্তব্ধ অরণ্য থেকে সমীর এই নতুন আসছে। চারিদিকে রাশি-রাশি কোলাহল, অগণন গাড়ি-ঘোড়া, রাস্তার দুই ধারে দালান বালাখানার পাহাড় উঠে গেছে—সেইসব দিকে সমীরের নজর নেই। সে ফিরিঙ্গিকে বুকে চেপে ধরে তার তুলতুলে পিঠের উপর হাত বুলুতে বুলুতে বললে, 'আমাকে ছেড়ে খুব কষ্ট হচ্ছিল, না রে? এই তো আমি, আর তোর কিসের ভয়? এমনি করে আমাকে আঁকড়ে থাকিস নে বোকা, ছ্যাখ্. কোথায় এসেছিস!'

ফিরিঙ্গি তবু কিছুতেই মুখ তুলবে না। সমীরের গলার নিচে মুখ গুঁজে সে নিঃশব্দে পড়ে রইল।

সমীর তার মুখটা তুলে ধরে বললে, 'কী রে, রাত্রে বুঝি একটুও ঘুমুতে পাস নি? আর ছ্যাখ্ দেখি আমার দিকে চেয়ে, আমিই বুঝি লম্বা ঘুম দিয়ে উঠলাম? আর ভাবনা কী, কেউ আর তোকে আমার কাছ থেকে কেড়ে রাখতে পারবে না। চল্ বাড়ি চল্, চান করে খেয়ে দেয়ে দুজনে বিছানা করে পাশাপাশি শুয়ে ঠেসে এক ঘুম দেব দেখিস। কী রে, খিদে পেয়েছে? বিস্কুট খাবি?' বলে সুটকেস খুলে সে বিস্কুটের টিন বার করল।

সত্যি, ফিরিঙ্গির এখন খিদে নেই। সে যে ফের সমীরকে পেয়েছে এই ঢের!

ড্রাইভার ঠিকঠাক নিয়ে এল যা-হোক।

জ্যাঠাইমা নিচে দাওয়ায় বসে কুটনো কুটছিলেন, হঠাৎ তাঁর সামনে সাহেবি-পোশাক-পরা একটি ভদ্রলোককে আসতে দেখে তিনি তাড়াতাড়ি মাথার উপর ঘোমটা টেনে দিলেন।

লজ্জিত হয়ে সমীর বললে, 'আমি সমীর। আমাকে চিনতে পারছেন না, জ্যাঠাইমা?'

তাড়াতাড়ি আবার ঘোমটা খসে পড়ল। জ্যাঠাইমা সমীরের সর্বাঙ্গে চোখ বুলিয়ে বললেন, 'ওমা, তাই তো—তা এমন সৃষ্টিছাড়া সাহেব হলি কবে থেকে? একেবারে পণ্টনি পোশাক! ছাড়, ছাড় ওগুলো, ছেড়ে কাপড় পর্ ভাল করে, আমাদের সেই সমী বলে যাতে চিনতে পারি!'

জ্যাঠাইমা এবার সমীরের বাবার জন্যে পা ছড়িয়ে বসে বিনিয়ে বিনিয়ে একটু শোক করবেন ভাবলেন, কিন্তু বাড়ির মধ্যে ফিরিঙ্গিকে হঠাৎ ঢুকতে দেখে তাঁর কান্না গলার মধ্যে আটকে গেল। তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, 'একি, এ কুকুরটা আবার ঢুকল কোত্থেকে? কী বিদঘুটে কাণ্ড! ও বিন্দা, বিন্দা! তাড়া, তাড়া ওটাকে!'

বিনোদ সমীরের জেঠতুতো ভাই—বয়েসে দু-চার বছরের বড়। সে তার পড়ার ঘর থেকে তার হকিস্টিকটা নিয়ে তেড়ে এল। বললে, 'কই কুকুর? কোন্ আঁস্তাকুড় থেকে উঠে এল?'

সত্যিই তাকে মারবার উপক্রম হচ্ছে দেখে ফিরিঙ্গি প্রবল কণ্ঠে প্রতিবাদ শুরু করলে। বিনোদের উত্তোলিত স্টিকটা ধরে ফেলে সমীর বললে, 'ওকে মেরো না। ও আমার সঙ্গে এসেছে। ও আমার ছোট ভাই।'

'ছোট ভাই!' কথা শুনে বিনোদের চক্ষুস্থির! সংসারে তার একজন প্রতিদ্বন্দ্বী জুটল বলে সমীরের উপর মন তার এমনিতেই খুশি নেই, তারপরে এই কাণ্ড! তাই সে টিপ্পনি কেটে বললে, 'ছোট ভাই হতে আর বাধা কী! যেমন একখানা বুলডগি চেহারা করে এসেছ! তা ছোট ভাইয়ের সঙ্গে দিব্যি মানিয়েছে বটে।'

'তোর সঙ্গে এসেছে মানে?' জ্যাঠাইমা খাপ্পা হয়ে উঠলেন, 'তুই সারা রাস্তা ঐ জানোয়ারটাকে ছুঁয়ে-ছেনে এসেছিস নাকি? এ কী অনাছিষ্টি কাণ্ড! ভাগ্যিস তখন প্রণাম করতে গিয়ে ছুঁয়ে ফেলিস নি!

ওকি, কুকুরটা যে দিব্যি উঠোনে নেমে মাছের আঁশগুলো চিবোতে লেগেছে! তাড়া, তাড়া পাজিটাকে! এ কী অনাচারের মধ্যে পড়া গেল!'

বিনোদ আবার তার হকিস্টিক দিয়ে ফিরিঙ্গিকে তাড়াতে গেল। কিন্তু ফিরিঙ্গি দাঁত-মুখ খিচিয়ে উল্টে এমন হৈ-চৈ শুরু করল যে বিনোদকে ভয়ে পিছু হটতে হল। বিনোদ নিতান্ত নাছোড়বান্দা, কয়লার একটা টুকরো কুড়িয়ে মারলে ছুঁড়ে ফিরিঙ্গির মাথা লক্ষ্য করে। ফিরিঙ্গি অমনি একলাফে দাওয়ায় উঠে বিনোদের পিছু নিলে।

চোখের পলক ফেলতে-না-ফেলতে একটা কাণ্ড হয়ে গেল যা-হোক! বিনোদ জিনিসপত্র ছত্রখান করে, এর ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে, ওকে ধাক্কা মেরে ভূমিসাৎ করে, একেবারে ওর তক্তপোশের তলায় গিয়ে লুকোল।

সমীর ধমকে উঠল, 'এই ফিরিঙ্গি, যা বাইরে যা, চুপ করে রোয়াকে বসে থাক্ গে!'

আর কথা নেই। সমস্ত রাগ ভুলে গিয়ে লেজ নাড়তে নাড়তে ফিরিঙ্গি রোয়াকে চলে গেল।

তখন সেখানে বাড়িশুদ্ধ সবাই ভিড় করে এসেছে। জ্যাঠাইমা বললেন, 'এ যে দেখি একটা নেকড়ে বাঘের চেয়ে বেশি! ওকে বিদেয় করে দে এক্ষুনি—ছেলেপিলের ঘরে শেষকালে একটা রক্তারক্তি কাণ্ড বাধাক আর-কি!'

সমীর বললে, 'ও খুব ঠাণ্ডা জ্যাঠাইমা, আমার ভারি ন্যাওটা। ওকে না চটালে ও কখনো কারুর কিছু অনিষ্ট করে না।'

'না, ওকে সব সময় কোলে করে রাখবে! নামখানাও শুনছি ফিরিঙ্গি।'

সমীর হেসে বললে, 'শিবঠাকুর রাখলেও ওর জাত যেত। আমাদের চা-বাগানের সাহেব ওটা দিয়েছে বলে বাবা আদর করে ওর নাম রেখেছিলেন ফিরিঙ্গি।'

জ্যাঠাইমা মুখ বেঁকিয়ে বললেন, 'কী আদরের ঘটা! আসামের

বাগানে এতদিন তো সবাই জানোয়ার হয়েই ছিলে, --এবার একটু মানুষ হও, বুঝলে ?'

বিনোদ গা থেকে ধুলো-মাটি ঝাড়তে ঝাড়তে হাজির হল। বললে, 'ওটাকে আমি না তাড়িয়েছি তো কী! আজই আমি জামাইবাবুর বন্দুকটা চেয়ে আনব—এক গুলিতেই সাবাড়। বাড়িতে অমন dangerous animal পোষা আইনে বাধে, তা তোমার জানা আছে বোকারাম ?'

সমীর হেসে বললে, 'ওর পেছনে মিছিমিছি লাগতে যেয়ো না।'

বিনোদ আস্তিন গুটোতে গুটোতে বললে, 'পৃষ্ঠে নয়, একেবারে হৃদয়ে গিয়ে লাগবে। দেখ না—'

তিন

সমীরের ঘর হল নিচে--একেবারে একটেরে—সকলের থেকে আলাদা। ফিরিঙ্গির জায়গা রাস্তায়—ছোট একটা হিজল গাছের ছায়ার নিচে শিকল-বাঁধা। অবশ্য যতক্ষণ সমীর ঘরে থাকে না, ততক্ষণ। অন্য সময়ে সে তারই ঘরময় খেলা করে দু-চারটে আরশুলা চিবিয়ে তারই বিছানার পায়ের তলায় চুপটি করে ঘুম যায়।

'কুকুরের জন্যে আলাদা খাবার দেবে না হাতি!' জ্যাঠাইমা মুখ-ঝামটা দিয়ে উঠলেন, 'এত বাবুগিরি এখানে চলবে না বলে রাখছি। ভাত-ডাল আজকাল খুব শস্তা, নয়? নিজেরাই পেট পুরে খেতে পাই না, তা ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের মত কোত্থেকে একটা কুকুর কুড়িয়ে এনেছেন!'

অগত্যা সমীর তারই অংশ থেকে ভাত আর মাছ আলাদা করে রেখে ফিরিঙ্গিকে হিজল গাছের তলায় লুকিয়ে খেতে দিয়ে আসে। পেট পুরে খেতে না পেয়ে ফিরিঙ্গি দিন-কে-দিন কাহিল হয়ে পড়ছে।

একদিন বিনোদই তার কারসাজি ধরে ফেললে। চেঁচিয়ে উঠল, 'দেখ মা, সমী তার মাখা ভাত-মাছ বাটি করে কুকুরকে খেতে দিচ্ছে!'

সমীর বললে, 'তাতে কী? আমার ভাগেরটা তো দিচ্ছি।'

জ্যাঠাইমা বললেন, 'এরকম ভাত নিয়ে ছিনিমিনি তুমি খেলতে পারবে না বাপু। এতে ঘরের লক্ষ্মী বিমুখ হন।'

'কিন্তু তাই বলে ফিরিঙ্গি সমস্ত দিন উপোস করে থাকবে নাকি?'

বিনোদ বললে, 'কেন, ভাগাড়ে পাঠিয়ে দিতে পার না?'

জ্যাঠাইমা বললেন, 'রাস্তার কুকুর তো ঘাস খেয়েই থাকে।'

'ওকে খেতে না দিলে আমিও খেতে পারব না, জ্যাঠাইমা। তোমাকে এসেই সেদিন পঞ্চাশ টাকা দিয়েছিলাম, তার থেকে একটা টাকা দাও, আমি ফিরিঙ্গির জন্যে কিছু মাংস কিনে আনি।'

জ্যাঠাইমা ক্ষেপে উঠলেন, 'যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! খুব তুই টাকা দেখেছিস, না? আসুক আজ তোর জ্যাঠা, মেরে আজ তোকে ঢিট না করে তো কী! তুই আমাকে টাকার খোঁটা দিস! দেওরের টাকা কোনদিন হাতে ধরলাম? তা মোটে পঞ্চাশটা টাকা—তার জন্যে একফোঁটা ছেলের এতবড় কথা!'

বিনোদ টিপ্পনি কাটলে, 'কাকে ঢিট করতে হবে তা আমার জানা আছে।'

কলেজে যাবার সময় সমীর ফিরিঙ্গিকে লম্বা শিকল দিয়ে গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বেঁধে রাখল। ঘরের মধ্যে বন্ধ করে রাখা বারণ, এমনি ছেড়ে দিতেও ভয় করে, প্রতিশোধ নিতে কাকে কখন কামড়ে বসে ঠিক নেই।

ফিরিঙ্গি জিভ মেলে তার দিকে ক্ষুধার্ত চোখে চেয়ে রইল। সমীর বললে, 'আজ আমাদের কারোই খাওয়া জুটল না, ফিরিঙ্গি। দেখি কলেজের কোন ছেলের কাছ থেকে কিছু ধার আনতে পারি কি না!'

কিছু রাঁধা মাংস আর রুটি নিয়ে সমীর সকাল-সকাল ফিরল। গলির কাছে এসেই তার চক্ষুস্থির! রোয়াকে দাঁড়িয়ে বিনোদ ও পাড়ার আর কয়েকটা ছেলে একজোট হয়ে ফিরিঙ্গির গায়ে মাথায় রাশি-রাশি ঢিল ছুঁড়ছে। অসহায়, শৃঙ্খলিত ফিরিঙ্গি প্রাণপণে চিৎকার করছে।

সমীর তাকে নিষ্ঠুরের মত বেঁধে রেখে না গেলে সবাইকে সে একবার দেখে নিত নিশ্চয়।

সমীরকে গলির মাথায় দেখতে পেয়ে সবাই চোঁচাঁ ছুট দিল বললে, 'এই রে, এসেছে রে, এবার ঠিক ডালকুত্তা লেলিয়ে দেবে!'

বিনোদ বললে, 'কাকে টিট করতে হবে তা আমার জানা আছে। দেখা যাবে কে কাকে লেলিয়ে দেয়!'

একটি কথা না বলে সমীর ফিরিঙ্গির শিকল খুলে ফেললে। অমনি ফিরিঙ্গি পলায়মান বিনোদের দিকে ধাওয়া করল। সমীর ধমকে উঠল- 'চুপ!'

ফিরিঙ্গি তক্ষুনি থেমে গেল, শুধু মিনতিময় চক্ষু তুলে বললে, 'এত অত্যাচারেরও তুমি কোন প্রতিশোধ নিতে বল না?'

সমীর তাকে ঘরে নিয়ে এল, তার পিঠে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। যে যে জায়গায় জখম হয়েছে ন্যাকড়া ভিজিয়ে সেখানে জলপটি দিতে দিতে বললে, 'তুই মন খারাপ করিস নে ফিরিঙ্গি। অবস্থা চিরকাল এমনি থাকবে না। গার্থ সাহেব শিগগিরই কলকাতা আসছেন, তুই তার কাছে গিয়ে থাকতে পারবি নে?'

ফিরিঙ্গি পা তুলে সমীরের হাতটা ঠেলে দিল, জলে ভর্তি ঘটিটা উপুড় করে ফেললে। মেঝেতে এক কোণে অভিমানে মুখ ভার করে বসে রইল।

সমীর তাকে আবার কোলে করলে। বললে, 'আমাকে ছেড়ে যেতে তোর কষ্ট হবে। কিন্তু এখানে তোকে ওরা যে কেউ খেতে দিচ্ছে না!'

সমীরের কাঁধের উপর দুই পা তুলে ফিরিঙ্গি তার মাথাটা এলিয়ে দিল। তাকে সে কিছুতেই ছাড়বে না, শত কষ্টে পড়লেও না: চিরকাল তাকেই সে আঁকড়ে থাকবে।

সমীর বললে, 'নে, আর এখন ছেলেমানষি করতে হবে না, খেয়ে ফেল্ চট্ করে। পেটটা কী রকম পড়ে গেছে! নে ধর!'

ফিরিঙ্গি কিছুতে তা মুখে তুলবে না। ছুই ঠ্যাং দিয়ে সমীরের মাথাটা মাংসের খুরির উপর বারে-বারে নুইয়ে দিতে লাগল।

সমীর হেসে বললে, 'আমিও খাচ্ছি, তোকে আর ভদ্রতা করতে হবে না।'

এমন সময়ে বাইরে বিনোদের গলা পেতেই ফিরিঙ্গি হঠাৎ মরিয়ার মত চিৎকার করে উঠল। সমীরের একবার হুকুম পেলেই—ব্যস! আর কিছু দেখতে হবে না! সমীরের মুখের দিকে চেয়ে সে অসহিষ্ণু দৃষ্টিতে তার অনুমতি ভিক্ষা করছে।

সমীর বললে, 'না। চুপ করে খা এগুলো আগে।'

দরজাটা খোলা, সামনে দিয়ে বিনোদ গেল বেরিয়ে—অথচ সমীরের কথায় ফিরিঙ্গি অবশ, মুহ্যমান হয়ে পড়ল। খানিকক্ষণ কাঁই-কুঁই করে নিষ্ফল অভিযোগ জানানো ছাড়া তার আর করবার কিছুই নেই।

চার

কদিন থেকে সমীরের ভারি জ্বর, নিচের ঘরে ফিরিঙ্গিকে নিয়ে পড়ে আছে—কেউ তাকে এখন দেখবার নেই। জ্যাঠাইমা বলেন, 'কে ঢুকবে ঐ নোংরা ঘরে! কোত্থেকে একটা কুকুর এনে রেখেছ—জাত-ধর্ম আর কিছু রইল নাকি? তা, কুকুর তো নয়, একটা ছিনে জোঁক, সব সময় গা লেপটে বসে আছে। ঢুকব কখন!'

সমীর বললে, 'কেন সব সময় তুই মেয়েদের মত ঘরের মধ্যে বন্দী হয়ে থাকবি? রাস্তায় বেড়িয়ে আয়, যা। তোর জন্যে কেউ ঘরে ঢুকতে পারে না। তোর জন্যে আমি মারা যাব নাকি!'

দ্বিরুক্তি না করে ফিরিঙ্গি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। সারাদিন এখানে ওখানে টহল দিয়ে ফেরে। সে ঘরে থাকলে সমীরের পরিচর্যার যে ব্যাঘাত হয় এটুকু যেন সে বুঝতে পেরেছে। তাই একেবারে সন্ধ্যা হয়ে গেলে সে অপরাধীর মত নিঃশব্দে বাড়ি ফেরে।

সমীর তাকে ধমকে ওঠে, 'তোর শরীরে একটুও দয়া-মায়া নেই। সমস্ত দিন জ্বরে পুড়ছি, বিন্‌দাদাকে বললাম—মাথায় একটু হাওয়া করে দেবে?' বিন্‌দাদা সটান বলে বসলেন—কেন, তোর ফিরিঙ্গি ভাই নেই? সে গেল কোথায়?...সারাদিন তোর আর দেখা নেই। তা, কুকুর চিরকাল কুকুরই, পরের দুঃখ বোঝবার তার ভারি দায় পড়েছে! তোকে কে আবার ফিরে আসতে বলেছে শুনি? যা না, যেখানে তোর খুশি। যেখানে তোর খাবার মেলে। আমার কুকুর আছে কিনা, তাই আর আমার কেউ থাকতে নেই! তা, তুই তো আমার কতই উপকার করছিস!'

ফিরিঙ্গি বুঝতে পারে জ্বরের তাড়নায় সমীর অভিমানভরে তাকে বকে চলেছে। কিন্তু তার দুঃখ দূর করবার কোন ক্ষমতাই তার নেই। সামান্য একটু পাখা পর্যন্ত সে করতে পারে না। নিতান্তই হীন, একেবারে অসহায়। খালি অনুভব করতে পারে, বোঝাতে পারে না। সমীরের পায়ের তলায় মাথা গুঁজে চুপ করে শুয়ে থাকা ছাড়া তার কী আর করবার আছে?

সমীর তাকে পাশে সরে আসতে বলল। বলল, 'গার্থ সাহেবের একটা চিঠি পেলাম আজ, কলকাতায় এসেছেন। উঠেছেন ক্যামাক স্ট্রীটে, আউটরাম হাউসে। আমার এই অসুখ জানিয়ে তাঁকে একটা খবর দিতে পারিস?'

ফিরিঙ্গি টেবিলের উপর লাফিয়ে উঠে একটা খাতা ও পেন্সিল দাঁতে করে নিয়ে এল।

সমীর বললে, 'কুকুর তো,—কত আর বুদ্ধি হবে! লিখে দিলেই তুই এটা গার্থকে সেই হোটেলে পৌঁছে দিতে পারবি নাকি? তুই রাস্তা চিনিস?'

ফিরিঙ্গি বোকার মত ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে রইল।

সমীর বললে, 'বোকারাম, কোনরকমে না-হয় লিখলাম, কিন্তু স্ট্যাম্প কোথায়! স্ট্যাম্প থাকলে না-হয় কোন রকমে চিঠিটা

ডাকবাক্সে ছেড়ে দিতে পারতিস। কিন্তু এত বড় শহরে তুই রাস্তা চিনবি কী করে?'

ফিরিঙ্গি ঠিক রাস্তা চিনবে। সমস্ত দুপুর সে মাঠ-ঘাট অলি-গলি ধরে গার্থকে সন্ধান করে বেড়ায়,—কিন্তু এই জনারণ্যে কোথায় সে হিতৈষী বন্ধু! শূন্য হাতে বাড়ি ফিরতে ফিরিঙ্গির দুই চোখ বেয়ে নিঃশব্দে জল ঝরতে থাকে।

এদিকে সমীরের অবস্থা দিন-কে-দিন খারাপ হতে যাচ্ছে। আজও পর্যন্ত এককোঁটা ওষুধ পেটে পড়ল না। রাত্রে সে একদিন 'মা —মা' বলে চিৎকার করে উঠল—রোগের যন্ত্রণা তার কাছে দুঃসহ হয়েছে।

ফিরিঙ্গি গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ল। সমীরের জন্যে সে কী করতে পারে? টেবিলের উপর দাঁড়িয়ে পা তুলে সে সুইচ টিপে আলো জ্বালালে। দেখলে, সমীরের মুখের দিকে আর তাকানো যায় না। দস্তুরমত তার শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। সে অস্থির হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে গেল। দরজাটা বন্ধ। প্রবল কণ্ঠে সে ডাকাডাকি শুরু করল।

বিনোদ তার হকিস্টিক বাগিয়ে ধরে বেরিয়ে এল। বললে, 'বেটা আবার এখানে গোলমাল করতে এসেছে! ওর ঘাড় যদি আমি আজ না ভাঙি তো কী বলেছি!'

ফিরিঙ্গি তাকে দেখে সমীরের ঘরের দিকে ছুটল। সে তাকে অনুসরণ করছে না দেখে আবার ফিরে এল। এবার বিনোদ একটা ঢিল কুড়িয়ে তাকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারল। লাগল এসে মাথার উপর। তার তাতেও এখন ভ্রূক্ষেপ নেই। তাকে মারতে মারতে বিনোদ একবারে সমীরের ঘরের দরজার কাছে এলে হয়! সমীরের জন্যে মার খেতে সে রাজি আছে।

বিনোদ এবার লাঠির বাড়ি মারল। তাতেও ফিরিঙ্গির আপত্তি নেই। আজকে সে হঠাৎ এমন গা পেতে অপ্রতিবাদে মার খাচ্ছে দেখে

বিনোদেরও হাত খুলে গেছে। এমনি মার খেতে খেতে ফিরিঙ্গি বিনোদকে সমীরের ঘরের কাছে নিয়ে এল।

সমীরকে শুনিয়ে শুনিয়ে বিনোদ বলছে, 'মার পাজিটাকে! উপরে চেঁচামেচি করে আমাদের ঘুম ভাঙাতে গেছে! লাশ করে ফেলব একেবারে!'

বিনোদের গলা পেয়ে সমীর ভাঙা গলায় বললে, 'কে, বিন্‌দাদা? জ্যাঠামশাইকে বলে একেবার একজন ডাক্তার নিয়ে এস শিগগির— আমার না-জানি কেমন করছে!'

বিনোদ বললে, 'এই রাত করে আমি ডাক্তার ডাকতে যাই না আর কিছু! হাতে আমার এখন অনেক কাজ।' বলে হকিস্টিক দিয়ে ফিরিঙ্গির মাথায় সে আরেকটা বাড়ি মারলে।

ফিরিঙ্গির আর সহ্য হল না। দিগ্বিদিক ভুলে সে এক হুলুস্থুল কাণ্ড বাধিয়ে তুলল। কেন সে ডাক্তার ডাকতে যাবে না! চেঁচামেচি, হৈ-চৈ, লোকজন—তুমুল কাণ্ড!

ডাক্তার ডাকবার দরকার পড়ল এবার। এবং বিনোদকে ব্যাণ্ডেজ যখন করতেই হবে, তখন সমীরকে দেখে যেতেও বা ক্ষতি কী? কেন-না ফিরিঙ্গিকে জুতো তুলে মারতে গিয়ে সমীর হঠাৎ ভিরমি খেয়ে ঘুরে পড়েছে।

সমীর তাকে বলেছিল, 'এ তুই কী করলি! তোর এত বড় আস্পর্ধা —তুই যা আমার সমুখ থেকে বেরিয়ে, আমাকে না মেরে তুই ছাড়বি নে? যা, তোর মুখ আমি আর দেখতে চাই না, হতভাগা!' এই বলে জুতো কুড়িয়ে যেই ওর দিকে ছুঁড়ে মারল, দুর্বল দেহে সে-উত্তেজনা সইল না—টলে পড়ল।

সমীর তাকে স্বহস্তে জুতো ছুঁড়ে মেরেছে এই দুঃখ ফিরিঙ্গি সইতে পারল না। তাকে সে মেরেই ফেলতে চায় বৈকি! ফিরিঙ্গির দু-চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়তে লাগল। মাথাটা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে ম্লান মুখে অন্ধকারে বেরিয়ে গেল—যেদিকে দু-চোখ যায়।

পাঁচ

কিন্তু পরদিনই ঠিক সে আবার হাজির হয়েছে।

ঘর বন্ধ। রোয়াকের উপর দু-পায়ে দাঁড়িয়ে সে জানলা দিয়ে সমীরের ঘরের মধ্যে উঁকি মারল। টেবিলের উপর ওষুধে ভরা অনেক শিশি বোতল—তার এতদিনে চিকিৎসা হচ্ছে তাহলে। ফিরিঙ্গির বুকে তৃপ্তির নিশ্বাস পড়ল।

সমীর শুয়ে ছিল, জানলায় কার নিশ্বাসের গন্ধ পেয়ে চেয়ে দেখলে, ফিরিঙ্গি।

অমনি সে জ্বলে উঠল, 'তুই আবার এসেছিস? তোকে না কাল বের করে দিলাম! বেরো তুই আমার সমুখ থেকে! বিনুদাদার কী করেছিস তুই! এত করে বারণ করলেও তুই কথা শুনিস না? একদিন হয়ত আমাকেও তুই ঝোঁকের মাথায় টুকরো-টুকরো করে ফেলবি! আর সোহাগ করতে হবে না, এক্ষুনি বেরো বলছি! তুই আমার কে? কেউ না—পথের একটা কুকুর। যা!'—বলে হাত তুলে জানলার কবাটদুটো সে বন্ধ করে দিল।

তারপর থেকে ফিরিঙ্গি বিমনা হয়ে পথে-পথে ঘুরে বেড়ায়।

একদিন একটা মোটরে কাকে সে আচম্বিতে দেখতে পেয়ে চিৎকার করতে করতে তার পিছু ছুটল। চিৎকার ও দৌড়ের ঝাঁপগুলি লক্ষ্য করে মোটরটা হঠাৎ থেমে পড়ল। ফিরিঙ্গি একেবারে মোটরের পাদানিতে উঠেই গার্থের কোলের উপর লাফিয়ে উঠল। গার্থ জিগগেস করলে, 'সমীর কোথায়?'

ফিরিঙ্গি অমনি চিৎপাত হয়ে শুয়ে মুখ-চোখের একটা অসহায় ভঙ্গি করে গার্থকে বোঝাতে চাইল, সমীরের বেজায় অসুখ করেছে। তারপর গলা ছেড়ে চিৎকার করে জানালো, এখুনি সেখানে যাওয়া দরকার।

ফিরিঙ্গির চিৎকারে, পিড়াপিড়িতে, জুতো চেটে মিনতি জানাবার আধিক্যে গার্থকে সমীরের বাড়ির দিকে মোটর ঘোরাতে হল।

শেষ পর্যন্ত গার্থকে সে সমীরের কাছে নিয়ে আসতে পেরেছে দেখে ফিরিঙ্গির ফুর্তি দেখে কে! গার্থকে সে সমীরের জানলার কাছে নিয়ে এল। সমীর চেয়ে দেখল, রোয়াকের উপর দাঁড়িয়ে আছে গার্থ।

সমীর তখন অনেকটা ভাল হয়েছে। সে ভীষণ খুশি হয়ে দরজা খুলে গার্থকে ভিতরে নিয়ে এল। বললে, 'অসুখের জন্যে এতদিন আপনাকে চিঠি দিতে পারি নি। হঠাৎ আপনিই এখানে এসে পড়লেন যে!'

সমীরের ঘরে সাহেবকে ঢুকতে দেখে সবাইয়ের বিস্ময়ের আর সীমা নেই। জ্যাঠাইমা তো মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন, 'কী ম্লেচ্ছপনা বাবা! কুকুরটা গেল, এখন কিনা জুটল এসে সাহেব। ওটাকে তাড়িয়ে দেবার বন্দোবস্ত কর্, বিন্দা। কর্তাকে আপিস থেকে ডেকে নিয়ে আয়।'

সাহেবের মুখে অনর্গল বাংলা কথা শুনে সবাই থ খেয়ে গেল। গার্থ চেয়ারে বসে বললে, 'ফিরিঙ্গি আমাকে টেনে আনল এখানে। তোমার কিছু যে একটা খুব বিপদ হয়েছে, তা ওর ভাবভঙ্গি থেকেই বুঝতে পেরেছিলাম। এ তোমার কী চেহারা, সমী! এ কী নোংরা ঘরে পড়ে আছ! তোমার এই কষ্টের কথা আমাকে জানাও নি কেন?'

সমীর বলে উঠল, 'ফিরিঙ্গি! ফিরিঙ্গি কোথায়?'

গার্থ বললে, 'বা, এইমাত্র তো আমার মোটরে এল।'

কাঁপতে কাঁপতে সমীর রোয়াকে বেরিয়ে এল। আগের মত শিস দিয়ে উঠল। ডাকল—'ফিরিঙ্গি! ফিরিঙ্গি!'

ছয়

তারপর চার-পাঁচ বছর গেছে। গার্থ সমীরকে তাদের কলকাতার আপিসে ভাল একটা কাজ দিয়েছে—একশো টাকা মাইনে। সে আজকাল জ্যাঠাইমার বাড়ি ছেড়ে দিয়ে বালিগঞ্জের দিকে ছোট একটা বাংলো ভাড়া করে থাকে।

ফিরিঙ্গিকে এখন আর চেনা যায় না—সত্যিই সে এখন যাকে বলে পথের কুকুর। গায়ের লোম সব উঠে যাচ্ছে, শুকিয়ে একেবারে হাড্ডিসার, একবার মোটর চাপা পড়ার দরুন পেছনের একটা ঠ্যাং ভেঙে গেছে, মাটির উপর তাতে ভর দিয়ে দাঁড়ানো চলে না ; তবু মাঝে মাঝে সে ও-বাড়ির রাস্তাটা ঘুরে আসে, সমীরকে দেখতে পায় না।

একদিন ঘুরতে ঘুরতে দিক্‌ভুল হয়ে ফিরিঙ্গি বালিগঞ্জ অ্যাভেনিউতে চলে এল। তাকে দেখতে পেয়ে এক বাড়ির বারান্দা থেকে চেন-বাঁধা একটা গ্রে-হাউণ্ড কুকুর হঠাৎ তীব্রস্বরে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে! বার্নার্ড-শ-র হঠাৎ কী হল দেখবার জন্যে বাড়ির মালিক বেরিয়ে এসে শ-র পিঠে হাত বুলিয়ে তাকে মিষ্টি-মিষ্টি দুটো বিলিতি ধমক দিলে। বাড়ির মালিককে হঠাৎ দেখতে পেয়ে ফিরিঙ্গি আনন্দে লাফিয়ে উঠল। এ যে সমীর! তার কিনা চমৎকার অবস্থা ফিরেছে! ফিরিঙ্গির মনে আর এতটুকু অভিমান নেই। সোজা গেট পেরিয়ে ঢুকে পড়ল ভেতরে।

সারা গায়ে নোংরা ঘা, বুড়ো একটা কুকুর, তিন ঠ্যাঙে কোনরকমে খোঁড়াচ্ছে, চোখদুটো ঘোলাটে, ঝাপসা—সমীর ফিরিঙ্গিকে চিনতে পারল না। ডাকল—বিন্‌দা-দা, দেখ-দিকি কী উৎপাত এসে জুটল। শ-কে বেঁধে রাখা দায় হয়ে উঠছে!'

বিনোদ বেরিয়ে এল। বললে, 'কী?'

'দেখ দিকি ঐ কুত্তাটার কী সাহস! ক্রমশই এগোচ্ছে যে! শ-কে এতটুকু মান্য করছে না। দেব নাকি ছেড়ে?'

'দরকার কী হাঙ্গামায়? শ-ও এক-আধটু জখম হতে পারে, বলা যায় না। এই ঢিলটাই যথেষ্ট।' বলে বিনোদ একটা ঢিল ছুঁড়ল।

ফিরিঙ্গির তবু ফেরবার নাম নেই। ঢিল গায়ে এসে লাগতেও সে একটু শব্দ করল না।

সমীর বললে, 'দাঁড়াও শ-কেই লেলিয়ে দি।'

শ-র চেনটা আলগা করে দিতেই সে ফিরিঙ্গিকে তাড়া করল। ফিরিঙ্গি আর দাঁড়াল না। মাটি শুঁকতে শুঁকতে আস্তে আস্তে গেটের বাইরে চলে এসে কোথায় যে মিলিয়ে গেল সে খোঁজে সমীরের আর দরকার নেই। তার এই বিলাসী ও সুখী জীবনে ফিরিঙ্গির আর দাম কী!

সবাই যাচ্ছে। হরিপদ কাবাসি, সাধু দালাল, জটিরাম কাহার, ফক্কর বক্স, মাতব্বর গাজি পর্যন্ত। মেয়েরাও আছে। নীরদা, কৃপাময়ী, সুভঙ্গবালা। ও-পাড়ার সাহেবের মা, ইংরেজের মা।

দিন থাকতেই বেরিয়ে পড়তে হবে। পৌঁছুতে পৌঁছুতে প্রায় মাঝরাত। দলের সঙ্গে দুটি মাত্র হেরিকেন। সাপ্লাই-ঘর থেকে স্লিপ বের করে এনে কিছু তেল জোগাড় করেছে ভাগ্যধর।

'তেল তো এবার নিয়েছিস রেশন-কার্ডে।' বললে পাটোয়ারবাবু।

'সে তো ঘরে জ্বালাবার জন্যে। এ আলোটা আমরা পথে জ্বালাব। যাব সবাই হোসেনপুর ইস্টিশানে। দল বেঁধে। আপনি যাবেন না?'

পাটোয়ারবাবু তবু গড়িমসি করছে।

'এ দেবে তোমার রিজার্ভ স্টক থেকে। দু-বোতলের একটা স্লিপ কেটে দেবে।' বললে লক্ষ্মণ বাগ। 'খয়রাতি নয়, দাম দেব। এতগুলি লোক যাচ্ছি আমরা তীর্থ করতে।'

তবু যেন পাটোয়ারবাবু ইতি-উতি করে। বাড়তি তেলের অনুমতিটা ঠিক হবে কি না তাই বোধহয় যাচাই করে মনে-মনে।

'তুমি কেমনধারা লোক গা?' ঝামটা মেরে উঠল বুড়ি রতন দাসী। 'এমন দিনে বাড়তি দু-বোতল তেল ছাড়তে পারো না তুমি? আমরা সবাই ঘর-বাড়ি ছেড়ে-ছুড়ে চলে যাচ্ছি, আর তুমি তোমার দোকান আঁকড়ে বসে আছ?'

'অত ফুটুনি কিসের?' বললে বাবুচরণ। 'কনট্রোল উঠে যাবে এবার।'

দুই নয়, অনেক কষ্টে এক বোতল বাড়তি তেলের স্লিপ কাটল পাটোয়ার। সেই তেল দুই হেরিকেনে ভর্তি করে চলল তীর্থযাত্রীরা। কতক্ষণ পরেই উঠে আসবে কৃষ্ণপক্ষের চতুর্থীর চাঁদ।

'আমিও যাব। আমাকেও তোদের সঙ্গে নিয়ে চল্।' বললে ঠাকুরদাস। . বয়স সত্তরের কাছে, জীর্ণশীর্ণ অথচ সিধে শিরালো চেহারা, খালি গা, খালি পা, হাতে লাঠি, কোমরে জড়ানো ছেঁড়া ন্যাকড়ার টুকরো। কিছু নেই, জীবনে কোনদিন কিছু পায় নি, তবু নবীন আশার বাতাস লেগেছে তার কুঁচকোনো চামড়ায়। যেমন বসন্তের বাতাস লাগে নিষ্পত্র বৃক্ষশাখে। হাতে আর বেশি দিন নেই, তবু সেও যেন চায় একটি নতুন দিন।

'এত দূরের রাস্তা, তুমি যাবে কী করে?' বললে বাবুচরণ। 'তোমার নাতি কোথায়?'

'মনু? সে আজ কুড়ি-পঁচিশ দিন ধরে বিছানায় শোয়া। তার অসুখ।'

'তার অসুখ খুব বেশি।' বললে লালু, লালচাঁদ। বছর-দশেকের একটি রোগা-পটকা ছেলে। মনুর সমানবয়সী। সে এসে বুড়োর হাতের লাঠি চেপে ধরল। বললে, 'মনু না যাক, আমি আছি। আমি তোমাকে ঠিক নিয়ে যাব দাদু।'

বুড়ো ঠাকুরদাস হাসল। কাউকে তাকে নিয়ে যেতে হবে না। জনহীন রাস্তায় একা হলেও সে ঠিক পথ চিনে নিতে পারবে আজ। সে আর বুড়ো নয়, নতুন করে সব আবার আরম্ভ হবে বলে সেও যেন ফিরে চলেছে শৈশবে।

কিন্তু দলের পাণ্ডা ভাগ্যধর আপত্তি করে। বলে, 'তুমি যাচ্ছ খামোকা। একদম মিছিমিছি।'

'বাঃ, মনুর জন্যে ধুলো নিয়ে আসব।'

'ধুলো?'

'হ্যাঁ, সেই ধুলো বুকে-কপালে মেখে দিলেই মনু ভাল হয়ে উঠবে।'

সেই কথা মনুর মা সুফলাও বলে দিয়েছে বার-বার করে।

বলেছে, 'বাবা, আর কিছু না হোক, পথের থেকে কিছু ধুলো নিয়ে এস। গায়ে-মাথায় মাখিয়ে দিলেই মনু আমার ভাল হয়ে উঠবে।

আর ট্রেন যদি না থামে বাবা, তবে লাইনের ছোট একটা পাথরের কুচি কুড়িয়ে নিয়ে এস। মাতুলি করে গলায় পরিয়ে দেব মনুর।'

আগে কথা ছিল সুফলাই যাবে, ঠাকুরদাস থাকবে মনুর পাশটিতে। কিন্তু সুফলা যায় কী করে? বাইরে বেরুবার মত তার একটা আস্ত শাড়ি নেই। যা শীত, নেই একটা গায়ে দেবার মোটা কাপড়।

এমনি অনেক মেয়েই যেতে পারেনি ঘরে-ঘরে। কিন্তু পুরুষদের কথা আলাদা। তারা শীত-গ্রীষ্ম মানে না, হুড়-দঙ্গলে তাদের ভয় নেই।

'কিন্তু তোমার যে শীত করবে, বাবা।' বললে সুফলা।

'রেখে দে।' ঠাকুরদাস এক হাসিতে সমস্ত শীত-বর্ষা উড়িয়ে দিলে। বললে, 'মাঝরাতেই আজ সূর্যি উঠবে শুনেছি। শীত-টিত কিছু থাকবে না।'

বাবাকে বাধা দিতে যাওয়া বৃথা। বুড়োমানুষ, কতদিনই বা বাঁচবে। তবু মনু যখন ঘুম থেকে জেগে উঠে জিগগ্যেস করবে, কেমন দেখে এলে মা, তখন কী বলবে সুফলা? তাই সে বারে-বারে বলে দিলে, ধুলো নিয়ে এসো। না পেলে পাথরের কুচি।

ঠাকুরদাস যখন যায়, জ্বরের ঘোরের মনু তখন বেহুঁস হয়ে আছে। সাঁঝরাতে তার ঘুম ভাঙল। বললে, 'মা, তুমি গেলে না?'

'না বাবা, তোমার দাতু গেছে।' সুফলা ছেলের পাশে ঘন হয়ে বসল। ক্লান্তিভরে চোখ বুজল মনু। বললে, 'একজন গেলেই হল!'

জ্বরটা আজ বেড়েছে। তাই মনু সব ঠিকমত বুঝতে পারছে না। তার মা না গিয়ে দাতু গেছে, এতে তার কোন নালিশ নেই।

অনেক পরে আবার চোখ মেলল মনু। বললে, 'ট্রেন যখন আসবে মা, বাঁশি শুনতে পাব?'

'রোজই তো শোনা যায়।'

'আজও শোনা যাবে, না? আজ নিশ্চয় আরো বেশি জোরে বাজাবে। আমি কি শুনতে পাব? যদি আমি ঘুমিয়ে থাকি তখন?'

'তোমাকে জাগিয়ে দেব, মনু !'

'তাই দিয়ো, মা! আজ নিশ্চয় অনেকক্ষণ ধরে বাঁশি দেবে। আমাকে জাগিয়ে দিয়ো মা! আমি তো কিছুই দেখতে পেলাম না। আমি শুধু বাঁশ শুনব।'

ফকিরালির জন্যেই বারে-বারে সবাইকে পিছিয়ে পড়তে হয়। ধমকে ওঠে ভাগ্যধর: 'তুই এসেছিস কেন? নেচে-নেচে হাঁটিস, তোর জন্যে শেষকালে কি আমাদের ট্রেন-ফেল হয়ে যাবে?'

'ল্যাংড়া মানুষ, তাই অমন চলি একটু নেচে-নেচে। তা তোমরা এগোও না, আমি যতক্ষণে পারি পৌঁছুব গিয়ে।' বিরস মুখে বলে ফকিরালি। 'এখন না-হয় ঠাট্টা করছ, কিন্তু ফেরবার সময় দেখবে, খোঁড়া পা সিধে হয়ে গেছে, পক্ষীরাজ ঘোড়ার মত ছুটে চলেছি টগ্‌বগিয়ে। আল্লা করেন, একবার যেন দেখা পাই!'

রাত নেমে পড়েছে। ভাগ্যধর আর আমিনদ্দির হাতে জ্বলছে দুটি হেরিকেন। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের কাঁচা মাটির রাস্তা ধরে চলেছে তীর্থযাত্রীরা।

এ-গ্রাম ও-গ্রাম আশে-পাশের সমস্ত গাঁ-গেরাম ভেঙে পড়েছে। সকলের পথ আজ মিশেছে এসে হোসেনপুরের ইস্টিশানের প্ল্যাটফর্মে।

প্ল্যাটফর্মে ধরছে না সবাইকে। লাইনের দু-পাশে ছাপিয়ে পড়েছে। সব ফাঁকা ফরসা জায়গা ভরে গিয়ে এখন লোক ঝোপঝাড়, বনজঙ্গলের মধ্যে ঢুকছে। এক ইঞ্চি মাটি কেউ ছাড়ছে না।

একেক দল একেকটা চক্র তৈরি করে বসেছে। ছুট্‌কো লোকেরা লাইন বেঁধে: লাইন ভেঙে কে কখন আবার ছিটকে পড়ছে তার ঠিক নেই। কাঠ-পাতা কুড়িয়ে আগুন করেছে কেউ-কেউ। কেউ বসে বসে ঢুলছে ঘুমের ঘোরে। মশা কামড়াচ্ছে।

কতক্ষণে ট্রেন আসে তার ঠিক কি! ভলান্টিয়াররা ঘোরাফেরা করছে, ভিড় সামলাচ্ছে, লাইন বজায় রাখছে। ট্রেনের চাকার তলায় কেউ ছিটকে গিয়ে না পড়ে, তার খবরদারি করছে। চেঁচামেচি, হৈ-হুজ্জতের শেষ নেই কোথাও।

'কত দেরি আর গাড়ি আসবার ?'

অনেক দেরি। প্রত্যেক ইস্টিশানে এমনি ভিড় হচ্ছে। গাড়ি ছাড়তে পারছে না সময়-মত। শিকল টেনে থামিয়ে দিচ্ছে বারে-বারে।

সবাইয়ের ফিরতে ভীষণ দেরি হয়ে যাবে কাল। কাল হাট-বার। কত লোকের কত কাজ। কেউ যাবে বেপার করতে, কেউ যাবে সওদা করতে। এক হাট মারা গেলে কত ক্ষতি। কেউ ধান কাটতে-কাটতে চলে এসেছে মাঠ ছেড়ে। কারু খামারে ফসল তোলা বাকি। কারু গরু-বলদ কামাই যাবে ভরদিন।

তা যাক। কেউ আর তার জন্যে গ্রাহ্যি করে না। দেখতে-দেখতেই দিন-রাতের বদলে যাবে চেহারা। আর দুর্ভিক্ষ হবে না। দুর্ভাগ্য থাকবে না আর কারুর। তাঁতিরা সুতো পাবে, জেলেরা নৌকো। কাপড় আসবে গাঁটরি বেঁধে, ধানের মরাই খালি হবে না কোনদিন। বকেয়া খাজনা মাপ হয়ে যাবে। জমি-জায়গা থেকে আর কেউ উচ্ছেদ হবে না।

কর্তালোকেরা চেঁচিয়ে বলছে সবাইকে ফিরে যেতে। 'কেন, কী হল ?' বলছে, 'ট্রেন এখানে থামবে না। খবর এসেছে। সোজা চলে যাবে জংশন-স্টেশনে। এই শীতের মধ্যে বসে থেকে করবে কী! তার চেয়ে বাড়ি ফিরে যাও।'

বাঃ, তা কি হয়! কত দূর দূর থেকে এসেছে তারা, কত কষ্ট করে। কত খাল-বিল পেরিয়ে। এখন না-দেখে এমনি-এমনি ফিরতে পারবে না তারা। না, কিছুতেই না।

'শোনো! তোমরা তো আর অবুঝ নও! প্রত্যেক ইস্টিশানে এমনি ভিড় হওয়ার জন্যে গাড়ি প্রত্যক ইস্টিশানেই থামছে। তার জন্যে ওঁর ঘুম হচ্ছে না, স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে পড়েছে। তোমরা কি চাও তোমাদের জন্যে ওঁর সাঙ্ঘাতিক কোন অসুখ হোক ?'

সত্যিই তো, তা কি তারা চাইতে পারে ?

'তবে আস্তে-আস্তে বাড়ি ফিরে যাও সবাই।'

তাতে তারা রাজি নয় কিছুতেই। গাড়ি না থামে তো না থামবে। ছুটে চলে যাক তাদের চোখের সম্মুখ দিয়ে। যে ট্রেনে উনি যাচ্ছেন সেই ট্রেনটা তো অন্তত তারা দেখবে। শুনবে তো তার চাকার শব্দ। ইঞ্জিনের বাঁশি। ট্রেন থেকে মাটিতে নুয়ে-নুয়ে প্রণাম করতে পারবে তো তারা!

'ছাই!' হতাশার ভঙ্গি করে বললে লক্ষ্মণ বাগ, 'দেখতে না পেলে বসে থেকে লাভ কী? ট্রেন দেখে কী হবে? ও কি আমরা দেখি নি? গাবতলার হাটে যেতে হপ্তায় দু-দিন আমরা ট্রেন দেখি। রাস্তার দু-মুখে আটকে রাখে আমাদের দরজা ফেলে।'

'নাই যদি দেখতে পাব, কিসের জন্যে তবে সোরগোল?' বললে বাবুচরণ।

'মনে মনে দেখবি, মনে মনে দেখবি।' বললে ঠাকুরদাস লাল-চাঁদের কাঁধে হাত রেখে, 'চোখের দেখাটাই কি সব?'

যা দেখবার, তা কি শোনা যায় না? আর যা শোনবার, তা কি দেখা যায় না চোখ মেলে? অন্ধকারে চেয়ে থাকতে থাকতে ভাবে ঠাকুরদাস। এমন কি কোনো অনুভূতি নেই যেখানে দেখা ও শোনা, ছোঁয়া ও শোঁকা সব এক হয়ে গিয়েছে? যদি না-ও থামে ট্রেন, তবে তার চাকার শব্দ ও ইঞ্জিনের বাঁশি শুনেই কি তাঁকে দেখা হয়ে যাবে না?

সিটি দিয়ে ঐ ট্রেন আসছে। হেড-লাইট জ্বালিয়ে। তার চাকার শব্দকে ডুবিয়ে দিচ্ছে আজ জনতার কোলাহল। জয়ধ্বনিতে আকাশ বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে!

কারু চোখে আজ ঘুম নেই। আকাশের নক্ষত্রগুলো পর্যন্ত চোখ মেলে দেখছে এই গ্রামান্তের কম্পিত হৃদয়গুলোকে। মহাত্মাজীও ঘুমুতে পারলেন না।

'দেখছিস? দেখতে পাচ্ছিস? ঐ যে, ঐ যে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়েছেন! দেখতে পাচ্ছিস না? ঐ যে! এবার দরজা খুলে

দাঁড়িয়েছেন স্পষ্ট হয়ে। শুনতে পাচ্ছিস না তাঁর কথা? বেজায় গোলমাল। শুনে কী হবে? ছাখ, ছাখ চোখ ভরে!'

ঠাকুরদাস তন্ময়ের মত বললে, 'কেন, আমি তো ওঁর কথা শুনতে পাচ্ছি স্পষ্ট।'

কতক্ষণ পরে ট্রেন চলে গেল সিটি দিয়ে। জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে যার-যার গ্রামের পথ ধরল।

লালচাঁদ বললে, 'এই নাও দাতু, পাথরের কুচি আর এই ধুলো। লাইনের ঠিক মাঝখান থেকে তুলে এনেছি!'

'এনেছিস? তোর মনে আছে তাহলে?' ঠাকুরদাস উৎফুল্ল হয়ে উঠল। 'মন্নু এবার নিঘ্ঘাৎ ভাল হয়ে উঠবে। কী বলিস লালু, উঠবে না?'

'সবাই ভাল হয়ে উঠবে।'

গ্রামে ফিরতে প্রায় ভোর। সূর্য উঠি-উঠি করছে। কুয়াসা করেছে চারদিকে।

লালচাঁদ চলে গেল তার বাড়ি, ছুতোর-পাড়ায়। ঠাকুরদাস ডাকলে, 'সুফলা!'

সুফলা দরজা খুলে দিল। শীত নেই, খিদে নেই, ঘুম নেই, ঠাকুরদাস যেন আরেক রকম লোক হয়ে গিয়েছে।

'মন্নু কেমন আছে?'

'রাত্রেই জ্বরটা ছেড়ে গেছে মনে হচ্ছে। যেই ইঞ্জিনে সিটি দিল, অমনি জাগাতে গিয়ে দেখলাম, গায়ে তার জ্বর নেই।'

'ঘুমুচ্ছে মন্নু?'

'ঘুমুচ্ছে।'

আবছায়ায় হাতড়ে-হাতড়ে ঠাকুরদাস ঘরে ঢুকল। পথের জানলাটা খুলে দিলে। বসল মন্নুর পাশটিতে। পাথরের কুচিটা তার মাথায় ঠেকিয়ে রেখে দিলে বালিশের তলায়। একটিপ ধুলো নিয়ে ছুঁইয়ে দিলে কপালে।

মনু চোখ চাইল। প্রফুল্ল কণ্ঠে বললে, 'দাদু! তুমি? তুমি এসেছ? কখন্ এলে?'

'এই তো।'

'দেখে এলে? দেখে এলে তাঁকে?'

'দেখে এলাম বইকি।'

'তুমিও দেখতে পেলে? ভারি আশ্চর্য তো!'

'হ্যাঁ দাদু, ভারি আশ্চর্য। যে অন্ধ, যার চোখ নেই, সেও তাঁকে দেখতে পায়।' ঠাকুরদাসের দুই চক্ষুহীন কোটর থেকে অশ্রু ঝরতে লাগল।

'কেমন তাঁকে দেখতে বল না!' মনু অন্ধ হবার চেষ্টায় চোখ বুজোল।

'ঠিক সূর্যের মতো। যেই এসে দাঁড়ান, অমনি চারদিক আলো হয়ে ওঠে। ভয়ের, দুঃখের, বিবাদ-কলহের লেশমাত্র থাকে না। বড় সুন্দর, বড় শান্ত রে দাদু!'

'তুমি দেখলে? সত্যি দেখলে?' মনু দৃঢ় করে চোখ বুজে রইল।

'কিছুই আমি দেখি না চারদিকে, তোর মুখখানা পর্যন্ত নয়। তবু তাঁকে আমি স্বচক্ষে দেখে এলাম। কুয়াসা সরিয়ে হঠাৎ-রোদের ঝলক দিয়ে উঠছেন যে এখন সূর্যদেব, ঠিক তাঁর মত। তুই চোখ বুজে আছিস কেন, দাদু? চেয়ে ছাখ। নতুন সূর্য উঠেছে।'

মনু চোখ চাইল। দেখল কাঁচা সোনার রোদ্দুরে ঘর-দোর ভরে গেছে। পাখি ডাকছে কত রকম কাকলিতে। মুক্ত, স্নিগ্ধ বাতাস বইছে ঝিরঝির করে। তার শরীরে আর জ্বর নেই।

কচুরিপানা

'তুই যাবি না বাঘাটে বিলে ?'

'যাব বৈকি।' উৎফুল্ল হয়ে বললাম। 'তুই ?'

'নিশ্চয় ! এ জঞ্জাল দূর করে দেব সবাই।' সুখেন তার ডান হাতের মাস্‌ল্‌ ফুলিয়ে বললে।

কিন্তু বাবা রাজি হন না। বলেন, 'ওখানে হচ্ছে সাপের আড্ডা। নামবি কি, ছোবল মারবে।'

'কী যে তুমি বল !' তাচ্ছিল্যসূচক হাসি হাসলাম। বললাম, 'সেদিন খেলার মাঠে থেকে এমন এক লম্বা কিক মেরেছিলাম যে, বল গিয়ে পড়ল বিলের মধ্যে। সবাই বললে, 'যে ফেলেছে ঐ বল তাকে গিয়ে নিয়ে আসতে হবে। বিলের জল তখন বড়-জোর একবুক। দু-হাতে কচুরিপানা সরিয়ে দিব্যি ঐ বল তুলে আনলাম। কই সাপ কোথায়, একটা জোঁকও দেখতে পেলাম না।'

বাবা হাসলেন। বললেন, 'কী বুদ্ধি তোর, সেদিন কামড়ায় নি বলে আজও কামড়াবে না ?'

'তুমি কী যে বল ! কত লোক আমাদের, তা জানো ?'

'কত ?'

'সদর থেকে খোদ বড়-সাহেব আসছে। সঙ্গে তাঁর ঢের লোক ! স্কাউটরা আসছে। ফোটোগ্রাফার আসছে। ব্যাণ্ডপার্টি আসছে। তা ছাড়া, এখানে আমরা ইস্কুলের ছাত্ররা আছি। মাস্টাররা আছেন। এখানকার সব অফিসাররা আছেন, পুলিশ-দারোগা আছে—'

'তবে আর কী ! সাপখোপ সব পালিয়ে যাবে তোমাদের দেখে ! আর যদি যায়ও, এমন জায়গায় যাবে, যেখানে দেবে তোমরা হাত।'

'অত ভয় করলে কি চলে? স্বয়ং সাহেব পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে জলে নামবেন।'

বাবা অবাক হলেন। বললেন, 'বল কী?'

'বা, তাঁর জন্যেই তো এত সব কাণ্ড হচ্ছে। তিনি সবার আগে জলে নামবেন। নেমে স্টার্ট দেবেন। আর স্টার্ট পেয়েই আমরা দলে-দলে নেমে যাব চারদিক থেকে। সব এলাকা ভাগ করা আছে—ইস্কুল, থানা, সিভিল, ক্রিমিন্যাল, মুন্সিপাল্‌টি, পাবলিক—একসঙ্গে তিনশো লোক লেগে যাবে বাবা! দেখো, দেখতে দেখতে সবুজ বিল সাদা হয়ে যাবে।'

বাবা পোস্ট আপিসে কাজ করেন বলে হয়ত খানিকটা নিশ্চিন্ত হলেন। বিজ্ঞের মত সূক্ষ্ম রেখায় হেসে বললেন, 'সাহেবেরও মাথা খারাপ হল নাকি?'

উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলাম। বললাম, 'তুমি একে মাথা খারাপ বলছ? তোমার মতে এটা খুব ভাল কাজ নয়, বাবা?'

বাবা চুপ করে রইলেন।

'কী একটা সুন্দর ফুল দেখে শখ করে কে নিয়ে এসেছিল এ দেশে, ছেড়ে দিয়েছিল তার পুকুরে। ভেবেছিল, পদ্মের মতই বুঝি এ শোভা বিস্তার করবে। সেই ফুল আজ বাংলা দেশের নদী-নালা খাল-বিল সব ভরে দিয়েছে, বাবা! ঢুকে পড়েছে চাষীর ক্ষেতে, তাদের ধান-পাট, সার-শস্য সব নষ্ট করে দিচ্ছে। তুমিই বল, এই শত্রু—এই জঞ্জাল সমূলে তুলে ফেলা উচিত নয়?'

বাবা শুধু হাসলেন। বললেন, 'কত বার, কত বছর তোমরা তুলবে?'

আরো কি বলতে যাচ্ছিলাম, মা ধমক দিয়ে উঠলেন, 'যা, তোর আর বক্তৃতা দিতে হবে না। শেষকালে খাওয়া আছে তো?'

'নিশ্চয়ই! খাওয়া না থাকলে খাটবে কে শুধু-শুধু?'

চরম উত্তর দিয়ে সোজা ছুট দিলাম স্টেশনের দিকে।

কালো হাফ-প্যাণ্ট আর হাত-কাটা গেঞ্জি—এই হল আমাদের, স্কুলের ছেলেদের পোশাক। দল বেঁধে মার্চ করে সবাই চললাম স্টেশনে, সাহেবকে অভ্যর্থনা করতে। সাহেব আমাদের সঙ্গে জলে নামবেন—মনে হল, আর কী, আমরাও সবাই সাহেবেরই মতন এক-এক জন। কী উৎসাহ, কী উন্মাদনা আমাদের! যেন থিয়েটারের প্রেক্ষা-গৃহের এক কোণে না বসে চলে এসেছি সবাই গ্রীনরুমে!

ঝকঝকে পিতলের চাকতি-ওয়ালা অনেক লোক-লস্কর নিয়ে সাহেব যখন নামলেন ট্রেন থেকে, তখন তাঁর দামি কোট প্যাণ্ট আর সুটের স্টাইল দেখে কারুর বিশেষ ভরসা হল না যে, তিনি বাঘাটে বিলের জলে নামবেন বা নামতে পারেন কখনো। এ মনে করবার কারুর সাহস নেই যে, তিনি জীবনে পা থেকে জুতো বা গা থেকে জামা খুলেছেন।

বেলা তখন প্রায় পাঁচটা, বাঘাটে বিল ইস্টিশান থেকে আধঘণ্টার রাস্তা।

হোমরা-চোমরা কে একজন জিজ্ঞেস করলে সাহেবকে, 'সোজা কি বিলেই যাবেন আগে, না—'

'না না, ফার্স্ট কচুরি-পানা। স্ট্রেট বিলেই যাব। আলো বিশেষ নেই আর। অন্যান্য ফাংশন পরেই হবে।' সাহেব পাইপ কামড়াতে কামড়াতে বললেন।

কে আর-একজন বললে, 'আপনি নামবেন নাকি জলে?'

সাহেব চিবুকটা শূন্যে উঁচু করে দিয়ে বললেন, 'সার্টেনলি! জলে নামব না তো এসেছি কেন? যদিও আই হ্যাভ এ টাচ্ অব্ কোল্ড, আই ডোণ্ট মাইণ্ড।' বলে পেণ্টালুনের পকেট থেকে রুমাল বের করে সাহেব সদর্পে নাক ঝাড়লেন।

অনেক গাড়ি-ঘোড়া ছিল মজুত। কিন্তু সাহেব পায়ে হাঁটার পক্ষপাতী। আমাদের দিকে তাকিয়ে তিনি বলে উঠলেন সেনাপতির ভঙ্গিতে,—'নিজের পায়ে দাঁড়াও।'

একসঙ্গে আমরা সুর করে বলে উঠলাম—

'নিজের পায়ে দাঁড়াও,
ঊর্ধ্বে হাত বাড়াও,
ভয় অবসাদ তাড়াও,
নিজের পায়ে দাঁড়াও।'

যেন দেশজয় করতে যাচ্ছি, এমনি সবার অনুপ্রাণনা। কাজ তুচ্ছ হোক কি বড় হোক, সকলে মিলে কাজ করার মধ্যেই আনন্দ।

আমাদের স্কুলের যে মাঠ, তারই পরে কিছুটা দূরে বাঘাটে বিল। যেমন শুনতে, তেমন দেখতে নয় বিলটা। বর্ষার সময় যদিও এটা নদীর সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে যায়, এখন—এই চৈত্রমাসে—খরার দিনে—এটার আয়তন খুব বিস্তার নয়। শত্রুর তুলনায় আততায়ীর আয়োজন তাই অনেক বেশি।

বিলের কাছে পৌঁছোনোমাত্র যার-যার এলেকায় সে-সে আলাদা হয়ে গেল। বাঁশ দিয়ে ঘিরে টিকিট ঝুলিয়ে এলেকা ভাগ করা হয়েছে—কোনটা মোক্তার, কোনটা উকিল, কোনটা মাদ্রাসা, কোনটা গুরু-ট্রেনিং। এক-এক খোপে বিশাল এক-একটা জনতা। যাদের পরনে হাফ-প্যান্ট নেই, তাদের সব হাঁটুর উপর কাপড় তোলা, কেউ-কেউ বা অতি উৎসাহে খালি-গা।

সাহেব বললেন, 'আমি ইটার্ন্যাল স্টুডেন্ট। তাই আমি ছাত্রদের দলে।' বলে তিনি আমাদের খোপরিতে চলে এলেন।

গায়ের কোটটা ফেললেন খুলে। অমনি ব্যাণ্ড বেজে উঠল মেঘ-নিনাদে।

হাত তুলে ব্যাণ্ড থামিয়ে তিনি বললেন, 'জলে নামবার আগে ছেলেদেরকে আমি অ্যাড্রেস করতে চাই। ওরা—ওরাই হচ্ছে দেশের ফিউচার।' পরে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করে দেখলেন, লাউড-স্পীকারের কোন বন্দোবস্ত নেই। ইলেকট্রিসিটিই যে দেশে নেই, সে দেশে কীই

বা বক্তৃতা জমবে—এমনি একটা সঘৃণ তাচ্ছিল্যের ভাব তাঁর মুখে ফুটে উঠল। তবু, সংক্ষেপে—

সাহেবের কৈশোর আমাদেরই মত আমাদেরই দেশের জলে-রোদে গড়ে উঠলেও পরবর্তী জীবনে বহু বৎসর বিলেতে থাকার দরুন বাংলা ভাষাটা তাঁর তেমন সড়-গড় নেই। কথায়-কথায় হোঁচট খান, আর ইংরিজির আশ্রয় নেন। আর, বাংলাটা যে তাঁর ভাল আসে না, এটা তাঁর কাছে খুব একটা মজার ব্যাপার বলে মনে হয়। সেটা যেন তাঁর কৃতিত্বের ফল, তাঁর বড় হওয়ার প্রমাণ।

আমাদের সম্বোধন করে তিনি বললেন—

'ইউনিটি, মানে একতা—একতাই হচ্ছে স্ট্রেংথ। স্ট্রেংথ—স্ট্রেংথের মানে কী?'

আমরা সমস্বরে বলে উঠলাম, 'শক্তি'।

'হোপলেস!' সাহেব নিষ্পাপ সারল্যে হেসে উঠলেন—'শক্তি—সবই শক্তি! ফোর্স মানে শক্তি, পাওয়ার মানে শক্তি, এনার্জি মানে শক্তি, স্ট্রেংথ মানে শক্তি। কথাই নেই মোটে বাংলা ভাষায়, কী করে তবে আমরা শক্তিমান হব? নিরাশ! নিরাশ! হোপলেস! থাক্ গে।'

একটু থেমে, গলায় খাঁকরি দিয়ে তিনি ফের শুরু করলেন, 'সেল্ফ্! সেল্ফ্ মানে কী?'

কেউ-কেউ বলে উঠল, 'তাক। যাতে বই রাখা হয়।'

'শেল্ফ্ নয়, সেল্ফ্।' সাহেব তাঁর জিভটা মুখের তালু থেকে দাঁতের গোড়ায় আনলেন।

সবাই সমস্বরে বলে উঠলাম, 'স্বার্থ।'

'হ্যাঁ, এই সেলফ্ হেল্প, মানে, স্বার্থ-সাহায্য ছাড়া পৃথিবীতে কিছুই হবার নয়।' সাহেব একটা ঢোক গিললেন। এরপর তাঁর পার্সিভিয়ারেন্স কথাটা মনে এসেছিল বোধহয়, এবং নিশ্চয় তিনি অনুমান করলেন, এমন শক্ত কথাটার নিশ্চয় কোন বাংলা প্রতিশব্দ নেই। তাই

তিনি নিরাশ হয়ে বক্তৃতায় ইতি দিলেন। বললেন, 'যে দুটো উচ্চ উপদেশ তোমাদের দিলাম আজ, তাই মনে রাখলেই এনাফ। হ্যাঁ, আলো আর বেশি নেই। এবার আরম্ভ করে দেওয়া যাক।'

ব্যাণ্ড বেজে উঠল শার্দূল-বিক্রীড়িত ছন্দে।

সাহেব তাঁর শার্টের লিঙ্কস্ খুলে হাত গুটোলেন। নিচু হয়ে জুতোর ফিতে খুলতে যাবেন, এমন সময় একজন খয়ের খাঁ তাঁর কাছে এসে বিনীত ভঙ্গিতে বললে, 'আপনার সর্দি হয়েছে, আপনি কেন কষ্ট করে মিছিমিছি জলে নামবেন? আপনি পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকুন, ছেলেরা তুলে তুলে এনে আপনার হাতে দিক, আপনি তাই ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিন দূরে। তাইতেই চমৎকার হবে।'

'আর ইউ ম্যাড?' সাহেব ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, 'আমি এতদূর এসেছি শুধু পণ্ডশ্রম করতে? টু প্লে ট্রুয়াণ্ট? কক্ষনো না। আমি নামব বৈকি জলে।' বলে তিনি জুতো মোজা খুলে ফেললেন। আমরা সমনেত্রে তাঁর দুর্লভ-দর্শন পদযুগের দিকে তাকিয়ে রইলুম।

এ তো আর ধুতি নয় যে হাঁটু পর্যন্ত অক্লেশে তুলে নিলেই হল। তাই সাহেব পেণ্টালুনের পা দুটো অতি কষ্টে একটু তুলে ক্লিপ দিয়ে আটকে নিলেন। পেণ্টালুন বলেই জলের মধ্যে বেশি দূর আর নামতে হল না। তাতে কিছু এসে যাবে না, কেননা পায়ের কাছেও প্রচুর কচুরিপানা স্তূপীকৃত হয়ে আছে।

সাহেবকে জল ছুঁতে দেখে চতুর্দিক থেকে বিপুল জনতা মত্ত বিক্রমে বিলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ব্যাণ্ড বেজে উঠল বৃংহিত ধ্বনিতে, সিংহ-আস্ফালনে।

সাহেব এক-আঁজলা কচুরি পানা তুলে ধরে পিছন দিকে তাকালেন ঘাড় বেঁকিয়ে; কিন্তু তেপায়ার উপরে কালো পর্দা কোথাও দেখতে পেলেন না। সোজা হয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন, বিস্মিত ক্রুদ্ধ গলায় প্রশ্ন করলেন, 'তার মানে? ফোটোগ্রাফার কই?'

সেই খয়ের খাঁ ব্যক্তিটি দীনহীনের মত মুখ করে বললেন, 'তার এই

ট্রেনে সদর থেকে আসবার কথা ছিল ঘরে। কিন্তু—কিন্তু সে আসে নি দেখছি। তার সঙ্গের লোক বলছে যে, সে নাকি ট্রেন মিস করেছে।'

'হোয়াট ডু ইউ মীন!' সাহেব মুখিয়ে উঠলেন, 'ফোটোগ্রাফার ছাড়া এইসব আয়োজনের মানে কী? কী হবে তবে আমার জলে নেমে?' সাহেব অপরিসীম রাগ করে হাতের কচুরি-পানা জলের মধ্যেই ফেলে দিলেন। চোখ মুখ পাকিয়ে বললেন, 'হ্যামলেট ছাড়াই আপনি হ্যামলেট নাটক করাতে চান? ছু-দিন আগে থেকে ফোটোগ্রাফার জোগাড় করে রাখেন নি কেন?' বলে তিনি হাতের জল না মুছেই, জুতো পায়ে না-দিয়েই বড়-বড় পা ফেলে সোজা চলে গেলেন ডাকবাংলোয়।

ছুঃশাসনের রক্তপান হয়ে গেল—এমন একখানা বিবর্ণ মুখ করে রইলেন সেই খয়ের খাঁ বাবুটি।

যেন বিয়ের সভা থেকে বর গেল উঠে—এমনি শোকাবহ ব্যাপার ঘটে গেল। জিন আর চাবুকেরই খুব সমারোহ হয়েছে, আসল যে ঘোড়া, তারই দেখা নেই। ফোটোগ্রাফার নেই তো কে দেখবে এই সাহেবের কীর্তি! গ্রামের এই কটা শুধু লোক দেখলে তৃপ্তি কোথায়?

ভীষণ দমে গেলাম আমরা, কিন্তু কাজে নেমে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করার শিক্ষা আমাদের নয়। ব্যাণ্ডে তখন বাজছে বিসর্জনের বাজনা। তারই মধ্যে আমরা বাঘাটে বিলে নেমে যার-যার এলেকা-মত মশা কচুরিপানা তুলতে লাগলাম। দেখতে দেখতে বাঘাটে বিলও তার শুভ্র স্বমূর্তি ধারণ করল।

ভাবলাম, কাজ যখন উদ্ধার হয়েছে তখন নিশ্চয়ই সাহেবের মান ভাঙবে; কিন্তু ডাক-বাংলোয় এসে দেখি, সাহেব ফিরিতি ট্রেনে চলে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছেন। এমন কারুর সাধ্য নেই যে তাঁর সামনে এগোয় বা একটা কথা কয়।

সাহেবের ফিরে যাবার দৃশ্য দেখে ফিরে এসে দেখি, খাবারের জায়গায় তুমুল ওলোট-পালোট চলেছে। কোথাও আর কোন শাসন নেই, যে যা পারছে মুখে ঠাসছে, পকেটে পুরছে, রুমালে বাঁধছে। সে একটা হরির লুট চলেছে বলা যায়।

ম্লান মুখে ঘুর-ঘুর করছিলাম, সুখেন্দু এক কাপ চা আমার হাতে দিয়ে বললে, 'পানা।' আর একটা কচুরি আমার হাতে দিয়ে বললে, 'কচুরি।'

নিরাপদ

'এই তোর বোতাম লাগাবার ছিরি ?'

'কেন, কী হয়েছে ?'

'কী হয়েছে মানে ? এই ছোট ঘরের জন্যে এত বড় বোতাম ?'

নিরাপদ একবার আড়চোখে দেখল রঞ্জনকে। রঞ্জন ট্রাউজার পরে কোমরের বোতাম আঁটছে। কিছুতেই এঁটে উঠতে পারছে না। ঘরের মধ্যে কিছুতেই ঢোকাতে পারছে না বোতামটা।

'তোর এটুকু সামান্য বুদ্ধি নেই ? প্যান্টে তুই কোটের বোতাম লাগিয়েছিস ?'

হাতের কাজ ফেলে সাহায্য করতে এল নিরাপদ। রঞ্জন দু-হাত ছেড়ে দিয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে দাঁড়াল। নিরাপদ ট্রাউজারের মুখের দু-প্রান্ত টেনে ধরে ঘরের মধ্যে বোতাম ঢোকাবার চেষ্টা করতে লাগল প্রাণপণে। ঘর আসে তো বোতাম ফসকায়, বোতাম আসে তো ঘর মুখ বুজে থাকে।

অসম্ভব।

দু-হাত শূন্যে তুলে ধরল রঞ্জন। এতে যদি নিরাপদ আরো কর্তৃত্ব আরো স্বাধীনতা পায়। কিন্তু কিছুতেই কিছু হবার নয়।

গলদ্‌ঘর্ম হতে হতে নিরাপদ বললে, 'আপনি বাবু মোটা হয়ে পড়েছেন।'

'আমি মোটা হয়ে পড়েছি ! কথা বলার কী ছিরি ! লোকে বর বলে প্যাণ্টটা ছোট হয়ে গিয়েছে।' গা-জ্বলা গলায় রঞ্জন বললে।

'ও একই কথা। কতদিন পরে ট্রাঙ্ক থেকে এই বালিশের খোলটা বেরুল বলুন তো !' আরেকবার হন্তদন্ত চেষ্টা করল নিরাপদ।

'যতদিন পরেই বেরুক না, তোর কী !'

'আমার আবার কী। আমার এই হায়রানি। একবার বোতাম লাগাও, তারপর আবার পরিয়ে দাও।'

'নে নে, খুব হয়েছে। একটা দড়ি নিয়ে আয়। যেমন চট মুড়ে বস্তা বাঁধে তেমনি করে বাঁধ্ কোমরটাকে।'

তা ছাড়া গত্যন্তর নেই। হাত ছেড়ে দিল নিরাপদ। বললে, 'তাই ভাল। কোটের নিচে প্যান্টের দড়ি কেউ দেখতে আসবে না।'

কিন্তু চাই বললেই দড়ি জোগাড় করা চারটিখানি কথা নয়। শুধু নিরাপদ বলেই তা সম্ভব। কবেকার কোন্ প্যাকেটের সঙ্গে দোকান থেকে একটা নীল রঙের দড়ি এসেছিল সেইটেই যে সযত্নে তুলে রেখেছিল। সেইটে এনে এখন সে হাজির করলে। মুরুব্বির মতন বললে, 'কোন জিনিসই তুচ্ছ নয়। কখন যে কী কাজে লাগে কেউ বলতে পারে না।'

'এই দড়ি!' তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল রঞ্জন: 'এ দড়ি আমার কোমরে না বেঁধে গলায় জড়িয়ে দে।'

দড়ির আবার জাতগোত্র কী। বিশেষত যে দড়ি প্রচ্ছন্ন থাকবে। এমনি কত কিছুই তো লুকিয়ে রেখে বাইরে ঠিকঠাক থাকবার চেষ্টা। দড়ির বেলায় ব্যতিক্রম কেন!

আরেকটা দড়ির সন্ধানে ছুটতে যাচ্ছিল নিরাপদ, রঞ্জন ধমকে উঠল: 'নে, এটাই বেঁধে দে। দেরি করবার সময় নেই। সাড়ে দশটায় ইন্টারভিউ।'

নীল দড়িটাই নির্লিপ্ত মুখে বেঁধে দিতে লাগল নিরাপদ।

জুতো পরতে গিয়ে আবার ক্ষেপে উঠল রঞ্জন: 'এ কী করছিস হতভাগা? ব্রাউন জুতোয় ডার্ক ট্যান কালি লাগিয়েছিস?'

হাঁ হয়ে রইল নিরাপদ।

মাথায় করাত চালিয়েও ব্যাপারটা বোঝানো গেল না। এই জিব-ওলা জুতোটা এতদিন পরে আলনার তলা থেকে বেরিয়ে এসে অন্য

রকম খোরাক চাইবে? রঞ্জন আর নিরাপদ কি এ বাড়িতে দু-রকম খাবার খায়?

'যা না সাহেবের বাড়িতে, ছাখ্ না তোকে কী খেতে দেয়!'

পায়ের তলায় বসে পড়ে জুতোর ফিতে বেঁধে দিতে দিতে নিরাপদ বললে, 'আপনার জুতোর দিকে কে চাইবে?'

'তুই একটা আকাট! কাঁকলাশের মত এক নজরে আপাদমস্তক দেখে নেয়, শুষে নেয়। সে যে কী চাউনি জানিস না। কোথাও এতটুকু খুঁত থাকলে, চেহারায় কি পোশাকে, গালে দাড়ির একটা খোঁচা নখের কোণে একটু মাটি, জামার ভাঁজ বা জুতোর ছেঁড়া—এক-চক্ষে বাতিল।'

'যাতে চোখে সুনজর আসে তা আমি করে দেব।' হাঁপিয়ে পড়েছিল রঞ্জন, তাকে পাখার হাওয়া করতে করতে নিরাপদ বললে। 'আপনি একটুও ভাববেন না।'

'তুই মন্ত্র জানিস?'

ফিকফিক করে হাসতে লাগল নিরাপদ।

বেরুবে, দরজার সামনে নিরাপদ কখন একটা জলে-ভর্তি ঘট এনে রেখেছে। কোত্থেকে একটা ফুল ছিঁড়ে এনে জল ছিটোতে ছিটোতে বিড়-বিড় করে মন্ত্র আওড়াতে লাগল: 'রথে তু বামনং দৃষ্টা—'

'সে কী রে ইডিয়ট? এ যে পুনর্জন্ম না-হবার মন্ত্র।'

একগাল হেসে নিরাপদ বললে, 'মন্ত্র একটা হলেই হল।'

সন্ধের পর পাতা বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে আছে রঞ্জন আর তার পাশে দাঁড়িয়ে পাখার হাওয়া করছে নিরাপদ।

রঞ্জন বললে, 'চাকরিটা হল না। আরো যারা উমেদার এসেছিল তারা আমার চেয়ে ঢের বেশি ফিটফাট, ঢের বেশি তাদের সাজগোজ। ছুরির ধারের মত পেন্টালুনের ক্রিজ, আয়নার মত ঝকঝকে জুতো। তার মানে, বুঝতেই পারছিস, তাদের চাকর আমার চাকরের চাইতে কত ভাল!'

'কী করবেন বাবু! যার অদৃষ্টে যেমনি জুটেছে।' কী রকম সুরে যেন কথাটা বললে নিরাপদ।

'তার মানে, তোর অদৃষ্ট খারাপ বলেই আমার মতন বাজে-মার্কা মুনিব পেয়েছিস। যা হতভাগা, এক্ষুনি বেরিয়ে যা বাড়ি ছেড়ে—'

মুখে বললেই তো আর জগৎ রসাতলে যায় না। পাখা ছেড়ে এবার পা নিয়ে বসল নিরাপদ।

'চাকরি করতে যাওয়া মানেই চাকর হওয়া। তা আমার নিজের চাকরই যখন রদ্দি, ওয়ার্থলেস, তখন আমাকে আর কে চাকর রাখবে? ওরা বললে, এই যখন তোমার চাকরের নমুনা, তখন তুমি তার চেয়ে আর কোন্ ছিরির হবে। তাই দেখছিস, তোর জন্যেই আমার কিছু হল না।'

'কী হবে আপনার চাকরি করে?'

'কী হবে মানে?' রঞ্জন প্রসারিত পা-টা চট করে গুটিয়ে নিল।

'এই তো দিব্বি খাচ্ছেন দাচ্ছেন বেড়াচ্ছেন।'

'খাচ্ছি দাচ্ছি বেড়াচ্ছি? বাড়ি ভাড়া দিতে হবে না? চাল ডাল তেল নুন? তোর মাইনে?'

'যখন যেমন পাচ্ছেন যেমন দিচ্ছেন তেমনি দেবেন।'

'তার মানে একটা ছন্নছাড়ার মত আমার দিন যাবে? আমি অবস্থার উন্নতি করব না?' শোয়া ছেড়ে রঞ্জন উঠে বসল: 'তুই তোর উন্নতি চাস না বলে আমাকেও এমনি জীবনের নিচের তলায় এঁদো অন্ধকার সিঁড়ির নিচেই থাকতে হবে?'

পা সরে গিয়েছে, তাই আবার পাখা তুলে নিল নিরাপদ। দার্শনিকের মত মুখ করে বললে, 'কিন্তু বাবু, উন্নতি হলেই অশান্তি।'

কথাটা খুব মিথ্যে বলে নি নিরাপদ। রঞ্জন আবার গা ছেড়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল। এমনি ওসুধের অর্ডার সাপ্লায়ারি কাজ করছে, ছুটো খুচরো কাজ, এর থেকে মোটা রোজগার নেই বটে কিন্তু ইচ্ছেমত ঘোরো ফেরো, ইচ্ছেমত শুয়ে-বসে থেকো। বাঁধা-ধরা নেই। দশটা-

পাঁচটা নেই, দায়-দায়িত্ব নেই। এই স্বাধীন ব্যবসা ছেড়ে কোন কেমিক্যাল ফার্মে মোটা মাইনের কাজ নেওয়ার মধ্যে ঝঞ্জাট ঝামেলা বেশি, কে না জানে ; কিন্তু তাতে ও বলবার কে !

'তার মানে তোর শান্তির জন্যে আমাকে এমনি ধুঁকে ধুঁকে মরতে হবে ? দাঁড়া না, একটা জোগাড় করি আগে, তারপর তোকে ডিসমিস করে দেব।'

'কত বছর ধরেই তো চেষ্টা করছেন।' পাখা ছেড়ে আবার পা নিয়ে বসল নিরাপদ, আঙুলগুলো টেনে দিতে লাগল।

'তুই লেগে আছিস বলেই তো আমার কিছু হচ্ছে না। তুই অপয়া, অনামুখো। কিন্তু মানুষের সব দিন সমান যায় না। একটা-না-একটা একদিন এসে জুটবেই। তখন উর্দি-পরা আর্দালি হবে, বাবুর্চি হবে। আর তুই ষাঁড়ের গোবর, তুই নিকাল যাবি।'

উঠে পড়ল নিরাপদ।

কবে গাঁয়ে আকাল হলে ছিটকে এসে পড়েছিল, সেই থেকে লেগে আছে। একটা বাড়ির একতলার দু-খানা ঘর নিয়ে একটা ফালি, সেখানেই রঞ্জনের ডেরা। সংসারে সে একা আর সব কর্মের গোঁসাই এই চাকর। দেশে গাঁয়ে কে আছে না জানি, রঞ্জনের পিসি না খুড়ি, বাড়তি আয় হলে তাকে কিছু পাঠায় কালে-ভদ্রে। নতুবা সে একাই এক সহস্র। একা কাঁদে, একা হাসে, একাই স্বপ্ন দেখে। থাকবার মধ্যে আছে এই পেটের বাছা ষষ্ঠীদাস। ইস্তক জুতো সেলাই নাগাদ চণ্ডীপাঠ সব কাজের ওস্তাগর।

ছোট গ্লাসে করে রঞ্জনকে ওষুধ দিচ্ছে নিরাপদ।

'কাশি আজ আর নেই। খাব না ওষুধ।'

'ডাক্তার বলে গিয়েছে কাশি সেরে গেলেও দিন-কতক ওষুধটা চালিয়ে যেতে।' নিরাপদর মুখে পরম নিশ্চিন্ত ছাপ।

'এখন থাক। রাতে খাওয়ার পর খাব-খন।'

'তখন তো আরেকটা ওষুধ, সেই পিলটা—'ওষুধের গ্লাসটা বাড়িয়ে

ধরল নিরাপদ : যতই আপনার বয়-বাবুর্চি বা আর্দালি চাপরাসি আসুক কেউ নিরাপদ নয়।'

ওষুধটা এক ঢোকে খেয়ে ফেলে রঞ্জন বললে, 'কিন্তু কেউই তোর মত ভূত হবে না। ভূত না হলে তুই ও কথা বলিস যে আমার উন্নতি না হোক, আমার ঠাট-বাট না বাড়ুক, তোকে নিয়ে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিই! কোথাকার উড়ো খই গোবিন্দায় নমো হয়ে এসেছিস, তোর ইচ্ছে গোবিন্দ আর কোন প্রসাদ না পাক। ঐ খই খেয়েই তোর হাতের পোড়া-ঝোড়া রান্না খেয়েই দিন কাটুক!'

'আপনার উন্নতি হলে আমার উন্নতি কোথায়?'

'তোর উন্নতি রাস্তায়, নর্দমায়, আঁস্তাকুড়ে—'

খাবার তদারক করতে গেছে নিরাপদ। কোন্ কাজটা না করে দিচ্ছে সে। দাঁত খোঁচাবার খড়কেটি পর্যন্ত হাতের কাছে এগিয়ে ধরছে। তারপর শুলে বসলে ফাঁকা হাতে পাখার বাতাস করছে পাশে দাঁড়িয়ে। ঘুমিয়ে পড়লে মশারি তুলে দিচ্ছে। ঘুম থেকে উঠতেই এগিয়ে দিচ্ছে স্যাণ্ডেলজোড়া। কোন্ কাজটা না হচ্ছে শুনি! দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম পর্যন্ত ধুয়ে দিচ্ছে। কাঁচের গ্লাসে ঘষে ধারালো করে দিচ্ছে পুরানো ব্লেড।

দোষের মধ্যে জেল্লা নেই, চেকনাই নেই। একটু গেঁতো, একটু বুদ্ধিকম। মাঝে মাঝে ভুলে যায়, ভুল করে বসে। এখানকার জিনিস ওখানে রাখে। বাজার থেকে ঠকে আসে। একটাকা ভেবে কখনো দু-টাকার নোট দিয়ে দেয়। গ্লাসটা-কুঁজোটা হাতের বেকায়দায় ভেঙে ফেলে।

কিন্তু কেবল বাইরেটাই দেখবে, মন দেখবে না?

এবার একটা ইণ্টারভিউ এসেছে সেটা বিদেশে। বাংলা দেশের বাইরে।

'কবে যেতে হবে?' পাখা হাতে ছুটে এল নিরাপদ।

'দিন-সাতেকের মধ্যেই। এবারের চাকরিটা পেয়ে যাব বলেই মনে

হচ্ছে। লিখেছে আসছে মাসের গোড়াতেই জয়েন করতে পারব কি না।'

'কোথায় ?'

'মধ্যপ্রদেশে।'

সে না জানি কোথায় এমনি একখানা লেপা উনুনের মত মুখ করে রইল নিরাপদ। ঢোক গিলে জিগগেস করলে, 'কত মাইনে দেবে ?'

'তাতে তোর কী মাথাব্যথা ? চাকরি হলে তোকে তো আর সেখানে নিয়ে যাব না !'

নিরাপদ চোখ নামিয়ে রইল।

'তোকে এখানেই একটা জোগাড়যন্ত্র করে নিতে হবে।' গম্ভীর গলায় রঞ্জন বললে, 'কিন্তু তোর কীই বা জুটবে ? ঝাঁকা-মুটে ? সে-রকম গায়ে শক্তি কই ! বরং তোকে কিছু দিয়ে যাব, তুই শিশিবোতল-ওয়ালা হয়ে থাক।'

একবাটি গরম দুধ নিয়ে এল নিরাপদ। শান্ত মুখে বললে, 'এ কদিন আর টই-টই করবেন না। খুব ঠেসে বিশ্রাম নিন। আর বেশ ভাল খাওয়া-দাওয়া করুন। চেহারায় একটু চেকনাই ফিরলেই ইণ্টার-ভ্যুতে আপনাকে পছন্দ করবে।'

'করলে তোর কী ? তোর চেকনাই তো আর ফিরবে না। আর, তোর হাতে যতদিন খাব হাড়ের মাংস ঝরে যাবে।'

'কিন্তু দুধ তো আর আমার রান্না নয়। শুধু জ্বাল দিয়ে এনেছি।'

মুখে ঠেকিয়ে রঞ্জন বললে, 'তোর হাতের জ্বাল, হয়ত পুড়িয়ে ফেলেছিস।'

কাছে দাঁড়িয়ে হাওয়া করতে লাগল নিরাপদ। বললে, 'দুধটা খেয়ে এবার একটু শোন।'

'এখন শোব কী রে ! আমার কত কাজ ! সব গোছগাছ করে ফেলতে হবে।'

'শুলেই শান্তি।' নিরাপদ বিছানাটা টান করতে লাগল। বললে,

'আমিই সব গোছগাছ করে দিতে পারব। কোন্ দিন না করেছি। অনেক হাঁটাহাঁটি করে ক্লান্ত হয়ে এসেছেন। এখন একটু বিশ্রাম করুন। আমি হাওয়া করি।'

'মাথা খারাপ!' উঠে পড়ল রঞ্জন। 'আমাকে এখুনি টাকা-পয়সার জোগাড় দেখতে বেরুতে হবে। কোথাও ধার-ধোর পাই কি না। তারপর কেনাকাটা, ট্রেনে অন্তত একটা সিট রিজার্ভ করার চেষ্টা'—হুড়-মুড় করে বেরিয়ে গেল রঞ্জন।

আবার ফিরতেই এক গ্লাস চিনির সরবৎ নিয়ে হাজির হল নিরাপদ। সঙ্গে সেই পাখা।

সরবৎ খেতে খেতে রঞ্জন বললে, 'যা যা ময়লা দেখছিস ডাইং ক্লীনিংএ দিয়ে দে। এখনো সময় আছে সেমি-আর্জেন্টের। বিছানার চাদরটা না-হয় ছুদিন আগে আর্জেন্ট দিয়ে দিবি। আর শু-জুতোটাতে একটা হাফসোল্ লাগাতে হবে—'

'আমি সব ঠিক করে রাখব।'

'বেশি টাকা পয়সা জোগাড় হল না। আমি আগে যাই। প্রাইভেট খবর পেয়েছি আমাকেই নাকি নেবে। যদি নেয়, একেবারে জয়েন করে দু-দিনের ছুটি নিয়ে এসে বাকি জিনিসপত্তর সব নিয়ে যাব।'

'আর আমি?'

'তুই কি জিনিসপত্তর? তোকে নেব কোথায়!'

হাতের পাখাটা কি একেবার কেঁপে উঠল নিরাপদর?

স্বরে একটু মমতা জানিয়ে বললে, 'সেই অচেনা দেশে গিয়ে তুই করবি কী? তোর মন বসবে না। তুই এখানেই একটা কাজ-টাজ দেখে নিবি। তবে যে কটা দিন আমি না আসি'—

'ততদিন আমি ঠিক ঘরদোর আগলাব। আপনি ভাববেন না।' চোখের উপর চোখ ফেলতে দিল না নিরাপদ। মেঝের দিকে তাকিয়ে রইল।

রাত আটটা ক-মিনিটে ট্রেন।

শহর ঘুরে ঘুরে রঞ্জনের বাড়ি ফিরতে ফিরতে প্রায় সাতটা। সাড়ে সাতটায় না বেরুলেই নয়। তা আধঘণ্টার মধ্যেই গোছগাছ করে নিতে পারবে। আর গোছাবারই বা আছে কী! একটা ছোট স্যুটকেস, কয়েকটা কাপড়-জামা আর দূরের রাস্তা বলে সামান্য একটা বিছানা। নিরাপদ এখন রান্না করে রাখলে হয়।

'কিরে, তোর তৈরি?'

'কখন!' থালা হাতে এসে দাঁড়ালো নিরাপদ।

তাড়াতাড়ি স্যুটকেসটা গুছিয়ে ফেলল রঞ্জন। খেয়ে নিল চটপট। রান্না সম্বন্ধে ভাল-মন্দ কিছুই বলল না। আজ চলে যাচ্ছে, কদিন পরে আসে, ফিরে আসে বা কি না ঠিক কি, আজ কটূক্তি করতে মায়া করছে। মুখখানি হাসি-হাসি করে রঞ্জন বললে, 'বিছানাটা সতরঞ্চি মুড়ে বেঁধে ফ্যাল—'

'বিছানা?' যেন চমকে উঠল নিরাপদ।

'তা, বিছানা লাগবে বইকি। রাস্তায় না মেলতে পারি, বিদেশে শুতে হবে তো। তোশক, চাদর, একটা বালিশ—দে দে, তাড়াতাড়ি জড়িয়ে দে।'

'একি, বিছানার চাদর কোথায়!'

ধনুকের ছিলা যেন ছিঁড়ে গেল এমন চেঁচিয়ে উঠল রঞ্জন। 'আনিস নি ডাইং ক্লীনিং থেকে?'

থরথর করে কাঁপতে লাগল নিরাপদ। অস্পষ্ট স্বরে বললে, 'ভুলে গিয়েছি।'

'ভুলে গিয়েছিস মানে? ডিউ ডেট কবে? দেখি রসিদটা!'

'কাল গিয়েছে।' নিরাপদ রসিদ বার করে দেখাল।

'তবে যা, ছোট্! দোকান তো এখনো বন্ধ হয় নি। নিয়ে আয় চট করে!'

হতাশের মত মুখ করে নিরাপদ বললে, 'এখন তার সময় কোথায়?'

হাতঘড়ির দিকে তাকাল রঞ্জন। সত্যিই সময় নেই। ভাঁড় আনতে গেলে ষাঁড় পালাবে।

বোমার মত ফেটে পড়ল। যা নয় তাই বলে গালাগালি করতে লাগল। হাত থেকে পাখাটা কেড়ে নিয়ে প্রায় মারতে বাকি। 'তোকে আবার রাখবে! ছালা বেঁধে যেমন বেড়াল তাড়ায়, তোকে তেমনি তাড়াব! দেশ-ছাড়া করব! পুলিশে দেব!'

তোশক বালিশ সতরঞ্চি সব টান মেরে ফেলে দিয়ে শুধু সুটকেসটা নিয়েই দরজার দিকে এগুলো রঞ্জন।

'যা, তুই এক্ষুনি বাড়ি ছেড়ে চলে যা। তোকে আমার ঘরদোর আগলাতে হবে না। কী বা সম্পত্তি আমার আছে! আমি বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে চলে যাব। দে, একটা তালা দে।'

যাকে তাড়াবে তার কাছেই আবার তালা চাইছে। কোন কথাই গায়ে মাখল না নিরাপদ। শুধু বললে, 'একটা ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে আসি।'

'তুই নিয়ে আসবি? সে ট্যাক্সি কাল ভোরবেলা এসে পৌঁছুবে। বিছানা নেই, রাতের ঘুম তো গেছেই, এখন চাকরিটাও না যায়।'

সদরের কাছে এসে রঞ্জন থম্‌কে দাঁড়াল। জলে ভরা ঘট পাতা সেখানে।

শুধু তাই নয়, ফুলে করে জলের ছিটে দিতে লাগল নিরাপদ। বিড়বিড় করে আওড়াতে লাগল : 'ব্রহ্মা মুরারি, ত্রিপুরান্তকারী—'

এত দুঃখেও না হেসে পারল না রঞ্জন। বললে, 'এ তো ভোর-বেলাকার মন্ত্র!'

'আমাদের কাছেই ভোর-সন্ধে, তাঁর কাছে সব সমান।'

হাতে সুটকেস, দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল রঞ্জন। গলির মোড়েই ট্যাক্সি পাওয়া গেল। বললে, 'হাওড়া স্টেশন। একটু তাড়াতাড়ি চালাও রেড রোড দিয়ে। ট্রেনটা ধরিয়ে দিতে হবে।'

স্ট্র্যাণ্ড রোডে এসে পড়ল প্রায় আট মিনিটে। কিন্তু হাওড়া ব্রিজের মুখের কাছটায় এসে গাড়ি হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল।

'কী ব্যাপার?'

ব্যাপার অসাধারণ। প্রকাণ্ড ট্র্যাফিক জাম হয়ে গিয়েছে।

কেন?

লরির ড্রাইভাররা লাইটনিং স্ট্রাইক করেছে। বৈদ্যুতিক ধর্মঘট। মানে, আগে কিছু জানান না দিয়ে আচম্‌কা ধর্মঘট করেছে। সব গাড়ি ব্রিজের এমুখ থেকে শুরু করে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের অনেকটা পর্যন্ত আড়াআড়িভাবে ফেলে রেখে সরে পড়েছে। ফলে অন্য গাড়ি পথ পাচ্ছে না। যারা ঢুকে পড়েছিল বেরুতে পারছে না। তাতে করে আরো তালগোল পাকিয়ে গেছে। সাধ্য নেই এই ব্যূহ ভেদ করো।

কিন্তু কেন, কেন এই ধর্মঘট?

নানা জনে নানা বুলি ছাড়ছে। কেউ বলছে কোন একটা লরি কাকে চাপা দিয়েছে বলে মারপিট হয়েছে তার জন্যে। কেউ বলছে পুলিশ নাকি জুলুম করেছে রাস্তায়, তার প্রতিকারে।

আমার এখন প্রতিকার করে কে? রঞ্জন বিশ হাত জলের তলে পড়ল। আমি এখন ওপারে কী করে পৌঁছুই? কী করে ট্রেন ধরি?

ট্যাক্সি ছেড়ে দিল। একবার তাকায় সামনের দিকে। শুধু ঢেউয়ের পর ঢেউ, গাড়ির সমুদ্র।

ঝাঁকে-ঝাঁকে কুলি এসে গিয়েছে, এ পারের যাত্রীদের মাল নিয়ে যাবে। ওদের তো পৌষমাস। একেকটা বোঝা ধরতে যা দর হাঁকছে তা প্রায় দুটো ট্যাক্সি-ভাড়ার সমান।

'মশাই, রিক্সাও পাওয়া যাবে না?'

ভাগ্যিস বিছানাটা আনা হয়নি! তাই সুটকেসটা একাই বইতে পারল রঞ্জন। ব্রিজের ফুটপাত ধরে ছুটে এল জোর পায়ে। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। ট্রেন কোথায়? ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে।

হাঁপাচ্ছে রঞ্জন। গলদ্‌ঘর্ম হয়ে গেছে।

পাখা, পাখা কই? চারিদিকে তাকাল রঞ্জন। শুধু পথ-খুঁজে-না পাওয়া মানুষের ঠেলাঠেলি।

'আর ট্রেন আছে মশাই রাত্রে?' জায়গাটার নাম করল। এ-দোরে ও-দোরে জিগগেস করতে লাগল।

'না। কাল সকাল দশটার আগে আর ট্রেন নেই।'

'তবে উপায়?'

উপায়, বাড়ি ফিরে যাওয়া। আবার গিয়ে ইঁদুর হওয়া।

তখনো জাম পাতলা হয় নি। গাড়িতে গাড়িতে ছয়লাপ। আবার স্যুটকেস হাতে নিয়ে ফিরতি মুখে যাত্রা করল রঞ্জন।

ভাগ্যিস বিছানাটা নেই! থাকলে নিশ্চয়ই কুলি নিতে হত। নিলেই একমুঠো খরচ। অকারণ খরচ। কুলির সুর এখন সপ্তমে বাঁধা।

এপারে এসে একটা ট্যাক্সির জন্যে ছুটোছুটি করতে লাগল। কোথায় ট্যাক্সি! যা দু-একটা দেখা যাচ্ছে, কলা দেখিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। রঞ্জনের ডাক গ্রাহ্যও করছে না। শূন্য ট্যাক্সি, অথচ মিটার নামানো।

হাতের স্যুটকেসটার দিকে তাকাল রঞ্জন। ব্রিজের উপর থেকে তখন গাদার মধ্যে ফেলে দিলে নিশ্চিন্ত হওয়া যেত! যত জিনিস তত অধীনতা, তত উদ্বেগ।

একটা ট্র্যাফিক কনস্টেবলের শরণ নিল রঞ্জন। হাত তুলে কনস্টেবল একটা শূন্য ট্যাক্সি দাঁড় করাল। রঞ্জন স্যুটকেসটা ভিতরে ছুঁড়ে দিয়ে দরজা খুলে ঢুকে পড়ল মুহূর্তে।

কোথায়?' জিগগেস করল ড্রাইভার।

অনেকক্ষণ কোন কথা বলল না রঞ্জন। গা এলিয়ে দিয়ে চোখ রইল।

বাড়ির গলির মুখে যখন এসে পৌঁছল তখন চারদিক নিঝুম হয়ে গেছে। ফুটপাতে যারা শোয় তাদের কেউই বসে নেই, সবাই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন।

একি, রঞ্জনের এখনো আলো জ্বলছে যে? এত রাত্রে? একি, সদর যে খোলা?

তার মানে?

ব্যাটা সব জিনিসপত্তর নিয়ে সরে পড়েছে নাকি? সন্দেহ যাতে না হয় তারই জন্যে দরজা খোলা রেখেছে? রেখেছে আলো জ্বালিয়ে? না কি চোর-ছ্যাঁচড়ের আড্ডা বসিয়েছে? না কি জুয়াড়ির?

চুপি-চুপি দরজা পেরিয়ে ঘরের মধ্যে উঁকি মারল রঞ্জন।

দেখল ডাইং ক্লীনিং থেকে বিছানার চাদরটা নিয়ে এসেছে নিরাপদ। তোশকের উপর ফর্সা চাদর টান করে পেতে পরিপাটি বিছানা করে রেখেছে। এবং পাশে একটা ভাঙা টুলের উপর বসে শূন্য বিছানাকে লক্ষ্য করে মৃদু-মৃদু পাখা চালাচ্ছে। আর ঢুলছে।

ঘরের বাইরে নিঃশব্দে জুতো খুলে ভিতরে ঢুকল রঞ্জন। সুটকেসটা এক কোণে নামিয়ে রেখে তাড়াতাড়ি পাতা বিছানায় ক্লান্ত দেহ ঢেলে দিল।

যতটা চমকানো উচিত ততটা যেন চমকাল না নিরাপদ। শুধু বললে, 'কে?'

'যাকে এতক্ষণ পাখা করছিলি সে।'

সানন্দ বিস্ময়ে বিহ্বল দৃষ্টি তুলে তাকাল নিরাপদ। বললে, 'আমি জানতাম আপনি ফিরে আসবেন। আমাকে ফেলে কি চলে যেতে পারেন?'

সর্বভুক

বড়-সাহেব নিজেই আসছেন জেনে হৃদয় ঘোষালের মুখ শুকিয়ে গেল। হৃদয় বুড়ো হয়েছে, কাজকর্ম খুব খারাপ করছে এবং শোনা যাচ্ছে কিছু-কিছু এদিক-ওদিক সে বেশ হাতিয়ে নিচ্ছে আজকাল—তারই তদন্ত করতে বড়-সাহেব আসছেন। আর, শুধু আসছেন না, কয়েকদিন নাকি থাকবেন ডাকবাংলোয়।

হৃদয় ঘোষালের ঠিক উপরের কর্মচারী জীবনবাবু।

'এখন কী হবে? আটটি ছেলেপিলে—' হৃদয় কেঁদে পড়ল।

জীবনবাবু এক মুহূর্ত কি বিবেচনা করলেন। বললেন, 'সাহেব সেই যে একটা গরু কিনতে চেয়েছিলেন--পশ্চিমি গরু—তার কোন ব্যবস্থা করতে পারলেন? যুগল মাহাতো কী বলে?'

'তার গরু সে পঞ্চাশ টাকার কম ছাড়বে না।'

'উপায় নেই,' জীবনবাবু নিম্নকণ্ঠে বললেন, 'ঐ পঞ্চাশ টাকা দিয়েই তবে কিনতে হবে ওটা। অমনি কালো রঙের পশ্চিমি গাই-ই সাহেবের পছন্দ। যেমন করে পারেন, ওটা জোগাড় করুন গিয়ে।'

গভীর অন্ধকারের মধ্যে হৃদয় আলোর একটি রেখা দেখতে পেল। চলল তখুনি সে যুগল মাহাতোর বাড়ি। প্রথমত, গরু তো যুগল ছাড়বেই না: আর যদি-বা ছাড়ে, পঞ্চাশ টাকার এক আধলা কমে নয়। গরুটা চার সের দুধ দেয়, আর এমন সুন্দর দেখতে, দেখলেই ওর গায়ে হাত বুলুতে ইচ্ছে করে। শ্বশুরবাড়ি থেকে অমনি পেলেও ওটার উপর তার অগাধ স্নেহ।

হৃদয় অনেক স্তুতি মিনতি করল—হয়ত বড়-সাহেবও তাতে গলতেন, কিন্তু যুগল গলল না—তার ছেলের চাকরি করে দেওয়া হবে এই প্রতিশ্রুতিতেও নয়! অতঃপর হৃদয় স্বমূর্তি পরিগ্রহ করে ভয় দেখাতে শুরু করল।

'ঘরে আগুন ধরিয়ে দেব যুগল, কাজটা কিন্তু মোটেই ভাল হচ্ছে না। কাউকে দিয়ে এজাহার করিয়ে হাজতে আটকে রাখব দেখিস, কারসাজি করে ঠেলে দেব জেলে। আর যাকেই চিনিস, হৃদয় ঘোষালকে চিনিস না। এ গাঁ থেকে বাস উঠে যাবে তোর, জমিদারের লেঠেল লাগিয়ে তোর ধান লুট করে নেব। এ গরু আমার জন্যে নয়, বড়-সাহেবের জন্যে। তিনি যখন এসে শুনবেন—'

আতঙ্কে যুগল আধখানা হয়ে গেল। এক কথায় রাজি হয়ে গেল সে গরু বেচতে। অনেক টেনে-বুনে দর সাব্যস্ত হল বিয়াল্লিশ টাকা। যাক তার বাড়ি পুড়ে, হোক তার ধান লুট, এর এক পাই নিচে যুগল আর নামবে না। বেশি টানাটানি করলে দড়ি পাছে ছিঁড়ে যায়, দাঁও যায় ফস্কে, হৃদয় একটি একটি করে টাকা গুণে দিল।

প্রচণ্ড ধূমধাড়াক্কা শহরে—সাহেব আসছেন, আর আসছেন সটান মোটরে। যেন রথের মেলা বসেছে এমনি ভিড়। লতায় পাতায় গেট সাজানো হয়েছে, কলাগাছ পুঁতে পুঁতে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে রঙিন কাগজের শিকল, ফুটছে পটকা, বাজছে জগঝম্প। আর মানুষের মাথা মানুষ খাচ্ছে।

অবিশ্যি গেটের এদিকে ভিড় নেই। গেটের এদিকে চাকুরে কর্মচারীরা সকলে দাঁড়িয়ে আছেন অভ্যর্থনা করার জন্যে উদ্যতভঙ্গি হয়ে। হৃদয় ঘোষাল একটু দূরে আলগা হয়ে রয়েছে—তার হাতে একটা দড়ি। আর দড়িটার অপর প্রান্তে সদ্যক্রীত সেই গাভী।

মোটর থেকে নামলেন সাহেব, মেমসাহেব আর তাঁদের বছর-পাঁচেকের একটি খুকি। সমস্ত জনতা ও সাজসজ্জার ভিতর থেকে ঐ কৃষ্ণকায় গরুটিই সর্বাগ্রে সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। সাহেব এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'এটা কী?'

'আমি, হুজুর!' হৃদয় বিনয়ে মাটির সঙ্গে মিশে গেল।

'তুমি মানে?' সাহেব গরুর দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, 'এটা কী?'

হৃদয় তেমনি ভাব-গলিত কণ্ঠে বললে, 'আমি, হুজুর।'

সাহেব বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি গরু নাকি?'

'হুজুর মা-বাপ!' হৃদয় বিনয়ে আভূমি লুটিয়ে পড়ল।

ব্যাপারটা সাহেব চট্ করে বুঝতে পারলেন না, বুঝিয়ে দিলেন জীবনবাবু। সাহেব একটা কালো গরু কিনতে চেয়েছিলেন জেনে এই গরুটি অনেক কষ্টে সংগ্রহ করা হয়েছে।

'লাভলি কাউ!' মেমসাহেব উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন।

সাহেবের এতক্ষণে মাথা খুলল। বললেন, 'কতটা দুধ দেয়?'

হৃদয় বললে, 'চার সেরের কম নয়।'

'দাম পড়েছে কত?'

হৃদয় ঢোক গিলল। বললে, 'বারো টাকা।'

'ডার্ট চীপ!' মেমসাহেব পুনরায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন।

সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার নাম কী?'

'হৃদয়।'

'হৃদয় কী?'

'হৃদয় ঘোষাল।'

'ও, তুমিই হৃদয় ঘোষাল?' সাহেব কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন তার মুখের দিকে, আর একবার সেই চিক্কণচর্ম নধর গরুটার দিকে। জীবনবাবুকে বললেন, 'এর ফাইলটা আজ রাত্রেই পাঠিয়ে দেবেন।'

জীবনবাবু প্রমাদ গণলেন। কে জানে, হয়ত বা হিতে বিপরীত হয়ে গেল। তাই তিনি আমতা-আমতা করে বললেন, 'আজ শ্রান্ত হয়ে এসেছেন—ইনকোয়ারিটা বরং কাল সকাল থেকে—'

তাঁর কথার সামান্য সস্নেহ প্রতিবাদও সাহেব সহ্য করতে পারেন না। ডাক-বাংলোর ইজিচেয়ারে আধখানা শুয়ে পড়ে সাহেব বিরক্ত মুখে বললেন, 'ইনকোয়ারি মানে?' ব্রিলিয়াণ্ট অফিসার এই হৃদয় ঘোষাল—তার আবার ইনকোয়ারি কী? আপনারা পাঁচজনে মিলে

সবাই ওর পিছনে লেগে যা-তা সব খারাপ রিপোর্ট দিচ্ছেন। আমি এখন সব বুঝতে পারছি। যত নষ্টের গোড়া হচ্ছেন আপনি। আপনার নিচেকার লোক যদি খারাপ হয়, তবে সেটা কার দোষ? সম্পূর্ণ আপনার দোষ। একশোবার। তার মানে হচ্ছে এই, আপনি নিচের দিকে মোটেই নজর দেন না। যান, মুখের উপর কথা কইবেন না, ফাইল পাঠিয়ে দিন এক্ষুনি। হ্যাঁ, দিস্ মোমেণ্ট।'

ফিরে যেতে যেতে জীবনবাবু ভাবলেন, হৃদয় ঘোষাল গরু দিয়ে খালাস পেয়েছে, তাঁর বেলায় হয়ত হাতি লাগবে।

পরদিন সকালে তত্ত্ব-তালাস করতে ডাক-বাংলোয় এসেছেন, জীবনবাবুকে মেমসাহেব হঠাৎ জিগগেস করলেন, 'এখানে দুধের সের কত করে?'

জীবনবাবু ভীষণ অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, 'কেন, দুধ তো আমি পাঠিয়ে দিয়েছি।'

'তা জানি। সের কত করে বলুন।'

'ছ-পয়সা করে বেশ ভাল দুধ।'

'হ্যাঁ, দেখুন, কালো গাইটা থেকে সাড়ে তিন সের অবধি পাওয়া গেছে। ওটা বাড়তি। ওটার একটা ব্যবস্থা করতে হয়।'

এক চুমুকে খেতে বললেও তিনি রাজি, মুখের এমনি ভাব করে জীবনবাবু বললেন, 'বলুন, কী করতে হবে?'

'নর্দমায় ফেলে দিয়ে তো কোন লাভ নেই। বিক্রি করে যা পাওয়া যায় তাই সার্থক।'

'নিশ্চয়। একশোবার। আমি এখুনি বিক্রি করে দিচ্ছি।' নিজের চাকর ডাকিয়ে দুধের হাঁড়িটা নিয়ে জীবনবাবু অদৃশ্য হলেন।

অন্তরালে গিয়ে মেপে দেখলেন, গণনায় মেমসাহেবের কিঞ্চিৎ ভুল হয়েছে। দুধ সাড়ে তিন সের নয়, ছ-সের। অকৃপণ হাতেই মেম-সাহেব তাতে জল ঢেলেছেন।

নদীগর্ভে হাড়িটা নিমজ্জিত করা হল। ডাক-বাংলোয় ফিরে এসে

জীবনবাবু সস্মিতমুখে বললেন, 'আপনার অনুমানে ভুল হয়েছিল, দুধ ছিল ছ-সের।'

মেমসাহেবও হাসলেন। বললেন, 'আমি আপনার সাধুতা পরীক্ষা করছিলাম। তা কত পেলেন দাম?'

'কালো গরুর দুধ, দু-আনা করে বিকিয়েছে। খুচরো এখন নেই, পুরো এই টাকাটাই—' নিটোল একটি টাকা জীবনবাবু বাড়িয়ে ধরলেন।

হাত পেতে সেটা নিতে নিতে মেমসাহেব বললেন, একটু-বা অসন্তুষ্টের মত: 'যাই বলুন, দুধ আপনাদের এখানে ভারি শস্তা। ছ-সেরের দাম মোটে এক টাকা!'

জীবনবাবু কথাটি বললেন না।

বেলা নটার সময় প্রকাণ্ড একটা লাল রুইমাছ এসে হাজির। দেখলেই প্রাণটা ঘাই মেরে ওঠে, কিন্তু মেমসাহেবের মুখ ভার। বললেন, 'এমন চমৎকার মাছ, কিন্তু খোকা কিছু খেতে পেল না!'

অনুসন্ধান করে জানা গেল, খোকা তাঁদের ছেলে, বছর বার-তের বয়স; ইস্কুল কামাই হয় বলে সঙ্গে আসে নি, সদরেই থেকে গেছে।

'পুকুরের এমনতর তাজা মাছ, খেতে পেলে খোকা কত যে খুশি হত! এদের যেমন বুদ্ধি, একটা শুধু ধরে এনেছে!' মেমসাহেব ব্যথিত কণ্ঠে বললেন।

সাহেবের তক্ষুনি হুকুম হল, আরো একটা অমনি মাছ চাই। এইটুকুই শুধু কৃপা করলেন যে, এর চেয়ে বিঘৎখানেক কম হলেও চলবে। আর সেই মাছ সন্ধের আগে, নৌকোয় হোক ট্রেনে হোক মোটরে হোক পায়ে হেঁটে হোক তাঁদের বাড়িতে, ছাব্বিশ মাইল দূরে শহরে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে—তাঁদের খোকার জন্যে। আর তার ভার পড়ল জীবনবাবুর উপর।

জীবনবাবুর তখন ইচ্ছা হল এই মনুষ্যদেহ পরিত্যাগ করে একটা রোহিত মৎস্য হয়ে যেন যান আর আঁশবঁটিতে মাথাটা তাঁর কাটা পড়ে।

তাতেও নিস্তার নেই। এত বড় মাছ সওয়া দুটি প্রাণী সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে পারেন না, তাই ভাগ দেওয়া হয়েছে। এক ভাগ এঁদের, আর বাকি সাত ভাগ অফিসারদের বাড়ি-বাড়ি। প্রত্যেক ভাগ ছ-আনা করে। মাছ যে পাঠাল, সে জানল না মাছের দাম কত।

জীবনবাবুই দুটো টাকা আর দশ আনা পয়সা নিজের পকেট থেকে বার করে দিলেন।

মেমসাহেব অবাক হবার ভাণ করে বললেন, 'কী আশ্চর্য, আপনারা তো বেশ রেজকি পান দেখি! আমি তো দু-দুবার বাজারে পাঠিয়েও টাকা একটা ভাঙাতে পারলুম না।'

জীবনবাবুর মনে হল, আগের মত আস্ত তিনটে টাকা দেয়াই উচিত ছিল।

বিকেলবেলা মেমসাহেব জীবনবাবুকে একটা খুব ভীষণ প্রশ্ন করে বসলেন, 'এখানে কী-কী দেখবার জিনিস আছে?'

ধানক্ষেত ছাড়া আর কী দেখবার জিনিস আছে, জীবনবাবু তা ভেবে পেলেন না। ভেবে-চিন্তে জবাব দিতে কিঞ্চিৎ দেরি হয়ে গেল বলেই মেমসাহেব আর কিছু না পেয়ে বলে উঠলেন, 'চলুন, আপনাদের বাড়িতেই বেড়িয়ে আসি।'

মেমসাহেব বেড়াতে আসছেন সামান্য কর্মচারীর বাড়িতে, এটা প্রায় অভাবনীয়। তারই মধ্যে জীবনবাবুর স্ত্রী ঘর-দোর গুছিয়ে নিলেন, নিজেও একটু সাজগোজ করলেন। এমনকি, কয়েক সের ছানাবড়া আনতে পাঠালেন চাকরকে।

এতবড় একজন হর্ত্রী-কর্ত্রী-বিধাত্রী, অথচ কী অমায়িক স্বভাব, কী নিরহঙ্কার কথাবার্তা! জীবনবাবুর বাড়ির মেয়েরা সবাই একবাক্যে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। গরিব বলে এতটুকুও অশ্রদ্ধা নেই। ভাঙা পিঁড়িতেই বসে পড়েন, কাঁসার থালাতেই খাবার খান। আর সবাইয়ের সঙ্গে হেসে-খেলে কেমন কথা কন। অযথা মানুষে কত নিন্দাই না করে থাকে!

যাবার আগে মেমসাহেব জীবনবাবুর স্ত্রীর গলার হারের দিকে তাকিয়ে সানন্দ বিস্ময়ে বলে উঠলেন, 'বাঃ, চমৎকার হার তো! দেখি, দেখি! কোথায় গড়ালেন? স্যাকরা কে আপনার?'

জীবনবাবুর স্ত্রী বললেন, 'ময়মনসিঙে আমার বাপের বাড়ি। সেখানকার স্যাকরা দিয়ে গড়ানো।'

'বাঃ, চমৎকার প্যাটার্ন তো! দেখি একবার হাতে করে!'

পাশের ঘর থেকে জীবনবাবু একবার তীব্রস্বরে গলা খাঁকরালেন, কিন্তু তাঁর অবোধ স্ত্রী কিছুই বুঝতে পারলেন না।

হারটা হাতে নিয়ে তার ওজনটা অনুভব করতে করতে মেমসাহেব জিগগেস করলেন, 'ক-ভরি হবে?'

অপার সারল্যে জীবনবাবুর স্ত্রী বললেন, 'ভরি সাত-আট হবে।'

'প্রকাণ্ড ভারি হার তো! গলায় রাখেন কী করে? দেখুন, এটা আমি একটু নিয়ে যাচ্ছি; ভয় পাবেন না,' মেমসাহেব সরল, সহৃদয়-ভাবে হাসলেন, 'আমার স্যাকরাকে প্যাটার্নটা দেখিয়ে আবার আপনাকে ফিরিয়ে দেব।'

মেমসাহেব চলে যাবার পর জীবনবাবু বাড়ির মধ্যে এসে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। ব্যাপার শুনে তার স্ত্রী চিৎকার করে কেঁদে উঠলেন। কিন্তু চিৎকারটা তাঁকে এত জোরে করতে দেওয়া গেল না যাতে ডাক-বাংলোর কর্ণগোচর হয়।

জীবনবাবুর সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল হৃদয় ঘোষালের উপর। কিন্তু খবর নিয়ে জানলেন গরুটাকে পথ হাঁটিয়ে সে রওনা হয়েছে সদরের দিকে—ছাব্বিশ মাইল রাস্তা। এত দুঃখে এও তবু সান্ত্বনা যে, কাল সকালে তাঁকে ফের ছ-সের দুধ-মিশ্রিত জল কিনতে হবে না।

সকালে গিয়ে শুনলেন, সাহেব ন-টার মধ্যেই সদরে ফিরে যাবেন। এখনকার ইনকোয়ারি তাঁর শেষ—হৃদয় ঘোষাল খুব দক্ষ, পরিশ্রমী, বুদ্ধিমান কর্মচারী। অতএব আর তাঁর এখানে থাকবার বিন্দুমাত্র প্রয়োজন নেই। ঘুম থেকে উঠেই তিনি যেতেন কিন্তু মেয়েটা বায়না

ধরেছে, শহর দেখবে। যা শহরের শহর, তা আবার দেখতে বেরুনো! ছেলেমানুষ, আবদার না রেখে উপায় নেই।

সাহেব তাই জীবনবাবুকে বললেন, 'আমার গাড়িতে করে ওকে আপনি একটু ঘুরিয়ে নিয়ে আসুন না। আপনিই আমার এখানে সবচেয়ে রিলায়েবল লোক।'

গলার স্বরটা একটু নরম পড়েছে বুঝে জীবনবাবুর গলার স্বর গদ্‌গদ হয়ে উঠল। খুকি সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল, তার দিকে হাত বাড়িয়ে জীবনবাবু বললেন, 'কি খুকি, তুমি কী ভালবাস? বিস্কুট না চকোলেট?'

খুকি কোন কথা বলল না, ঘৃণায় মুখটা ঈষৎ কুঞ্চিত করল।

খুকিকে নিয়ে জীবনবাবু চলেছেন মোটরে, আর—এটা বাঁদর, ওটা বেজি, এগুলো হাঁস, ওগুলো বাদুড়, তাই একমনে দেখাচ্ছেন তাকে। খুকির সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই, তার লক্ষ্য শুধু সামনে, গাড়ি ঠিক পথে চলেছে কি না।

রাস্তার একটা চৌমাথা উপস্থিত হতেই জীবনবাবু বলে উঠলেন, 'ডাইনে।' কেন না ডাইনেটাই ফাঁকা, ইস্টিশানে যাবার টানা রাস্তা।

'না, না, বাঁয়ে!' খুকি তীব্র কণ্ঠে প্রতিবাদ করে উঠল, 'বাঁয়েতেই সব জামা-জুতোর দোকান।'

মুহূর্তে মোটরটা যেন তাঁর বুকের উপর চেপে বসল এমনি মনে হল জীবনবাবুর। তাকালেন একবার খুকির মুখের দিকে, সে মুখে কঠিন ঔদাসীন্য। জিগ্‌গেস করলেন, 'কী করে জানলে বল দেখি?'

'বা, কাল বিকেলে বাবার সঙ্গে যে ঘুরে গেছি এখান দিয়ে। আজ কিনব বলে দুটো ফ্রক পছন্দও করে এসেছি।—এই যে, রোকো, এই দোকান।' খুকি সোৎফুল্ল ভঙ্গিতে হাত বাড়িয়ে দিল, 'ঐ যে নীল ফ্রকটা ঝুলছে!'

একটা নীল, আরেকটা গোলাপি। দুটোই খুকির চাই। আর জামার সম্মান রাখতে চাই দু-জোড়া জুতো। একজোড়া ঘুন্টি-বাঁধা, আরেক জোড়া স্ট্র্যাপ-দেয়া।

'আর টুপি!' খুকি কাঁদো-কাঁদো মুখে বললে।

জীবনবাবু প্রায় ধমকে বললেন, 'না, টুপি এখানে পাওয়া যায় না।'

'না যায়, যায় পাওয়া। আমি কাল বাবার সঙ্গে এসে দেখে গেছি যে!' খুকি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

'দেখে গেছ, তখন কিনে নিতে পার নি?' জীবনবাবু ভেংচিয়ে উঠলেন।

'বাবার কাছে যে তখন পয়সা ছিল না! ও বাবা গো—' খুকি এবার রীতিমত ডাক ছাড়ল।

ফলে, টুপিও হল দু-নম্বর।

জিনিসপত্র নিয়ে গাড়িতে উঠেছেন, জীবনবাবুকে খুকি বললে, 'এবার তবে বিস্কুট কিনে দাও।'

'বিস্কুট কিসের? বিস্কুটের বদলে তো এ-সব নিলে!' জীবনবাবুর ইচ্ছে হল দু-হাতে মেয়েটাকে গলা টিপে ধরেন।

'না, বিস্কুট খাব! তুমিই তো তখন বললে, বিস্কুট কিনে দেবে! এখন ভুলে যাচ্ছ কেন?' খুকি নাকে কাঁদতে লাগল আর লাগল হাত-পা ছুঁড়তে।

'দিয়ে দিন না মশাই!' ঘাড় না ফিরিয়েই স্যোফার বললে, 'ছেলেমানুষ একটা আবদার করেছে—তার জন্যে এত তকরার কিসের?'

অগত্যা বিস্কুটও একবাক্স কেনা হল। জীবনবাবু ভুলতে পারেন, কিন্তু পূর্ব-প্রতিশ্রুত চকোলেটের কথা খুকি ভোলে নি। সুতরাং আর একবাক্স চকোলেট। নতুন আবার কী বিপদপাত হয়, এই ভয়ে তাড়াতাড়ি এক প্যাকেট সিগারেট কিনে নিয়ে স্যোফারের পকেটে গুঁজে দিয়ে বললেন, 'রক্ষে কর দাদা! আর কোথাও না থেমে সটান ডাকবাংলোয় ফিরিয়ে নিয়ে যাও।'

স্যোফার একটু হাসল এবং ফিরিয়ে নিয়ে চলল গাড়ি। জীবনবাবু মনে-মনে হিসেব করতে গেলেন আগাগোড়া, কিন্তু অথই জলে ঠাঁই পেলেন না।

উৎফুল্ল মুখে ডাক-বাংলোর সিঁড়ি দিয়ে উঠতে-উঠতে খুকি বললে, 'তুমি একটা করে আনতে বলেছিলে মা, আমি সব তুটো করে এনেছি।'

মেমসাহেব খুশিতে উছলে উঠলেন। গর্বে ও আনন্দে তাঁর বুক ভরে উঠল। সাহেব ইজি-চেয়ারে শুয়ে পা টেপাচ্ছিলেন, তাঁর কাছে এসে বললেন, 'খুকি আমাদের কী চালাক—সব তুটো করে আদায় করে নিয়েছে। টুপি পর্যন্ত তুটো।' বলে তিনি অপর্যাপ্ত হাসতে লাগলেন। দেখাতে লাগলেন জিনিসগুলো।

এতে যেন কিছুই আশ্চর্য হবার নেই, সাহেব এমনি ভাব করলেন। যেন এটা নিতান্তই স্বাভাবিক, ভীষণ একটা গুণের কাজ, এমনিভাবে বললেন, 'আমাদেরই তো মেয়ে!' পরে একটু চোখ টিপলেন: 'আদায় করে নিয়েছে এ কথা তুমি বলতে পার না। সব জীবনবাবু ওকে ভালবেসে উপহার দিয়েছেন। ডাক জীবনবাবুকে!'

বলির পশুর মত জীবনবাবু সামনে এসে দাঁড়ালেন। সঙ্গে সম্বল শুধু এই রিস্টওয়াচটা, তুঃখীর মত তাকালেন একবার তার দিকে।

সাহেব লজ্জিত বিনয়ের ভাণ করে বললেন, 'আপনি খুকিকে মিছিমিছি এত সব জিনিস প্রেজেণ্ট দিতে গেলেন কেন? ওর কি কিছু অভাব আছে? শুধু-শুধু কতকগুলো খরচ করলেন। এই তুর্মূল্যের বাজারে—'

'না, না, তাতে কী, তাতে কী—' জীবনবাবু পরম আপ্যায়িতের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইলেন।

'দেখুন দিকি আপনার ঘড়িতে কটা বেজেছে?'

জীবনবাবুর বুকটা ধ্বক করে উঠল। পাংশু মুখে ম্রিয়মান কণ্ঠে বললেন, 'সাড়ে আটটা।'

'মাই লর্ড! আমাদের এখন বেরুতে হয়।'

যাক, বেঁচে গেছেন জীবনবাবু। ঘড়িটা অতি সন্তর্পণে কানের কাছে তুলে ধরলেন। তাঁর হৃৎপিণ্ডের মতই ঘড়িটা এখনো ধুকধুক করছে।

বন্দী

ভারতবর্ষে এত জায়গা থাকতে হাওয়া-বদল করতে এলাম কিনা আরারিয়া! পূর্ণিয়া জেলার ছোট একটা মহকুমা, খটখটে, ধূ-ধূ করছে মাঠ, উঁচু-নিচু মাঠ, আর মাঠের ওপর দিয়ে চলেছে চওড়া মোটর ট্র্যাক। উত্তরে মোরাঙ্ পর্বতের শ্রেণী চলে গেছে—কঠিন মসীময় রেখা; তার ওপারে হিমালয়ের তুষারশৃঙ্গ। সকালে সন্ধ্যায় সূর্যের উদয় ও অস্তের সময় সেইসব তুষার-পুঞ্জ তোমার আমার নিভৃত কল্পনার চেয়েও রমণীয় হয়ে উঠে।

কিন্তু গল্প তা নিয়ে নয়।

কুয়োর মিষ্টি জল, মোষের টাটকা সব দুধ, আর ঢেঁকিছাঁটা লাল চালে দেখতে দেখতে শরীরের ভোল ফিরে গেল। সকালে বিকেলে লম্বা মোটর ড্রাইভ, দুপুরে তাস ও রাত্রে গ্রামোফোন—দিনগুলি কাটছিল বেশ; কিন্তু হঠাৎ একদিন ক্যালেণ্ডারের দিকে চেয়ে খেয়াল হল রিটার্ন টিকিটের মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছে। এবার কলকাতায় ফিরতে হবে। এবং এই ফেরবার পথেই গল্পের শুরু।

আমার বন্ধু অমল—যাদের বাড়িতে আমি উঠেছি—জীবনে কোনদিন বাঁধাধরা রাস্তায় চলতে চায় না। মানবে না রুটিন, শুনবে না পরামর্শ। হাতে দু-দিন রেখে যে আগে রওনা হব তার পথও সে বন্ধ করলে। একেবারে শেষ তারিখে কাঁটায়-কাঁটায় ট্রেন ধরতে হবে। বিপদ আপদকে থোড়াই সে কেয়ার করে।

সকালে উঠে সুটকেস গুছোচ্ছি, অমল বললে, 'এরই মধ্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলে যে?'

বিরক্ত হয়ে বললাম, 'বা, সাতটা পঞ্চান্নতে ট্রেন, স্টেশনে দু-মিনিট মাত্র স্টপেজ, এখন না বেরুলে ধরব কী করে?'

অমল বললে, 'সকালের ট্রেনে গেলে কাটিহারে ছ-সাত ঘণ্টা যে ঠায় বসে থাকতে হবে, সে খেয়াল আছে ?'

'অগত্যা থাকতেই হবে। পেশেন্স খেলবার জন্যে তাস নিয়ে যাচ্ছি, পড়বার জন্যে সঙ্গে টাইম-টেবল আছে।'

অমল প্রায় ধমক দিয়ে উঠল, 'না, এ-ট্রেনে কোন ভদ্রলোক যায় নাকি ? রাখ ওসব, টান-টান করে খেয়ে নাও, যাবার ব্যবস্থা আমি সব ঠিক করে দেব।'

ঢোক গিলে বললাম, 'আবার কখন দেবে ? আজকেই টিকিটের শেষ তারিখ, কাল মধ্যরাত্রের মধ্যে আমাকে হাওড়ায় পৌঁছতে হবে।'

অমল বললে, 'কাল মধ্যরাত্রের এখন দেরি আছে। সেজন্য তোমার ভাবতে হবে না। দুপুরে দুটো পঁয়ত্রিশে কসবা থেকে একটা শাট্‌ল্ ট্রেন ছাড়ে, ওটায় গেলে কাটিহারে আর তোমার বদলাতে হবে না। অমন হাঁ করে তাকিয়ে রইলে কেন ?'

বললাম, 'বল কী ? কসবা এখান থেকে যে প্রায় চব্বিশ মাইল !'

'হ্যাঁ, তাতে কী ? ও-টুকুন পথ আমরা মোটরে পার হয়ে যাব। পথে জালালগড় পড়বে, লোকে বলে জালালউদ্দিন খিলিজির ফোর্ট, তাও দেখা হয়ে যাবে-খন।'

'অত বাবুয়ানায় কাজ নেই। শেষকালে মোটর বিগড়ে যাক আর-কি ! ছেড়ে দাও ভাই, ঘরের ছেলে এখন ঘরে ফিরতে পারলেই বাঁচি। বেচারা জালালউদ্দিনকে মিছিমিছি জ্বালিয়ে আর কী লাভ ?'

কিন্তু কার সঙ্গে তর্ক করছি ! হঠকারিতাই হচ্ছে অমলের চরিত্রের বিশেষত্ব। সৎপরামর্শ কানে তো সে নিলই না, বরং উল্টে আমাকে ভিরু, নার্ভাস ইত্যাদি বলে ঠাট্টা করতে লাগল। ট্রেন ধরবার জন্যে একঘণ্টা আগে বেরুনো তার মতে উইকেটে দাঁড়িয়ে ব্লক করার মতই সমান অস্বস্তিকর। হয় এক বলে আউট, নয় তো ওভার-বাউণ্ডারি। কোন একটা দুর্ঘটনার কিছুমাত্র সম্ভাবনা না থাকলে কোন কাজেই তার হাত উঠে না।

তবে, কথাটা সত্যি, ছ-সাত ঘণ্টা কাটিহারে ওয়েটিং রুমে হাঁ করে বসে থাকা নরক-যন্ত্রণার চেয়েও ভয়ানক। স্টেশনে এমনি দশ-বারো মিনিট গাড়ি দাঁড়ালেই তো কান্না পেতে থাকে—তায় ছ-ছটা ঘণ্টা! তাও একেবারে একলা। ঠিক পাগল হয়ে যাব!

রাজি হয়ে গেলাম। প্রাচীন কালের দুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখবার লোভও যে না হচ্ছিল তা নয়। আমরা সামনে গিয়ে দাঁড়ালেই হয়ত সেই জালালগড় ঘিরে কত অস্পষ্ট স্মৃতি উথলে উঠতে থাকবে। সে এক বিস্ময়কর অনুভূতি।

অমল নিজেই ড্রাইভ করতে চায়। ভীষণ কথা! বললাম, 'তার চেয়ে বল আমি পিঠে বাক্স বিছানা বেঁধে পায়ে হেঁটেই এই চব্বিশ মাইল পাড়ি দিই! অনর্থক আমার রিটার্ন টিকিটটা নষ্ট করে তোমার পরকালের কী এমন লাভ হবে বল!'

অগত্যা গাড়ির খোদ ড্রাইভার—মোবারকই হুইল ধরে বসল। কিন্তু অন্তত দু-ঘণ্টা আগে তো বেরুনো উচিত; অমল বললে, 'এ বাবা ফোর্ড, উড়ে চলে যাবে—বন বল, বাদাড় বল, গর্ত বল, কিছুরই সে তোয়াক্কা রাখে না। এ তোমার মত বাবু মোটর-নয়, আমার মত মজবুত, বেপরোয়া। শব্দ করে চলে, শব্দ করে থামে।

হেসে বললাম, 'শব্দ করে না ফেটে গেলেই হয়!'

ট্যাঙ্ক ভর্তি করে দু-টিন পেট্রল নেওয়া হল,—সঙ্গে একটা ফালতু টায়ার, মবিল-অয়েল, কৃত্রিম উপায়ে স্টার্ট দেবার অন্যান্য সব যন্ত্রপাতি। মোবারক ড্রাইভ করবে—এই যা ভরসা। তবু সঙ্গে বাড়ির ছোট-ছোট কোন ছেলেপিলে থাকলে মনটা আরো সুস্থ বোধ করতাম, কেন না তাহলে অমলের দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি পেত, কোন রকম বাহবা নেবার দুঃসাহসিক কাজে চট্ করে ক্ষেপে উঠতে পারত না। গ্যারেজ থেকে মোটর বেরুতে দেখে ছেলেমেয়েদের দল চাক-ভাঙা মৌমাছির মত ওটাকে ছেঁকে ধরল, কিন্তু হাতের বন্দুক তুলে অমল সবাইকে তাড়া করলে।

বললাম, 'অন্তত রান্নুকে সঙ্গে নিয়ে চল, আবার তোমাদের সঙ্গে মোটরেই ফিরে আসবে।'

অমল শাসনের সুরে বললে, 'না, ওরা যাবে কী! এত দূরের রাস্তা, ওদের নিয়ে শেষকালে একটা বিপদে পড়ি!'

মন এতটুকু হয়ে গেল। বিপদের কথাটা অমলও ভুলতে পারছে না।

মোবারক স্টার্ট দিলে। বাড়ির সবাই দরজার সামনে ভিড় করে দাঁড়িয়ে বিষণ্ণ চোখে আমার চলে-যাওয়া দেখছে। আমারও মন বিমর্ষ হয়ে উঠল—এদের সবাইকে ছেড়ে যাচ্ছি বলে তত নয়, যত শুভে-লাভে কসবা পৌঁছুতে পারি কি না তারই চিন্তায়।

শহর ছেড়ে মোটর মাঠের মধ্যে নেমে এসেছে। শুধু মাঠ বলে সে-মাঠ বোঝানো যাবে না, উত্তাল সবুজ সমুদ্র বললে তার কতকটা আভাস পাওয়া যেতে পারে। ঝরঝরে ফোর্ড ঝাঁকুনি খেতে খেতে এগিয়ে চলেছে। হঠাৎ অমল বললে, 'চারদিকে কেমন সর্ষের ক্ষেত দেখছ—হলুদের বন্যা বয়ে যাচ্ছে!'

চোখ বুজে বললাম, 'কিন্তু সর্ষের ফুল দেখলেই সর্বনাশ!'

অমল হো হো করে হেসে উঠল। বললে, 'তোমার মত ভিতু আর কোথাও দেখি নি। এখনো ঢের সময়—ইচ্ছে করলে জালালগড় ডাক-বাংলোয় আমরা চা খেয়ে নিতে পারব। আর যদি যেতে যেতে দু-একটা স্নাইপ বা হরিয়াল চোখে পড়ে, তবে তো কথাই নেই—চমৎকার লাঞ্চ হয়ে যাবে।'

একমনে প্রার্থনা করতে লাগলাম—কোথায় বনের পাখি আছ, সব তোমরা উড়ে পালাও শিগ্‌গির! নইলে নিজেরা তো মরবেই, আমাকেও আর ট্রেন ধরতে দেবে না।

তবু কি-একটা গাছের মাথায় পাখির কলরব শুনে অমল মোবা-রককে মোটর থামাতে বললে। হায় সর্বনাশ! পাখির খোঁজে বন্দুক ঘাড়ে করে অমল এখন সারা বন টো-টো করুক! এতদিন এ জায়গায়

থেকে মনে যত ফুর্তি জমেছিল সব একটু-একটু করে উবে যেতে লাগল। মনে হচ্ছিল একদম এখানে না এলেই বুঝি ছিল ভাল।

যাক, অমল ফিরে আসছে। সামনে এসে বললে, 'গাছের ডালে একজোড়া ঘুঘু বসে। যাই বল, ঘুঘু মারতে আমার হাত কখনো ওঠে না। ভারি নিরীহ, আর কী সুন্দর করে যে ডাকে!'

কথা শুনে অবাক হয়ে গেলাম। ও যে দেখছি প্রায় বুদ্ধিমানের মত কথা কয়!

মোটর ফের ট্র্যাক ধরে ছুটে চলল। মোবারক মাঝে মাঝে গাড়ি থামায়, নেমে পড়ে কি-সব কল-কব্জা পরীক্ষা করে। অমলের দিকে চেয়ে দেখি ও নিশ্চিন্ত মনে এদিক-ওদিক পাখি খুঁজে বেড়াচ্ছে। যেন পাখি খুঁজে না পাওয়ার চেয়ে বড় কোন ব্যর্থতার কথা সে ভাবতে পারে না।

খানিক পরে মোটর আবার স্টার্ট নেয়। মনে মনে প্রার্থনা করছি, কসবায় গিয়ে কোনরকমে যেন ট্রেন ধরতে পারি। এখন তো এ জায়গাটা নেহাৎ বিশ্রী লাগছে,—ঠিকমত ভালোয় ভালোয় একে ছাড়তে পারলে হয়!

বললাম, 'ফোর্টে গিয়ে আর কাজ নেই। আর-একবার যখন এখানে আসব তখন দেখা যাবে-খন।'

অমল জোর গলায় বললে, 'এখানে অ্যাদ্দিন আছি, আমারই তা আজ পর্যন্ত দেখা হয়ে ওঠে নি। তুমি ফের আসতে আসতে ফোর্টের দেয়াল ধ্বসে যাবে। বুঝলে হে, সুবিধে হাতে এলে কখনো ছাড়তে নেই। হাতের একটা পাখি ঝোপের দুটো পাখির সমান। এত তুমি ঘাবড়াচ্ছ কেন? ট্রেন ছাড়তে পাক্কা এখনো এক ঘণ্টা। আর ঐ তো জালালগড়!'

দূর থেকে গড় হয়ে প্রণাম করছি—তাতে নিস্তার নেই। অমলের হুকুমে ট্র্যাক ছেড়ে মোটর একেবারে ফোর্টের ফটকের কাছে ঘুরে দাঁড়াল।

একরাশ ভাঙা ইটের স্তূপ, দেয়াল দীর্ণ করে নানা জাতের গাছ উঠেছে, মাথার ওপরে ছাত নেই, ভেতরে দস্তুরমত জঙ্গল। অথচ দুর্গের নামে এই জীবন্ত উপহাস দেখেও অমল নিবৃত্ত হল না, গদ্‌গদ হয়ে ইতিহাস আওড়াতে লাগল। কিন্তু আমি কোন্ জন্মে স্বয়ং জালালউদ্দিন খিলিজির সঙ্গে শত্রুতা করেছিলাম যে আজ আমাকে এই লাঞ্ছনা ভোগ করতে হবে!

মিনতি করে বললাম, 'তোমার এই গড়কে চিরকাল মাথায় করে রাখব, এবার চল, মোটরে উঠি গে।'

'রাখ। কেন এত ব্যস্ত হচ্ছ?' অমল আবার ধমক দিয়ে উঠল, 'তোমাকে টাইমে ট্রেন ধরিয়ে দিলেই তো হল! দাঁড়াও, গাড়ি থেকে বন্দুকটা নিয়ে আসি, একটা ধনেশ দেখা যাচ্ছে!'

অমলের পা বাড়াবার আগেই পাশের জঙ্গলে কি যেন একটা খসখস করে উঠল। চেয়ে দেখি, কান খাড়া করে প্রকাণ্ড একটা খরগোস ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাচ্ছে। মুহূর্তে অমলের কি হল, স্থান-কাল ভুলে সেও তার পিছে তাড়া করলে—বন্দুক নেবার সময় পর্যন্ত হল না। কিন্তু খরগোসের সঙ্গে ছুটে পারবে কেন বল! ভয় পেয়ে ও ফাঁকা মাঠের মধ্যে এসে পড়েছে বলেই অমল ওর পিছু নিতে পেরেছে,—ওটাকে না পাকড়ে ও ছাড়বে না। এমন পাগলামিও নাকি কাউকে পায়! দেখতে দেখতে দূরে কাশবনের মধ্যে অমল মিলিয়ে গেল। অসহায় চোখে চারিদিকে তাকাতে তাকাতে কষে হর্ন দিতে লাগলাম।

খানিক পরেই অমলকে দেখা গেল। ডান হাত দিয়ে খরগোসের পেছনের ঠ্যাং দুটোকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে ঠিক সে এগিয়ে আসছে অবাক কাণ্ড! সামনে এসে হাঁপাতে-হাঁপাতে সে বললে, 'একটা চি উড়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ ঝুপ করে খরগোসের ওপর ছোঁ দিয়ে পড়ল, আর আমি অমনি ছুটে গিয়ে ওর ঠ্যাং দুটো চেপে ধরলাম। শিগ্‌গির একটা দড়ি জোগাড় কর, মোবারক, ব্যাটার পা দুটো আগে বাঁধ্। ঘাড় বেঁকিয়ে আমার হাত কামড়াবার কেমন কসরত করছে দেখছিস!'

মোবারক গদি তুলে দড়ি বের করে আচ্ছা করে ওর পেছনকার পা-দুটো বেঁধে ফেললে। হাত থেকে মাটিতে ফস্‌কে পড়েও খরগোসটা বাঁধা পা নিয়ে ছুটতে চায়,—সমস্ত গা থেকে ওর তেজ ঠিকরে পড়ছে। সামনের খোলা ওর পা-দুটোতে তখনো সেই ক্ষিপ্রতার চেষ্টা, বড়-বড় লাল-লাল চোখে নির্বাক অনুনয়। দেখে ভারি মায়া করতে লাগল। বললাম, 'দে ওটার বাঁধন কেটে দে। ঢের হয়েছে—এবার ট্রেন পেলে হয়! মোটে আর পঁচিশ মিনিট।'

ব্যস্ততার ভাণ দেখিয়ে খরগোসটাকে তুলে ধরে অমল বললে, 'বাঁধন কাটব না ঘেঁচু। দস্তুরমত পোষ মানাব।'

মোবারক বললে, 'খেয়েও ফেলতে পারেন, ভারি মোলায়েম ওর মাংস।'

'না, কাটাকুটি নয়। জ্যান্ত ধরেছি বাবা, এ শিকারের জন্যে গুলি জখম করতে হয়নি। একেবারে তাজা, বনের টাটকা গন্ধ এখনো এর গায়ে ভুরভুর করছে। নে,এটাকে এখন কী করে বেঁধে-ছেঁদে নিবি তার ব্যবস্থা কর্ শিগগির। সময় আর বিশেষ নেই।'

মোবারকের পাছে দেরি হয় সেই ভয়ে নিজেই উদ্যোগী হয়ে বিছানার থেকে একটা ছেঁড়া কাপড় বের করে, দু-ভাঁজ করে আচ্ছা করে খরগোসটাকে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে ফেললাম। মোবারকের জিম্মা করে দিতেই অমল বলে উঠল, 'খুব জোরে মোবারক, গাড়ি ছাড়বার আর মোটে পনেরো মিনিট।'

যাকে বলে ব্রেক-নেক স্পীড,—ঠিক তেমনি, আকাশ থেকে তারা খসে পড়ার মতো সমান বেগে মোটর ছুটে চলল। ট্র্যাকের বাঁধন মানল না, চষা জমি, শাল্‌টির নড়চড়ে সাঁকো, জল-কাদা কোন কিছুরই আর বিচার নেই—মাইলের পর মাইল ভেঙে চলেছে। এই ছোটার ঝড়ের মধ্যে পড়ে কিছুক্ষণের জন্যে বন্দী, অবোলা খরগোসের কথা মনেই হল না। তাকে তার ছোটার থেকে কেমন জোর করে থামিয়ে দিয়েছি সে-কথা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নেই।

মনে মনে কেবল ত্রাহি-ত্রাহি ডাক ছাড়ছি—এবার মোটর বিগড়োলেই সোনায় সোহাগা। মোবারক প্রাণপণে গাড়ি চালাচ্ছে, অমলের মুখে আর কথা নেই। আমার চোখ রিস্ট-ওয়াচের সেকেণ্ডের কাঁটার ওপর কাঁটার মত লেগে আছে। যাক, কসবার বাজার শুরু হল—আর সাত মিনিট। যাক, এইবারে ঘুরেই ইস্টিশান।

অমল ঘাড় চাপড়ে বললে, 'কী, ঠিক সময়ে পৌঁছে দিই নি? ক-টা টায়ার বার্স্ট করল শুনি? এখনো ছ'াকা পাঁচ মিনিট বাকি, ইচ্ছে করলে এক-হাত পেশেন্স খেলে নিতে পার।'

মোটঘাট নামিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। 'কিন্তু প্ল্যাটফর্ম যে ফাঁকা! ট্রেন কই?'

অমল হেসে বললে, 'এটা হচ্ছে শাট্‌ল্ ট্রেন। দু-দিকের দু-স্টেশনের মাঝে কেবল যাওয়া-আসা করে। ওর তো আর তোমার মত খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই যে গাড়ি ছাড়বার দু-ঘণ্টা আগে থাকতে এসে বসে থাকবে! এসে আর ও এক মিনিট নষ্ট করতে চায় না।'

তাই হোক। কিন্তু দুটো পঁয়ত্রিশও পার হয়ে চলল, শাট্‌ল্ ট্রেনের দেখা নেই।

'হয়ত ট্রেন আজকে লেট।' অমল বুক চিতিয়ে বললে, 'স্বয়ং ট্রেনও আমার মত পাংচুয়াল নয়। কী, এখন বসে-বসে হাই তুলতে খুব ভাল লাগছে তো? বিছানা পেতে একবারটি গড়িয়ে নেবে নাকি?'

যতই কেন না ঠাট্টা করুক, ট্রেন আসবার আগে স্টেশনে যে পৌঁছুতে পেরেছি তাই ঢের।

কিন্তু মিনিটের কাঁটা কেবলই ঘুরে যাচ্ছে, ট্রেনের দেখা নেই।

স্টেশনের এক কর্মচারী আমাদের সঙ্গে জিনিসপত্র দেখতে পেয়ে কাছে এসে নিজে থেকেই শুধোলেন, 'আপনারা কোথায় যাবেন? কলকাতা? কিন্তু এই দুটো পঁয়ত্রিশের ট্রেন তো উঠে গেছে।'

'উঠে গেছে!' অমল লাফিয়ে উঠল, 'তার মানে? কাল পর্যন্ত লোক গেছে এ ট্রেনে।'

কর্মচারী বললে, 'হ্যাঁ, কাল গেছে, ঠিক আজ থেকেই এটা বন্ধ হয়ে গেল। সকালে অর্ডার এসেছে।'

চোখে-মুখে অন্ধকার দেখতে লাগলাম। বোজা গলায় বললাম, 'অর্ডার এসেছে তো আমাদের জানানো হয় নি কেন? রেল-কোম্পানির নামে মোকদ্দমা করব আমরা!'

কর্মচারী হেসে বললে, 'পাবলিককে নোটিস না-দিয়েই শাট্‌ল্ ট্রেন বন্ধ করা যায়। আসুন, নিয়ম দেখবেন চলুন। কোম্পানির সে এক্‌তিয়ার আছে।'

নিজে নিজের হাত কামড়াতে লাগলাম। কেন এমন হল? ট্রেনটা আজই সময় বুঝে উঠে গেল কেন? আসছে কাল উঠে যেতে তার কী হয়েছিল?

অমল বললে, 'আমাকে কিন্তু দোষ দিতে পারবে না। আমি তোমাকে ঠিক সময়ে পৌঁছে দিয়েছি যা-হোক। কাল পর্যন্ত ট্রেন ছিল। আমার খবর মোটেই মিথ্যা নয়।'

এমনি সময় মোবারক ন্যাকড়ায় বাঁধা খরগোসটা কাছে নিয়ে এল। বললে, 'বাবু, এটা সাবাড় হয়ে গেছে। একে চিলের ছোবল, আর যা উনি ওকে বেঁধেছেন,—বাঁচবে কেন!'

অমল ধমকে উঠল, 'বলিস কী? মরে গেল? আপনা থেকে মরে গেল?'

মোবারক বললে, 'না মরে আর কী করে বলুন? নিশ্বাস নেবারই ওর জায়গা ছিল না। তা যাক, চলুন, রাত্রে রোস্ট বানিয়ে দেব।'

মরা খরগোসটার দিকে তাকিয়ে ম্লান চোখে অমল বললে, 'না, খেতে হলে তো ওর গায়ে বন্দুকই ছুঁড়তে পারতাম। ও আপনা থেকে মরেছে—এখানে একটা জায়গা বেছে ওকে কোথাও একটা কবর দিই চল।' বলে ও আমার কাঁধের উপর হাত রাখল।

ট্রেন যে কেন ধরতে পারি নি বুঝতে আর বাকি রইল না। এখন বুঝতে পারছি বন্দী হওয়া কাকে বলে।

অমল ঠাট্টা করে উঠল, 'তোমার ট্রেন উঠে গেছে সকালবেলা, আর তুমি খরগোস বাঁধলে দুপুরে—এ দুটোর সম্পর্ক কোথায় ?'

তর্ক করা বৃথা, কিন্তু আমি স্পষ্ট অনুভব করছি যে খরগোসের উপর অমন নিষ্ঠুরের মত অত্যাচার না করলে কখনোই সকালবেলায় রেল-কোম্পানির ঐ মারাত্মক অর্ডার আসত না। সমস্ত গতিবেগ রুদ্ধ করে নির্জীবের মত বসে থাকার যে কী মর্মান্তিক যন্ত্রণা তাই এখন আমাকে সর্বাঙ্গ দিয়ে ভোগ করতে হচ্ছে। ফিরতি পথে আরো কী নতুন বিপদে পড়ি তার ঠিক নেই।

কবিতা

দূরযাত্রী

ঝড়ের হাওয়ায় মুখে এসে লাগে
টেউয়ের ছিটে,
মুখে এসে লাগে কণা-কণা·ফেনা
নোন্‌তা মিঠে।
উতল উছল উথ্‌লেছে জল
উড়ছে ঝড়;
আজ আমাদের নৌকায় ভাই
নাই নোঙর।

সার বেঁধে বসে দাঁড় তুলে নিই,
উড়াই পাল,
সমুখে মোদের কূল নাই, শুধু
আগামী কাল।
সাগর-পাখিরা এলানো ডানার
হানে ঝাপট,
সাহসে বিশাল স্ফীত আমাদের
বক্ষতট।

আলোর ইসারা নাই এতটুকু,
না থাক তারা;
স্নায়ুতে শিরায় শুধু যাত্রার
প্রখর সাড়া।
সার বেঁধে বসে দাঁড় টানি মোরা,
উড়াই পাল,
দুই চোখে আশা, দুই বাহু-ভরা
বল বিশাল।

বেগে উজ্জ্বল ছুটছে এ জল
অহর্নিশ,
ভয় করিনাকো, আমরা নাবিক
ইউলিসিস।
খুঁজি নাকো পার, বিশ্রামাগার,
খুঁজি না দিক,
শুধু যাত্রার আনন্দে মোরা
জল-পথিক।

তার তরে মোরা পাড়ি মারি ভাই,
উড়াই পাল,
ছুঁটো হাত মেলে সহজে যাহার
নাই নাগাল।
তোমাদের তরে থাকুক নিঝুম
শ্যামল মাটি,
ঠাণ্ডা দাওয়ায় বিকেলে বিছানো
শীতল-পাটি।

বিছানায় থাক নরম চাদর,
চাঁদের ছিটে,
ছোট করে রাখো নিজের পরিধি
কাঠে ও ইঁটে।
উত্তাল ঢেউয়ে পাড়ি দিই মোরা,
উড়াই পাল,
তোমাদের ঘিরে চারিদিকে থাক
ঘন দেয়াল।

সার বেঁধে বসে দাঁড় হেনে জল
করছি ঘোলা
উপরে ঝড়ের, নিচে সাগরের
নাগর-দোলা।
জলতল হতে হাঙর কুমির
মারছে ঘাই,
প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর সাথে
করি লড়াই।

সার বেঁধে বসে দাঁড় টানি মোরা,
উড়াই পাল,
ঢেউ-ভুজঙ্গ মারছে ছোবল,
ডাকে কোটাল।
জীবনের স্বাদ বুঝলুম ভাই
আমরা বরং
জলতরঙ্গে বাজাই আমরা
জলতরঙ।

দূর বিদেশের মাটির গন্ধ
লাগছে ন্যাকে,
কোন্ আকাশের ধূসর তারাটি
মোদের ডাকে।
তারি সন্ধানে পাড়ি মারি মোরা,
উড়াই পাল,
দাঁড় বেয়ে মোরা বাধা নিষেধের
ভাঙি আড়াল।

ম্যালেরিয়া কাব্য

আগে দুটো হাই তুলে আলগোছে মারি তুড়ি,
তারপরে টান হয়ে হাতে-পায়ে মোড়ামুড়ি ;
গিঁটে-গিঁটে মিঠে ব্যথা, গা-গতর ভার-ভার,
জ্বর আসে, জ্বর আসে, জ্বর আসে দুর্বার।

জ্বর আসে, ট্রেন আসে গাছ-পালা কাঁপায়ে,
জ্বর আসে, গুলি-খাওয়া বাঘ আসে লাফায়ে ;
জ্বর আসে, ঝড় আসে, আসে ভূমিকম্প,
ঢাক বাজে, ঢোল বাজে, বাজে জগঝম্প।

চারদিকে ধামসিয়ে দিয়ে দে রে ধম্বল
আন্ লেপ পাঁচখানা, সাতখানা কম্বল,
ধুকুড়ি নেকুড়ি সব আন্ ছেঁড়া কন্থা,
কিছুতেই এ-শীতের নেই প্রতিহন্তা।

যার যা রয়েছে ঘরে সকলেরে বঞ্চি,
তোশক জাজিম চট আন্ সতরঞ্চি,
খুলে আন্ বালাপোষ শাল-লুই আলোয়ান,
দলে-দলে আয় সবে ভীমসেন পালোয়ান।

ফাঁপর কাপড়-স্তূপে,
ধর্ সবে চেপে-চুপে
যত আছে হাতে জোর
চেপে ধর্ বেওজর

ঠেসে ধর্ ঠুসে ধর্
ভেঙে পড়ে মহীধর
উড়ে যায় বাড়িঘর
অবস্থা গুরুতর।
তবু তো থামেনা কাঁপা
দে তবে টেবিল চাপা
নিয়ে আয় তাড়াতাড়ি
বই-ভরা আলমারি ;
চাপা দে চালের ছালা
সব মোর উপরালা।
পড়ে ভেঙে কড়িকাঠ
নিয়ে আয় দড়িখাট
ছাড়ে নাড়ী, ছেঁড়ে রগ
শ্মশানের ক্যাটেলগ !

মরে গেছি ? —নারে না—শুধু ভুল বকছি
দাঁতে দাঁতে ঠোকাঠুকি হাড়ে ঠকঠকছি।
শুধু ভুল বকছি।
তুই চাস আস্ত ? তোকে দেব খণ্ড,
বৃক্ষের দেশে তুই হবি যে এরণ্ড।
তুই চাস আদ্ধেক ? তোকে দেব আস্ত,
নেংটির সাথে 'টাই' হবে বরদাস্ত।
দুজনেই ডুববি
মোরে না রাখিস যদি তোদের মুরুব্বি।
আমি অতি নিষ্কাম অতি নিরপেক্ষ
মামলা মিটিয়ে দেয়া মোর শুধু লক্ষ্য
(হবেই একটু তাহা ব্যয়সাপেক্ষ)

নষ্টের ঝালিশ-ই,
আমি না থাকলে পরে করবে কে সালিশি ?
অর্থ না আস্ত
আমি ছাড়া শুনবে কে হর-দরখাস্ত ?
ততদিনই থাকছি
যতদিন না মেটাস আকচা-ও-আকচি
শুধু ভুল বকছি।

জল আন্ জল ঢাল্ দে রে জলধারানি
শ্রাবণের বর্ষণ, চোখে ঘুমপাড়ানি।
ডাক্তার কবরেজ হাতুড়ে ও ভুঁইফোঁড়
আয় সবে পাছড়িয়ে ধরে মোটা সুঁইফোঁড়!

দিয়েছে দিয়েছে ঘাম
শ্যাম আসে প্রাণারাম
শিশির ঝরিছে ঘাসে
নদীতে জোয়ার আসে
নতুন ব্যারাম কি যে
একদম গেছি ভিজে
টেবিল চেয়ার সরা
আলমারি বই-ভরা
সরা যত কাঁপা-লেপ
সব কর্ সংক্ষেপ
ছেড়ে দে গোবর-গামা
খুলে দি গায়ের জামা
ভেঙেছে জলের ঠিলি
থেমে গেছে ইলিবিলি।

ছেড়ে দে রে উঠে বসি
কোমরের বাঁধি কসি
জ্বরের কী টেকনিক
খিদে পায় ঠিক ঠিক।

যা বৃষ্টি থেমে যা,
যা জ্বর নেমে যা,
নেবুর পাতা করমচা
টাটকা মুড়ি গরম চা।

কুইনিন খেয়ে খেয়ে গাল-গলা তিক্ত,
পেট নয়, জয়ঢাক হেঁট অতিরিক্ত
হাড়গুলি বের-করা চোলছুটি গর্তে
ভূত নই, বেঁচে আছি তার পরিবর্তে।

হস্তীর বৃংহিত, সিংহের গর্জন
অশ্বের হ্রেষা আর ব্যাঘ্রের লম্ফন,
রাসভের সঙ্গীত, হুইসিল এঞ্জিন,
ভীষণ সবার চেয়ে মশাটির পিনপিন।

মশা রে মশা,
করেছিস কী দশা!
কামান দেগেও নেইকো রে তোর ধ্বংস
বংশ-পরম্পরায় মোরা খাচ্ছি রে তোর দংশ
এখন শুধু অ্যাটম-বমই ভরসা
ছাগল-ছাড়া একেবারে সবাই হব ফরসা।

কুটির

ঝিকিমিকি দেখা যায় সোনালি নদীর,
ওইখানে আমাদের পাতার কুটির।
এলোমেলো হাওয়া বয়,
সারাবেলা কথা কয় ;
কাশ ফুলে ছুলে ওঠে নদীর ছু-পার,
রুপসীর শাড়ি যেন তৈরি রুপার।

কুটিরের কোল ঘেঁষে একটু উঠোন,
নেচে নেচে খেলা করি ছোট ছুটি বোন।
পরনে খড়কে ডুরে,
বেণী নাচে ঘুরে ঘুরে,
পায়ে পায়ে রুনু-ঝুনু হালকা ঘাড়ুর,
কেন নাচি নাই তার খেয়াল কারুর।

আকাশে গড়িয়া ওঠে মেঘের মিনার,—
তারি ফাঁকে দেখা যায় চাঁদের কিনার।
গাছের পাতার ফাঁকে
আকাশ যে চেয়ে থাকে,
গুন-গুন—গান গাই চোখে নাই ঘুম।
চাঁদ যেন আমাদের নিকট কুটুম।

তুই পা এগিয়ে এসে উঠোন-টুকুর
তালবনে ঘেরা দেখ মোদের পুকুর।
ভরে আছে চারিভিতে
শাপলা ও কল্মিতে,
জলটুকু টল্‌টল্‌ চাউনি খুকুর,—
যেন গো মেঘের এক-টুকরো মুকুর!

নৌকোরা আসে যায় পাটেতে বোঝাই,
দেখে কী যে খুশি লাগে কী করে বোঝাই।
কত দূর দেশ থেকে
আসিয়াছে এঁকে-বেঁকে,
বাদলে 'বদর' বলে তুলিয়া বাদাম।
হাল দিয়ে ধরে রাখে মেঘের লাগাম।

ওই শোন ঝম্‌-ঝম্‌ নামিল বাদল,
হুঁকো ছেড়ে মাল্লারা ধরেছে মাদল;
লাল ফুল টোকা-পানা
আহ্লাদে আটখানা;
ধলি গাই ডাক ছাড়ে—বাছুর ফেরার,
থম্‌কে দাঁড়িয়ে আছে ঝুম্‌কো-বেড়ার।

আবার ঝলক দিয়ে ঝরিছে আলোক,
বল্‌কা দুধের মত বকের পালক।
পিড়িং শাকের ক্ষেতে
ফড়িং উঠেছে মেতে,
লাউয়ের মাচার পরে ঘুমোয় কুমোড়,
শিশিরের স্বাদ যেন মায়ের চুমোর।

দু-কদম হেঁটে এস মোদের কুটির,—
পিলসুজে বাতি জ্বলে মিটির মিটির।
চাল আছে ঢেঁকিছাঁটা,
রয়েছে পানের বাটা,
কলাপাতা ভরে দেব ঘরে-পাতা দই
এই দেখ আছে মোর আয়না কাকই।

যদি আস একবার, বলি—মিছা না,
মোদের উঠানটুকু ঠিক বিছানা।
পিয়াল, পেয়ারা গাছে—
ছায়া করে রহিয়াছে;
ধুঁধুলের ঝাঁকা বেয়ে উঠিতেছে পুঁই,
খড়কুটো খুঁজে ফেরে দুষ্টু চড়ুই।

মুদির দোকান আছে অতি নিকটেই
তামাক লাগিয়ে সেথা যাব তো বটেই।
এখো গুড়, সাবুদানা,
পাথরে মিছরি-পানা
যদি চাও এনে দেব পাকা পাকা বেল।
টসটসে জামরুল আনিব অঢেল।

কুঁকড়ে রয়েছে ঘুম-কাতুরে কুকুর।
থেকে-থেকে শোনা যায় কাঁদন ঘুঘুর।
বসে বসে কাটি টাকু,
সুতো ওঠে আঁকু পাঁকু।
বেনে বউ পাঁজ দেয়, মা বুনেন তাঁত।
নিঝুম দুপুর বেলা খাসা মৌতাত।

এস এস আমাদের সোনার কুটির,—
ঝিকিমিকি করে জল নিটোল নদীর।
ঝিঙের শাখার পরে
ফিঙে বসে খেলা করে,
বেলা যে পড়িয়া এল, গায়ে লাগে হিম,
আকাশে সাঁঝের তারা, উঠানে পিদিম।

বস্ত্র

পুজো গেল, ষষ্ঠী গেল, জুটল নাকো বস্ত্র,
যে-খান আছে, জায়গা নাহি ফোঁড়ে সীবন-অস্ত্র
মরতে তবু করছি দেরি হায় যতদূর সাধ্য,
মরলে এখন, ভরসা নাহি, হবে যে আর শ্রাদ্ধ।

ছাত্র

জীবনটা কি কাটবে শুধু বেঞ্চিতে ও ডেস্কে ?
মাঝে মাঝে দেখো তোমার দুর্গত এই দেশকে

খাদ্য

ভগ্ন দেহ ক্লান্ত শ্বাস
বদ্ধ ঘরে ছিন্ন বাস
রুক্ষ অন্ন শূন্য নুন
অদ্য ভক্ষ্য ধনুর্গুণ।

দিক

কয় দিক আছে ? দশ দিক। তবু
জবাব হল না ঠিক।
এক দিক শুধু আছে, তার নাম
তোমার দেশের দিক।

দেশ

যখন যেটুকু করো
ছোট কাজ কিংবা বড়
দেখো কোথা শেষ,
বহু লোক বহু চায়,
দেখো যেন পঁহুচায়
যেথা তব দেশ।

লেখা

আকাশ লিখিছে লেখা রৌদ্রে পুড়ি আর জলে ভিজি,
তুল্যমূল্য আমাদেরো এইসব তুচ্ছ হিজিবিজি।

গ্যাঁড়াতলা

ওরে ন্যাপা, ন্যাড়া, ভোলা,
চল্ যাই গ্যাঁড়াতলা।
ট্যারা চোখ, ঘাড় চাঁছা,
নেই কোঁচা নেই কাছা।
শুধু কাঁচি ছুরি ছোরা
টাকা মারি কুড়ি তোড়া।
অলিগলি জিগ-জ্যাগ
তুলে নিই মনি ব্যাগ।
বাবু কত ঘুরিছেন,
তুলে নিই ঘড়ি-চেন।
কান ধরে মারি টান
দুল পাই চারিখান।
মারি টান চুড়ি-হার,
সাথে আছে জুড়িদার।
কিছু নাই ভর-ভর
সবে জানে কয় ঘর।

দারোগা তো গাধা ঘোর
সকলেই গাঁজাখোর।
এ উহারে উসকায়
যত দাও ঘুষ খায়।
একজোটে কয় শালা
করি ভাগ-ফয়সালা।
একি ভীম গদাঘাত,
এক কোপে কুপোকাৎ।
মুখে সব এক ডাক
সকলেরই ট্যাঁক ফাঁক।
কোন্ চোর ছিঁচ্কে
টান্ লিয়া খিঁচকে
যার যত রোজগার—
কে কোথায় খোঁজ কার!
চোর পর জুয়োচুরি
এ যে দেখি কুয়ো চুরি!

সেই থেকে নাকে খত,
পড়ি শুধু ভাগবত।

প্রবন্ধ

ছোটবেলা

নারকেল গাছের বাইল আমাদের ব্যাট, পেয়ারাগাছের ডাল আমাদের স্টাম্প আর চাল-ভরা ন্যাকড়ার পুঁটলি আমাদের বল। চলত ক্রিকেট খেলা। আর 'ঢেঁকি'-পাতা ছিঁড়ে-ছিঁড়ে স্কোর-গোনা হত। দু-রকম বাউণ্ডারি আছে, আণ্ডার আর ওভার। আমাদের খেলায় আরো একটা বাউণ্ডারি ছিল, সেটা হচ্ছে লস্ট বল। বল যদি খুঁজে না পাওয়া যেত, তবে একসঙ্গে দশ নম্বর। মাঠ ছোট, চারদিকে ঝোপ-ঝাড়, বন-বাদাড়। তেমন লাগসই হাঁকড়াতে পারলেই লস্ট বল। কোনক্রমে যদি খুঁজে পাওয়া যেত, তবেই মারের মাহাত্ম্য যেত কমে, দশ নম্বরের বদলে জুটত ছয় নম্বর, নিচু দিয়ে গিয়েছে প্রমাণ হলে চার। বল জঙ্গলে গিয়ে পড়লে বিপক্ষ দলের চেষ্টা থাকত যে-করে হোক বলটা খুঁজে বের করা আর স্বপক্ষ দলের চেষ্টা থাকত বলটাকে গুম করা, মানে সত্যি-সত্যি লস্ট করে দেওয়া। কতক্ষণ খোঁজাখুঁজি করতে হবে তার কোন সময়-নির্দেশ ছিল না বলে দু-দলে বড়ই অবনিবনা হত। শেষকালে ক্রিকেট না খেলে শুরু হত বল-খোঁজাখুঁজি খেলা।

প্রত্যক্ষে পরোক্ষে এত বেশি লস্ট বল হতে লাগল যে জমল না ক্রিকেট। মাতলাম ফুটবল নিয়ে। ক্রিকেটে অনেক সরঞ্জাম লাগে, ফুটবলের পক্ষে লাথাবার মত একটা জিনিস পেলেই চলে যায়। তা নারকেলের ছোবড়াই হোক, বা কারু পরিত্যক্ত চটিজুতোই হোক। ক্রিকেটের চেয়ে ফুটবলে আরো সুবিধে, সব সময়ে মাঠ লাগে না। ঘরে ও বারাণ্ডাতেও, অনায়াসে না হোক অল্পায়াসে ফুটবল খেলা যেতে পারে। আরো সুবিধে, দুটি মাত্র লোক হলেই চলে যায়। যদিও প্রায়ই সেটা ফুটবল ছেড়ে ঘুষোঘুষিতে পর্যবসিত হয়। ফুটবলের পরে বক্সিংটাই বা মন্দ কী।

পদাঘাতযোগ্য কোন জিনিস মাটির উপর পড়ে আছে অথচ একটা কিক করছি না বা পাশ করছি না বা গোলে শট নিচ্ছি না, এ কল্পনা করাও দুঃসাধ্য। রাস্তা দিয়ে চলতে-চলতেও ঢিল-পাটকেল ড্রিব্‌ল্ করেছি, ডজ করেছি অনেক পথচারীকে। দুর্ঘটনাও ঘটে নি এমন নয়। রাস্তায় ফুটবল খেলতে গিয়ে ইটে শুট করে পায়ের হাড্ডি ফুড়ুক ফাঁই।

তখন আমাদের অনেক উন্নতি হয়েছে। বারান্দা ছেড়ে উঠোন ও উঠোন ছেড়ে মাঠে নেমেছি। নারকেলের ছোবড়া ছেড়ে ধরেছি বাতাবি লেবু। গাছে গাছে দড়ি বেঁধে বানিয়েছি গোলপোস্ট। গর্ব আর ধরে না। এবার সত্যিকারের বল হয়েছে। গোল বল।

কিন্তু সেটাও যে সত্যি হীন দশা, বুঝতে পারলাম একদিন। আমাদের মাঠের লাগ-দক্ষিণেই রাস্তা, সাদা মাটির রাস্তা, গিয়েছে বঙ্কিম পশ্চিমে শ্মশান পেরিয়ে শ্যামলতর গ্রামান্তের দিকে। একদিন দেখলাম সে-রাস্তা দিয়ে জেলার কালেক্টর সাহেব ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন। আজকালকার কালেক্টর সাহেবরা মোটরে চড়ে বেড়ান বলে তাঁদের মহিমা আর তত চোখে পড়ে না। কিন্তু সেদিনের সেই দৃপ্ততা এখনো চোখে ভাসছে।

দেখলাম আমাদের খেলা দেখে তিনি ঘোড়া থামিয়েছেন। ভয় না পেয়ে কৌতূহলী হলাম। তিনি আমাদের কাছে ডাকলেন। তবু আমরা ভয় পেলাম না। ভদ্র-অভদ্র যারা ছিল আশে-পাশে, তারা চাণক্যকেও টেক্কা মেরে শত হস্ত ছেড়ে সহস্র হস্ত দূরে দাঁড়িয়ে সেলাম ঠুকতে লাগল, আর আমরা নির্ভয়ে এগিয়ে গেলাম। সেটা সেদিন কম বাহাদুরি ছিল না। ভাঙা বাঙলায় তিনি জিগগেস করলেন আমাদের এই দুর্দশা কেন, কেন বলের অভাবে ফল পিটছি। সংক্ষেপে বললাম, 'আমাদের পয়সা কোথায়! কালে-ভদ্রে দু-এক পয়সা যা পাই তা দিয়ে হিন্দু-রুটি কিনি, কিনি ঝাল-বাদাম।' তিনি বললেন তিনি আমাদের বল কিনে দেবেন। যেতে বললেন কুঠিতে

ইংরিজিতে একটা দরখাস্ত লেখাতে হয়। ক্ষিতীশদা (নামটা বদলে দিলাম) আমাদের খুব ভালবাসেন, তাঁরই শরণাপন্ন হলাম। ভাবলাম এই সুযোগে আমরা একটা ক্লাব ফেঁদে ফেলব, বেরুব খাতা নিয়ে। সাহেব টাকা দিয়েছে দেখলে অনেক মোসাহেবই টাকার থলি খুলে ধরবে, আমাদেরকে অপদার্থ ভেবে হেনস্তা করবে না। চাই কি, ফুটবলের সঙ্গে সঙ্গে ক্রিকেট আর ব্যাডমিণ্টনও আমাদের হয়ে যাবে। এমনকি ইউনিফর্ম পর্যন্ত। সুখস্বপ্ন দেখতে লাগলাম।

ক্ষিতীশদা যে-তিনবার ম্যাট্রিকুলেশনে ফেল করেছেন, তিনবারই অঙ্কে করেছেন। ইংরিজিতে তাঁর চোস্ত হাত, একটি কমা-ফুলস্টপ পর্যন্ত এদিক-ওদিক হয় না। মুখে যা বলেন, যেন খই ফুটছে। তিনি বললেন, 'আমি লিখে দেব তোদের পিটিশন।'

ক্ষিতীশদার নামডাক খুব, এমন করিয়ে-কর্মিয়ে ছেলে দেখা যায় না। তিনি কোন কাজে হাত দিলে সে কাজ অসম্পূর্ণ থাকে এ আমরা ভাবতেই পারতাম না। তবু কেন যে তিনি বারে-বারে অঙ্কে ফেল করতেন ভাবলে আমাদের কষ্ট হত। তিনি বলতেন, 'দুঃখ করিস নে, এবার এমন কায়দায় টুকব কিছুতেই আর ধরা পড়ব না।'

ফলাও ইংরিজিতে পিটিশন লিখে দিলেন ক্ষিতীশদা। দল বেঁধে গেলাম সাহেবের কুঠিতে। দেখলাম সেদিনের সেই বন্ধুতার ওপারে বন্ধ গেটের বাধা পড়েছে। দারোয়ান ঢুকতে দিচ্ছে না। বললাম, 'এই খাতাখানা শুধু নিয়ে যাও সাহেবের কাছে।' অনেক কাকুতি মিনতি করে রাজি করালাম দারোয়ানকে। যাকে বলে পত্রপাঠ উত্তর, তেমনি ঝটিতি দারোয়ান ফিরে এল। দেখলাম, পিটিশনের পৃষ্ঠায় লম্বা করে কোণাকুণিভাবে একটা লাল পেন্সিলের ক্রুদ্ধ দাগ টানা হয়েছে। সেই দাগটা তীরের মত বুকে এসে বিঁধল। জিগগেস করলাম, 'ব্যাপার কী?' হতভম্ব দারোয়ান বললে, 'আমি তার কী জানি।'

রহস্য সমাধান করতে দেরি হল না। শুনলাম সেই দরখাস্তে দশটা বানান ভুল আর বারোটা ব্যাকরণের অশুদ্ধি।

জীবনে বিতৃষ্ণা এসে গেল। বলং বলং বাহুবলং, ঠিক করলাম দিশি মতে কুস্তি লড়ব। দরকার নেই ওসব বিদিশি খেলায়, বিনে পয়সায় বালি-সুগ্রীবের যুদ্ধই ভাল। কিন্তু কুস্তির জন্যে আখড়ার দরকার, আর আখড়া হওয়া চাই নিরিবিলি জায়গাতে। জায়গা কোথায়?

পুকুরপারে আমাদের মস্ত বাগান। অনেক রকম গাছ, ঢ্যাঙা আর বেঁটে মোটা আর লিকলিকে, তার মধ্যে নারকেল-শুপারিই বেশি। ঘুরে ঘুরে সার্ভে করে উত্তর পারে একটা জায়গা বাছা হল, বেশ গাছে-ঘেরা ছায়া-করা জায়গাটি। কিন্তু এখানে আখড়া পাততে হলে কয়েকটা শুপুরি-চারা কেটে ফেলতে হয়। উপায় নেই, দা দিয়ে নির্মম হাতে কচি শিশু গাছগুলি একে-একে নির্মূল করে ফেললাম।

সেদিন যে কী ভীষণ মার খেয়েছিলাম তা বলে বোঝাতে পারব না। যিনি মেরেছিলেন তাঁকেও বোঝাতে পারি নি শুপুরি গাছের চেয়েও কত বড় সম্ভাবনা আমাদের মধ্যে ছিল হয়ত লুকিয়ে। গাছের থেকেই ফলের আকাঙ্ক্ষা না করে আমাদের থেকেও যে করা যেত সে কথা বলি কাকে। কেঁদেই কূল পাচ্ছি নে। তবু, বাগানের মালী একে-একে যখন চল্লিশটা কাটা শুপুরি-চারা এনে উঠোনে হাজির করল, মনে হল ওদের কান্না আমার কান্নাকেও হার মানিয়েছে।

খেলাধুলো ছেড়ে দিয়ে চুপ করে বসে রইলাম। এমন সময় ক্ষিতীশদা এসে বললেন, 'ভাবিস নে, তোদের জন্যে কলকাতা থেকে ব্যাডমিণ্টনের ব্যাট নেট ফেদার সব আনিয়ে দিচ্ছি।' ক্ষিতীশদাকে অবিশ্বাস করতে পারি এমন আমাদের সাধ্য নেই। তা ছাড়া এবার তিনি অঙ্কেও পাশ করে ম্যাট্রিকুলেশন ডিঙিয়ে গিয়েছেন। তাঁর অবস্থা ভাল, এবং তারই জন্যেই পরীক্ষার গার্ডকে এবার ভারি হাতে খাইয়েছেন বলে গুজব উঠেছে। তাই তাঁর প্রস্তাবে আমরা নেচে উঠলাম। তিনি এক পয়সা দিয়ে একখানা পোস্টকার্ড কিনে এনে কলকাতার খেলার দোকানে লিখে পাঠালেন চারটে ব্যাট একটা নেট

আর এক ডজন ফেদার পাঠিয়ে দিতে। ভরসা দিয়ে বললেন, 'ইংরিজি ভুল হলেও ভয় নেই, ব্যবসাদাররা বানান দেখে না।'

ভরসা পেলাম, সন্দেহ নেই। মহা উৎসাহে কোর্ট বানিয়ে ফেললাম, ক্ষিতীশদা নিজে কোদাল ধরলেন। রোজ পোস্টাপিসে যাই, শুনি আসে নি। তবু দমি না। ক্ষিতীশদা স্বহস্তে চিঠি ফেলেছেন ডাকবাক্সে, না এসেই পারে না। মনে হত, রোদে বৃষ্টিতে রোজ যে দু-মাইল পথ হাঁটি, ও-আগ্রহেই জিনিসগুলি ঠিক এসে পড়বে। কলকাতা থেকে না পাঠালেও এসে পড়বে আমাদেরই প্রতীক্ষার তীক্ষ্ণতায়।

বিশ্বাস করবে কি, সত্যি-সত্যিই একদিন তারা এল— ব্যাট, নেট, ফেদার; মস্ত একটা চটের মোড়কে প্যাক হয়ে। আমরা তো লুফে নেবার জন্যে পাগল। কিন্তু পিওন বললে, টাকা দিয়ে ছাড়িয়ে নিতে হবে। এ কী অসম্ভব কথা! জিনিস এসে গেছে, এখন আবার টাকার লেন-দেন কী! 'বুঝবে না তোমরা, ভি. পি. এসেছে,' বললে পিওন। 'অনেক টাকার ভি-পি। কে দেবে তোমাদের মধ্যে? বয়েজ ইউনাইটেড ক্লাবের সেক্রেটারি কে?'

পরস্পরের মুখ-চাওয়া-চায়ি করতে লাগলাম। আমাদের ক্লাবের তো পাকাপাকি কোন নাম নেই! মুখ-চলতি একটা বাঙলা নাম ছিল, পশ্চিমপাড়া। সেটা ইংরিজিতে বানান করি এমন আমাদের সাধ্য নেই। আমাদের আবার সেক্রেটারি কে?

বুঝলাম ক্ষিতীশদাই নতুন ক্লাবের পত্তন করেছেন, আর ইংরিজিতে বিশেষ তিনি রপ্ত বলে ক্লাবেরও নাম দিয়েছেন ইংরিজি। সন্দেহ কি, তিনিই আমাদের সেক্রেটারি।

'থাকে কোথায়?'

'ফকিরতলা। দিঘির পার।'

সেদিকে পিওন যাবে সকলের শেষে, আর-আর পাড়া ঘুরে, কালীতারা নাগপাড়া তালতলা চক্কর দিয়ে। বললাম, 'আমাদের

আগে সেরে দাও না পার করে। আমরা তবে দুপুর থেকেই খেলা শুরু করে দি।'

আমাদের কথা শুনবে পিওন এমন হেঁজিপেঁজি নয়। তার মাথায় পাগড়ি, গায়ে লম্বা কোট, কোমরে কোমরবন্ধ। আর আমরা ছেঁড়া জামা গায়ে খালি পায়ে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছি। উপায় নেই, ঘুরছি পিওনের পায়ে-পায়ে, দরজা থেকে দরজায়। মাঝে মাঝে ব্যাটের প্যাকেটটা যে আমাদেরকে পিওন বইতে দিচ্ছে তাতেই আমরা ইহজন্মের মত কৃতার্থ বোধ করছি। আঙুল দিয়ে-দিয়ে অনুভব করছি, কখানা ব্যাট, নেটটা কী ভাবে গুটিয়ে রয়েছে, ফেদারগুলি না-জানি কোথায়! হাতগুলি শিহরিত হচ্ছে। চোখে আনকোরা স্বপ্ন, কতক্ষণে সে সোনার বিকেল এসে দেখা দেবে।

হা-ক্লান্ত হয়ে পৌঁছলুম ফকিরতলা। এই ক্ষিতীশদাদের বাড়ি। ঐ ক্ষিতীশদার ঘর। মাটির মেঝে, বাঁশের বেড়া, টিনের চাল। বড় বেশি যেন চুপচাপ দেখাচ্ছে! তবে কি ক্ষিতীশদা বাড়ি নেই? না, আছে, ঘরের মধ্যে ঘুমিয়ে আছে লেপমুড়ি দিয়ে। দেখলাম, ভিতর থেকে দরজায় খিল দেওয়া। একবার ক্ষিতীশদার ঘুম ভাঙিয়ে দিতে পারলে হয়! বিস্ময়ের ঘোর কাটতে-না-কাটতেই চোখে লাগবে তাঁর নতুন চমকের ঝলকানি।

কিন্তু 'ক্ষিতীশদা, ক্ষিতীশদা,' গলা ফাটিয়ে হাঁকাহাঁকি করছি, ক্ষিতীশদার সাড়াশব্দ নেই। চারপাশের লোক এসে জড় হচ্ছে অথচ ক্ষিতীশদার ঘুম ভাঙছে না। দমাদ্দম ঢিল পড়ছে টিনের চালে, বেড়ার গায়ে, তবু অব্যাহত সেই স্তব্ধতা।

পিওন বললে, 'হাওয়া হয়ে গেছে।'

সত্যি, সন্দেহ করবার কারণ ঘটেছে, রীতিমত। বেড়ার ফাঁক দিয়ে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে আগাপাস্তলা লেপমুড়ি দিয়ে ক্ষিতীশদা শুয়ে আছেন, অথচ এতক্ষণে একবারও পাশ ফেরেন নি, নড়েন নি একচুল। এত শব্দেও তাঁর এতটুকু স্পন্দন নেই। সবাই বলাবলি করতে লাগল,

ছেলেটা নিশ্চয়ই মরে রয়েছে। হয় খুন, নয় আত্মহত্যা, নয় তো ঘুমের মধ্যে হার্টফেল।

আর দ্বিধা নেই, দা নিয়ে এসে ছোট-ছোট বেতের বাঁধন কেটে দিয়ে বেড়ার একদিকটা ফাঁক করে ফেললাম। ঢুকলাম সবাই হুড়মুড় করে। এক হেঁচকা টানে তুলে ফেললাম লেপটা। হা হতোস্মি! ক্ষিতীশদা কোথায়! একটা তাকিয়া ও একটা পাশ-বালিশ লেপের তলায় এমনিভাবে সাজিয়ে রাখা হয়েছে যে মনে হচ্ছে ঘুমন্ত একটা গোটা মানুষ। সেই বেঁটে-খেঁটে গুরগুটে ক্ষিতীশদা।

কিন্তু ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে ক্ষিতীশদা পালাল কী করে? সন্ধান পেতে দেরি হল না। কয়েকদিন আগে ক্ষিতীশদার ঘরে চোরে সিঁধ কেটেছিল, সেই সিঁধ আর বোজানো হয় নি। সেই সিঁধ দিয়েই ক্ষিতীশদা সরে পড়েছেন।

বাইরে এসে দেখি পিওনও নেই। সেও হাওয়া হয়ে গিয়েছে।

সেই থেকে খেলা আর জোটে নি অদৃষ্টে। জুটেছে তার উল্টোটা। লেখা। শুধু লিখছি আর লিখছি। জবানবন্দী আর রায়, গল্প আর উপন্যাস, আরো কত কী।

কিশোর রবীন্দ্রনাথ

হিমালয়ে এসেছে রবীন্দ্রনাথ।

আকাশের দিকে তাকাও। পর্বতশিখরের স্বচ্ছ আকাশ। অম্লান অক্ষরে জ্বলছে কেমন তারাগুলো!

গ্রহতারার পরিচয়ও নাও। চলে এস জ্যোতিষ্কমণ্ডলে।

ছোট ছেলেকে নিজের হাতে শেখান দেবেন্দ্রনাথ। যে আকাশে রাজত্ব করছে রবি হয়ে তার খোঁজ নাও। সূর্যই তো গ্রহরাজ। আর 'গগনে নহিলে তোমার ধরিবে কেবা!'

আকাশের খোঁজ নেওয়া মানে বিকাশের খোঁজ নেওয়া। আকাশ দেখলেই মনে মনে সঙ্কল্প করবে আমিও প্রকাশিত হব। আলোকিত হব। অন্ধকারে আচ্ছন্ন, নিশ্চিহ্ন হয়ে থাকব না।

একেবারে একটা পাশের ঘরে শোয় রবীন্দ্রনাথ। প্রায় পাহাড়ের কাছাকাছি। কাচের জানলা দিয়ে শেষ-রাত্রের পাহাড় দেখে। ভোর হয় নি, তারাগুলোও যাই-যাই করছে, সেই ধূসর আবছায়ার মধ্যে। পাহাড়ের চূড়ায় স্বপ্নপুরীর ঐশ্বর্যের মত বরফ জমে। অন্ধকারেই ঝলমল করে, ঝলমল করে।

সেই দুঃসহ শীতে উঠেছেন দেবেন্দ্রনাথ। গায়ে একখানি লাল রঙের শাল। হাতে মোমবাতি নিয়ে চলেছেন বারান্দায়। বাইরের বারান্দায়, কাচের দেয়াল দিয়ে ঘেরা। চলেছেন নিঃশব্দে, কারু যেন না ঘুম ভাঙে। কোথায় চলেছেন উনি? বাতি দিয়ে কী করবেন?

বাতিটি নিবিয়ে দেবেন। বারান্দায় পৌঁছে বসবেন তিনি তাঁর নির্দিষ্ট আসনে। বসবেন উপাসনায়। ঈশ্বরের কাছে এসে বসার নামই উপাসনা।

চোখ চেয়ে চেয়ে সব দেখছে রবীন্দ্রনাথ। একদিকে উন্নত গম্ভীর

হিমালয়, আরেক দিকে প্রশান্ত গম্ভীর পিতৃদেব। ধীরে ধীরে সূর্যোদয় হবে শুধু আকাশে নয়, জীবনের উদার ও অগাধ অনুভবে। সূর্যোদয়ের জন্যে এই প্রতীক্ষা এই প্রস্তুতির নামই উপাসনা।

সমস্ত ছবিটি রবীন্দ্রনাথের মনের মধ্যে গাঁথা হয়ে যায়। অমনি একটি নিঃশব্দ ও নিগূঢ় নিবেদনের জন্যে মন উৎসুক হয়ে ওঠে।

ভোর হলে ছেলেকে পাশে ডেকে নেন দেবেন্দ্রনাথ। ছেলের সঙ্গে আরেকবার উপাসনা করেন। উপনিষদের মন্ত্র পড়িয়ে শোনান।

যা কিছু দেখছ চোখের সামনে, যা কিছু বা দেখছ না, যা নড়ছে চলছে হচ্ছে সরে যাচ্ছে সবই ঈশ্বর দিয়ে আবৃত, ঈশ্বর দিয়ে আচ্ছন্ন। তিনি অণুর অণু, মহানের মহান। তাঁর দীপ্তিতেই সকলে দীপ্তিমান, তাঁর প্রভাতেই সকলে প্রভান্বিত। তাঁর ক্ষয়-বৃদ্ধি নেই, উৎপত্তি-বিনাশ নেই, অপচয়-উপচয় নেই।

মুগ্ধের মত শোনে রবীন্দ্রনাথ। অর্থ সব বোঝে না কিন্তু ধ্বনিটি আনন্দময় লাগে। আনন্দময় লাগে সেই মন্ত্রমুখর নিস্তব্ধতা।

চারদিকে এত যে সব ধ্বনি, পাতার মর্মর, নদীর কলস্বন, ভ্রমরের গুঞ্জন, বিহঙ্গের কাকলি,—কী এদের অর্থ? শুধু একটি আনন্দের বিজ্ঞাপন। জলে স্থলে আকাশে একজন আনন্দময় বিরাজ করছেন, তারই স্বীকৃতি।

তাঁকে দেখ। তাঁকে অনুভব কর। কেই বা কিছুমাত্র শরীরচেষ্টা প্রাণচেষ্টা করত যদি আকাশে বাতাসে তিনি আনন্দময় হয়ে না থাকতেন!

হিমালয় থেকে ফিরে এসে সেণ্টজেভিয়ার্সে ভর্তি হল রবীন্দ্রনাথ। যদি এবার খোদ সাহেবি ইস্কুলে কিছু ফল হয়। মন যায় পড়াশোনায়।

সবাই প্রায় হাল ছেড়ে দিয়েছে। আক্ষেপ করছেন বড়দিদি, বড় হলে রবি একটা মানুষের মত হবে এই সবাই আশা করেছিলাম। কিন্তু কী দুর্দৈব, সেই আশাই কিনা নষ্ট হল সমূলে!

তবু ইট-কাঠ-দেয়ালের ইস্কুল আকর্ষণ করতে পারল না। তার

চেয়ে দেখি এই আরেক বিদ্যালয়। অমিত জীবন আর সৌন্দর্যের বিদ্যালয়। সেই ইস্কুলে গিয়ে ভর্তি হই। সেখানে শুধু একজন শিক্ষক। শুধু শিক্ষক নন, সখা। সমবয়সী। সব সময়ে সমবয়সী।

সেণ্টজেভিয়ার্সে একটি মহৎ হৃদয়ের স্পর্শ পেল রবীন্দ্রনাথ। সাময়িকভাবে বদলি খাটতে এসেছেন এক অধ্যাপক, নাম ডি. পেনেরাণ্ডা, স্পেন দেশে বাড়ি। স্পেন দেশে বাড়ি বলে ইংরিজি উচ্চারণ একটু বাধো-বাধো। সেই কারণে ছেলেরা বিশেষ শান্ত থাকে না ক্লাসে। যেটুকু সম্ভ্রম তাঁর শিক্ষক হিসাবে প্রাপ্য তার চেয়ে যেন কম পান। মুখখানি বিমর্ষ হয়ে থাকে। তার জন্যে শাস্তি দেওয়ার কথা ভাবা দূরের কথা, কারুর কাছে নালিশ পর্যন্ত করেন না। নম্র হয়ে সহ্য করেন প্রতিদিনের অপ্রসাদ। যেন আশা করেন কেউ একদিন বুঝবে তাঁর গ্লানিহীন ম্লানিমাকে।

মুখশ্রী সুন্দর নয়, কিন্তু বেদনার নির্মলতা কেমন একটি লাবণ্য ঢেলে দিয়েছে। সেইটিই কিশোর রবীন্দ্রনাথকে আকর্ষণ করে। মনে হয় বাবাকে যেমন উপাসনা করতে দেখেছে হিমালয়ে, সেই ভাবটাই যেন নিবিড় করে আঁকা তাঁর চোখদুটিতে। অন্তরে যেন সেই বিশ্বাস আর সমর্পণের স্তব্ধতা। অন্তরের চিন্তাটি যদি মহৎ হয়, আননের শ্রীটিও পবিত্র হয়ে উঠবে।

কি একটা লিখতে দিয়েছেন ছেলেদের। নিজে ঘুরে ঘুরে দেখছেন কে কিরকম লিখছে। একদম কলম চলছে না রবীন্দ্রনাথের। মাথা উঁচু করে কলম হাতে কিসব করেছে সে এলোমেলো। কখন তার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন পেনেরাণ্ডা। লিখছে না বলে কোথায় ধমক দেবেন, তা নয়, পিঠের উপর হাত রেখেছেন সস্নেহে। নুয়ে পড়ে জিগগেস করছেন মধুর স্বরে, 'তোমার কি শরীর ভাল নেই?'

ছোট্ট একটি কথা, কিন্তু যেন সুধা-সমুদ্রের ঢেউ। মন বড় হলেই যেন হাত ও হাতের সঙ্গে হাতের স্পর্শ অত বড় হয়। নত ভঙ্গির প্রীতি-স্পর্শটিই হল ঈশ্বর-স্পর্শ।

তের-চৌদ্দ বছর বয়স, প্রথম মৃত্যুর সঙ্গে সাক্ষাৎকার হল রবীন্দ্রনাথের। হঠাৎ শেষ রাত্রে বাড়ির পুরোনো দাসী আর্তনাদ করে উঠল। ঘুম ছেড়ে উঠে বসল রবীন্দ্রনাথ, তবে কি মা আর নেই? অনেকদিন ধরে ভুগছেন, আছেন অন্তঃপুরের তেতলায়। বোটে করে গঙ্গায় ছিলেন কিছুকাল, বিশেষ উপকার হয়নি। তবে আজ কি সব শেষ হয়ে গেল? তবে আর কান্নাকাটি নেই কেন? দাসীর মুখ কে চাপা দিলে?

মিটমিটে বাতির আলোয় স্পষ্ট কিছু বুঝতে পারছে না রবীন্দ্রনাথ।

সকাল হলে বুঝল। শুনল মা মারা গেছেন।

যাকে বলে মৃত্যু, সে যেন কী ঘোরদন্ত মহাকায়, কী অসহদর্শন ভয়ঙ্কর। বিষণ্ন হল রবীন্দ্রনাথ। কী করে তাকাবে তার মার দিকে? দাঁড়াতে পারবে তো কাছে গিয়ে?

আহা, ঐ দেখ, বাইরে উঠোনে মাকে আনা হয়েছে। শুয়ে আছেন খাটের উপর। ভোরের আলোটি ঈশ্বরের ভালবাসার মত গায়ে এসে পড়েছে। এই মৃত্যু? এ তো শান্তি, এ তো সুখসুপ্তি। এ তো ক্ষমার মত স্নিগ্ধ, মার্জনার মত মনোহর!

কোন কিছু একটা নিশ্চিহ্ন হয়ে উচ্ছিন্ন হয়ে গেল এ তার ছবি নয়। একটা কক্ষ ছেড়ে চলেছে আরেক কক্ষে, এক অধ্যায় থেকে আরেক অধ্যায়ে সেই চিরযাত্রার ছবি।

এই সেদিনও মাকে বাল্মীকির রামায়ণ পড়িয়ে শুনিয়েছে। কৃত্তিবাসের চলতি বাংলা রামায়ণ নয়, অনুষ্টুভ ছন্দের সংস্কৃত রামায়ণ। হিমালয়ের আশ্রয়ে এনে দেবেন্দ্রনাথ ছেলেকে দিয়েছেন সেই মহাকবির উদার স্পর্শ। গায়ত্রী-গীতা-উপনিষদের পর এই বাল্মীকির রামায়ণ। মা কত খুশি হয়েছেন। সন্তানগর্বের সুখ এক বস্ত্রাঞ্চলে ধরে নি। লোক ডেকে এনে বিতরণ করেছেন অকাতরে।—দেখ দেখ, কোথা থেকে আমার রবি তার দীক্ষা নিয়ে এসেছে। কোন্ উদয়তীর্থের উত্তুঙ্গ গিরিচূড়া থেকে।

সেই মা কি আর কথা কইবেন না? এই যে চুপ করে আছেন এ কি আরেক রকম কথা কওয়া নয়? এই যাকে শেষ বলছি এই কি অশেষ নয়? অন্তই কি নয় অনন্তের দুয়ার?

অশ্রুধৌত মুখে রবীন্দ্রনাথ ফিরল শ্মশান থেকে। গলির মোড়ে এসে তেতলায় বাবার ঘরের দিকে দৃষ্টি পড়ল। বেলা অনেক হয়েছে, তবু বাবা ওঠেননি আসন থেকে। উপাসনায় বিনিশ্চল হয়ে আছেন।

শোকের সরোবরে ফুটে উঠেছে একটি সান্ত্বনার শতদল। বেদনা বিশ্রাম পেয়েছে নিবেদনে। সমস্ত আক্ষেপ-বিক্ষেপ নিবৃত্তি পেয়েছে স্বীকৃতিতে শরণাগতিতে।

মা আগে সীমাবদ্ধ ছিলেন, এখন পরিব্যাপ্ত হয়েছেন। তাঁর আঙুলের আগায় যে সুন্দর স্পর্শটি ছিল তাই এখন চলে এসেছে ফুলের পাপড়িতে, তাঁর চোখে ছিল যে কোমল আশীর্বাদ তাই এখন ফুটে রয়েছে তারার বিন্দুতে শিশিরবিন্দুতে, তাঁর অঙ্গভরা যে ভালবাসা তাই এখন ছড়িয়ে রয়েছে দিনের আলোয় রাতের অন্ধকারে।

কবিতা লিখে ফেলল রবীন্দ্রনাথ। সেই যে হিমালয় দেখে এসেছিল তার কবিতা :

হিমাদ্রিশিখরে শিলাসনোপরি
গান ব্যাস ঋষি বীণা হাতে করি—
কাঁপায়ে পর্বত শিখর কানন
কাঁপায়ে নীহার শীতল বায়!

খুব একটা উঁচু সুরে তার বেঁধে নিল। কবিনেত্র উন্মোচন করেই দেখল প্রথম হিমাদ্রিশিখরকে আর মহাকবি ব্যাসকে। যেন প্রথম দৃষ্টিপাতেই সমীচীন দিগ্‌দর্শন হল। ভারতবর্ষের শৃঙ্খলমুক্ত জাগরণের জন্যেই সেই কবিতা—প্রথম কবিতা। ঠিক-ঠিক দেখল সেই ভারতবর্ষের চেহারা। তার পরিবেশ, তার পটভূমি। ব্যাস আর হিমালয়।

প্রথম কবিতার বই 'বনফুল'। যে বনের ছবি আঁকল রবীন্দ্রনাথ সেটিও হিমালয়ের পাদমূলে।

প্রদীপ্ত তুষারচয়
হিমাদ্রি-শিখর-দেশে পাইছে প্রকাশ।
অসংখ্য শিখরমালা বিশাল মহান
ঝর্ঝরে নির্ঝর ছুটে . শৃঙ্গ হতে শৃঙ্গ উঠে
দিগন্ত-সীমায় গিয়া যেন অবসান॥

তের চৌদ্দ বছরের ছেলে। একবার তাকালো অনেক উঁচুতে, অভ্রস্পর্শী চূড়ার দিকে, আরেকবার তাকালো অনেক দূরে অভ্রস্পর্শী দিগন্তরেখায়। উঁচু আর দূর, দূর আর উঁচু, বৃহৎ আর মহৎ, মহৎ আর বৃহৎ—তুমি ভারতবর্ষের কবি, তুমি অমিতবর্ষ বসুন্ধরার কবি।

উচ্চ হতে উচ্চ গিরি
জলদে মস্তক ঘিরি'
দেবতার সিংহাসন করিছে লোকন।

দেবতার সিংহাসনটি দেখ। কোথায় সেই সিংহাসন? আর কোথায়! তোমারই মনের মধ্যে। সেখানে সোনা কোথায়? কোথায় মণিমাণক্য? ভালবাসাই সোনা, অশ্রুকণাই মণিমাণিক্য।

সেদিন একলা বসে আপন মনে গান গাইছিলাম। জলে-স্থলে শুনছিল কে কান পেতে বুঝি নি। হঠাৎ চেয়ে দেখি, হে মহারাজ, তুমি তোমার সিংহাসন থেকে নেমে এসেছ। নেমে এসেছ আমারই দীনহীন ঘরের দুয়ারে। নির্জন দেখেই আসতে সাহস পেলে। আর কোন স্বর তোমার কানে যায় না, শুধু কান্নার সুরটুকুই তোমার কানে যায়। কী বিরাট তোমার সভা, কত তাতে জ্ঞানী-গুণী, তবু এই গুণহীনের গান তোমার কানে গেল। তুমি তোমার দুটি বাহুর বরণ-মালা নিয়ে কাছে এসে দাঁড়ালে। কত গান তুমি শুনছ দিন-রাত, কিন্তু তোমাকে ভালবেসে তোমার জন্যে কেউ কাঁদছে এমন গান তুমি আর কোথাও শোন নি। শুনলে, আর অমনি ফেলে এলে সিংহাসন। মহারাজ ছিলে, ভিখিরি হয়ে গেলে।

ষোল বছর বয়স, 'কবিকাহিনী' লিখল রবীন্দ্রনাথ। লিখতে লিখতে

বিশাল এক রাজত্বের মধ্যে চলে এল। অন্তহীন দিগন্তহীন-মহাদেশ। তার নাম কী? তার নাম মানব হৃদয়।

মানুষের মন চায় মানুষেরি মন
গম্ভীর সে নিশীথিনী সুন্দর সে উষাকাল
বিষণ্ণ সে সায়াহ্নের ম্লান মুখচ্ছবি,
বিস্তৃত সে অম্বুনিধি সমুচ্চ সে গিরিবর
আঁধার সে পর্বতের গহ্বর বিশাল
পারেনা পুরিতে তারা বিশাল মানুষ-হৃদি,
মানুষের মন চায় মানুষেরি মন॥

মানুষের মনের মতন বড় আর কী আছে? কত বড় পৃথিবী, তার চেয়ে কত বড় সমুদ্র, তার চেয়ে আরো কত বড় আকাশ। ঈশ্বর সকলের চেয়ে বড়। সেই ঈশ্বর মানুষের মনের মধ্যে।

কিন্তু মৃত্যুর পরে কি আর কিছুই নেই? কিছুই থাকবে না?

কালের সমুদ্রে এক বিম্বের মতন
উঠিল আবার গেল মিশায়ে তাহাতে?
একটি পার্থিব ক্ষুদ্র নিশ্বাসের সাথে
মুহূর্তে হবে কি তাহা অনন্তে বিলীন?

বড় হয়ে মাকে একদিন স্বপ্ন দেখলেন রবীন্দ্রনাথ। দেখলেন তিনি যেন সেই ছোট বালক আর মা যেমন থাকেন বাড়িতে তেমনি আছেন। আছেন তো আছেন, সব সময়েই তো তা নিয়ে সচেতন থাকা চলে না ব্যস্ততার সংসারে। তাই যেমন আগে মায়ের ঘরের পাশ দিয়ে চলে যেত, তেমনি উদাসীন ভাবে চলে গেল রবীন্দ্রনাথ। বারান্দায় গিয়ে হঠাৎ মনে হল, ওকি, ঘরের মধ্যে ঐ মা বসে আছেন না? তাড়াতাড়ি তাঁর ঘরে গিয়ে প্রণাম করল পা ছুঁয়ে। মা রবীন্দ্রনাথের হাত ধরলেন, কাছে টেনে এনে বললেন, 'তুমি এসেছ!'

যদি মায়ের ঐ স্পর্শটি পেতে চাও ঐ স্বরটি শুনতে চাও, ছুটে

যাও মায়ের কাছে। তাঁর পায়ের ধুলো মেখে তোমার ললাট নির্মল কর।...

সংসারে মা বিরাজ করছেন সর্বময়ী কর্ত্রীর মত। যদি তাঁর কাছে তুমি না-ও যাও তোমার অন্নবস্ত্রের অভাব হবে না, তাঁর সেবাস্নেহ অকৃপণই থাকবে। তুমি অবাধ্য হও অযোগ্য হও, কিছু এসে যাবে না—তাঁর ভাণ্ডার অখণ্ড। তেমনি ঐ মায়ের মতই ঈশ্বর। তাঁকে না মানো না জানো, ভুলেও একবার তাঁর দিকে না তাকাও, তোমাকে তিনি তাই বলে ঠকাবেন না। ফেলে দেবেন না। অন্নজল তোমাকে ঠিকই পরিবেশন করবেন, ধনে জনে ঠিকই পরিপূর্ণ রাখবেন তোমাকে। কিন্তু তা দিয়েই কি তোমার মন ভরবে? তোমার মন কেঁদে-কেঁদে উঠবে— সেই ঘরটি কোথায়, সেই স্পর্শটি কোথায়? মা রয়েছেন বসে, তুমি তাঁর পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছ। পেলে না তার হাতের ছোঁয়া, শুনলে না তাঁর গলার স্বর, তোমার মত অসম্পূর্ণ আর কে আছে?

তাই, বঞ্চিত কোরো না নিজেকে। মায়ের ঘরের পাশ কাটিয়ে যেও না। ছুটে এসে মায়ের কাছটিতে পৌঁছও। মাকে ধর। নাও তাঁর স্পর্শের অমিয়। শোন তাঁর কণ্ঠের মাধুরী।

মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ তখন আমেদাবাদের জজ। থাকেন শাহীবাগে বাদশাহী আমলের প্রাসাদে। নিচে দিয়ে ক্ষীণকায়া সাবরমতী নদী বালির বিছানায় শুয়ে আছে। প্রকাণ্ড, অফুরন্ত বাড়ি। দুপুরের নির্জনে একা-একা ঘুরে বেড়ায় রবীন্দ্রনাথ আর ভরা গলার কপোত-কূজন শোনে। কত বই, কত ছবি, কত সব রহস্য-পুরীর ছোট-ছোট বাতায়ন। সব ফেলে সংস্কৃত বইগুলি নিয়ে বসে। সাধ্য নেই মানে বোঝে। কিন্তু সবই তো বোঝবার জন্যে নয়, কিছু-কিছু আবার বাজবার জন্যে। সংস্কৃত কথার ধ্বনি আর ছন্দ তন্ময় করে রাখে। যেন মৃদঙ্গে গম্ভীর ঘা পড়ছে আর তালে তালে মনেও উঠছে সেই বাজনার ঢেউ। যে স্বরধ্বনি এত সুন্দর, তার অর্থ যেন কত গভীর!

তেতলার ছোট ঘরে রাত্রে শোয় রবীন্দ্রনাথ। শোয় আর কখন,

ঘরের সামনেকার প্রকাণ্ড ছাদে অনেক রাত পর্যন্ত ঘুরে বেড়ায়। উপরে জ্যোৎস্নাঢালা পারহারা আকাশ আর সামনে বালির প্রান্তর, তার গা ঘেঁষে সুদূরের সঙ্কেতময়ী সাবরমতী—হঠাৎ একরাত্রে রবীন্দ্রনাথের কাছে গান চলে এল ভাসতে ভাসতে।

যেন এক মুক্ত গগনের পাখি! মুক্ত পবনের সুগন্ধ!

ছুটি, ছুটি, গুহা-গৃহ থেকে নির্ঝরিণী ছুটি পেয়েছে! মৃত্তিকার গৃহ থেকে মুক্তি পেয়েছে সহজে তৃণাঙ্কুর!

কথা এল। নিজেই সুর দিল গুন-গুন করে। গেয়ে উঠল তারপর

নীরব রজনী দেখ মগ্ন জ্যোছনায়
ধীরে ধীরে, অতি ধীরে গাও গো!
ঘুমঘোরভরা গান বিভাবরী গায়,
রজনীর কণ্ঠসাথে সুকণ্ঠ মিলাও গো।

রহস্যময়ী রাত্রি কথা কইছে তার আকাশ-মৃত্তিকাব্যাপী অব্যাহত স্তব্ধতায়। সেই কথাটি শোনো কান পেতে। তারপর নিজের স্তব্ধতার সুরটি সেই কথার সঙ্গে মিলিয়ে দাও। যখন রাত্রির অন্তরের কথাটির সঙ্গে তোমার অন্তরের কথাটি যুক্ত হবে—একটি সম্মিলিত স্তব্ধতা—তখন, তখনই তার নাম হবে উপাসনা।

তুমিই আমার গভীর গোপন, তুমিই আমার পরম আপন! তুমি এই নিশীথ রাত্রে যে শান্তির বাণীটি মেলে দিয়েছ তাই আমি আমার জীবনে গেঁথে নেব। যে দীপ জ্বেলেছ এই নক্ষত্র-দ্যুতিতে, তাই আমারও অন্তরের অন্ধকার আকাশে জ্বলবে অনির্বাণ। সহস্রচক্ষু তুমি, ঐ নক্ষত্রদ্যুতি তোমারই নয়ন-দ্যুতি। অম্বরেও যেমন অন্তরেও তেমনি।

মোহনবাগান

'চল্, মাঠে চল্, মোহনবাগানের খেলা দেখে আসি।'

মোহনবাগান! আজকাল আর যেন তেমন করে বাজে না বুকের মধ্যে। সেই ইস্ট ইয়র্কস নেই, ব্ল্যাক-ওয়াচ ডারহামস এইচ-এল-আই ডি-সি-এল-আই নেই, সেই মোহনবাগানও নেই। আজকালকার মোহনবাগান যেন 'মোহন' সিরিজের উপন্যাসের মতই বাসি।

কিন্তু সেসব দিনের মোহনবাগান মৃত দেশের পক্ষে সঞ্জীবনী ছিল। বলা বাহুল্য হবে না, রাজনীতির ক্ষেত্রে যেমন ছিল 'বন্দেমাতরম', তেমনি খেলার ক্ষেত্রে 'মোহনবাগান'। পলাশির মাঠে যে কলঙ্ক অর্জন হয়েছিল তার স্খালন হবে এই খেলার মাঠে। আসলে, মোহনবাগান একটা ক্লাব নয়, দল নয়, সে সমগ্র দেশ—পরাভূত, পদানত দেশ, সেই দেশের সে উদ্ধত বিজয়-নিশান।

এ কথা বললে বাড়িয়ে বলা হবে না যে মোহনবাগানের খেলার মাঠেই বাঙলা দেশের জাতীয়তাবোধ পরিপুষ্ট হয়েছিল। যে ইংরেজ-বিদ্বেষ মনে মনে ধূমায়িত ছিল মোহনবাগান তাতে বাতাস দিয়ে বিশুদ্ধ আগুনের সুস্পষ্টতা এনে দিয়েছে। অত্যাচারিতের যে অসহায়তা থেকে টেররিজম জন্ম নেয় হয়ত তার প্রথম অঙ্কুর মাথা তুলেছিল এই খেলার মাঠে। তখনো খেলার মাঠে সাম্প্রদায়িকতা ঢোকেনি, মোহনবাগান তখনো হিন্দু মুসলমানের সমান মোহনবাগান—তার মধ্যে নেবুবাগান কলাবাগান ছিল না, সেদিন যে ক্যালকাটা মাঠের সবুজ গ্যালারি পুড়েছিল তাতে হিন্দু মুসলমান একসঙ্গে হাত মিলিয়েছিল। একজন এনেছিল পেট্রল, আরেকজন এনেছিল দিয়াশলাই। সওয়ার পুলিশের উচ্ছৃঙ্খল ঘোড়ার ক্ষুরে একসঙ্গে জখম হয়েছিল দু-জনে।

সে-সব দিনে খেলার মাঠে ঢোকার লাঞ্ছনার কথা ছেড়ে দিই,

খেলার মাঠে ঢুকে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে যে অবিচার অনুষ্ঠিত হতে দেখেছে দেশের লোক তাতে রক্ত ও বাক্য দুইই তপ্ত হয়ে উঠেছে ইংরেজের বিরুদ্ধে। আর এই তপ্ত বাক্য আর রক্তই ঘরে বাইরে স্বাধীন হবার সঙ্কল্পে ধার জুগিয়েছে। সে-সব দিনে রেফারিগিরি করা ইংরেজের একচেটে ছিল, আর সেই একচোখো রেফারি পদে পদে মোহনবাগানকে বিড়ম্বিত করছে। অবধারিত গোল দেবে মোহনবাগান, হুইসল দিয়েছে অফসাইড বলে। ফাউল করলে ক্যালকাটা, ফাউল দিলে না, যদি বা দিলে, দিলে মোহনবাগানের বিপক্ষে। কিছুতেই মোহনবাগানকে দাবানো যাচ্ছে না, বিনামেঘে বজ্রপাতের মত বলা-কওয়া নেই দিয়ে বসল পেনাল্টি। একেকটা জোচ্চুরি এমন দু-কান-কাটা ছিল যে সাহেবদের কানও লাল না হয়ে থাকতে পারত না। একবার এমনি ক্যালকাটার সঙ্গে খেলায় মোহনবাগানের বিরুদ্ধে রেফারি হঠাৎ পেনাল্টি দিয়ে বসল। যেটা খুবই অসাধারণ, ব্যাক থেকে কলভিন না বেনেট এল শট করতে। শট করে সে-বল সে গোলের দিকে না পাঠিয়ে কয়েক মাইল দূর দিয়ে পাঠিয়ে দিলে। সেটা রেফারির গালে প্রায় চড়-মারার মত—দিবালোকের মত এমন নির্লজ্জ ছিল সেই পেনাল্টি। খেলোয়াড়ের পক্ষে রেফারিকে মারা অত্যন্ত গর্হিত কর্ম সন্দেহ নেই, কিন্তু তিক্তবিরক্ত হয়ে সেদিন যে ড্যালহৌসির মাঠে বলাই চাটুজ্জে ক্লেটন সাহেবকে মেরেছিল সেটা অবিস্মরণীয় ইতিহাস হয়ে থাকবে।

শুধু রেফারি কেন, সমস্ত শাসক বংশই মোহনবাগানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রী ছিল। নইলে ১৩৩০ সালে মোহনবাগানকে ক্যালকাটার বিরুদ্ধে শীল্ড ফাইন্যাল খেলানো হত না। সেদিন রাত থেকে ভুবন-প্লাবন বর্ষা, সারাদিনে একবিন্দু বিরাম নেই। মাঠে এক-হাঁটু জল, কোথাও বা এক-কোমর; হেদো না থাকলে সে মাঠে অনায়াসে ওয়াটার-পোলো খেলা চলে। ফুটবল বর্ষাকালের খেলা সন্দেহ নেই কিন্তু বর্ষারও একটা সীমা আছে সভ্যতা আছে। মোহনবাগান তখন দুর্ধর্ষ

দলী। ফরোয়ার্ডে শরৎ সিঙ্গি কুমার আর রবি গাঙ্গুলি—তিন-তিনটে অভ্রান্ত বুলেট—আর ব্যাকে সেই দুর্ভেদ্য চীনের দেয়াল—গোষ্ঠ পাল। ক্যালকাটা ভাল করেই জানে শুকনো মাঠে এই দুর্বারণ মোহনবাগানকে কিছুতেই শায়েস্তা করা যাবে না। সুতরাং বান-ভাসা মাঠে একবার তাকে নামাতে পারলেই সে কোণঠাসা হয়ে যাবে। শেষদিকে বৃষ্টি বন্ধ করানো গেলেও খেলা কিছুতেই বন্ধ করানো গেল না। ক্যালকাটা কর্তৃপক্ষের সে অসংযত অনম্রতা পরোক্ষে দেশের মেরুদণ্ডকেই আরো বেশি উদ্ধত করে তুললে। যে করে হোক পরাভূত করতে হবে এই দম্ভদৃপ্তকে। যে সহজ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে এসেও ভুলতে পারে না সে উপরিতন, সে একতন্ত্রী।

আর মোহনবাগানকেও বলিহারি। খেলছিস ফুটবল, ছুটতে গিয়ে যেখানে প্রতিপদে আছাড় খেতে হবে। পায়ে বুট পরে নিস না কেন? উপায় কী, বুট পরলে আর ছুট দিতে পারব না, ছেলেবেলা থেকে অভ্যাস যে। দেশে-গাঁয়ে যখন বাতাবি নেবু পিটেছি তখন থেকে, সেই শুরুর থেকেই তো খালি-পা। জুতো কিনি তার সঙ্গতি কই? স্কুল-কলেজে যাবার জন্যে একজোড়া জোটানোই কষ্টকর, আর মাঠে মাঠে লাফাবার জন্যে আরেক জোড়া? মোটে মা রাঁধে না, তপ্ত আর পান্তা! দেখ না এই খালি পায়েই কেমন পক্ষীরাজ ঘোড়া ছুটোই। কেমন দিগ্বিজয় করে আসি। ভেবো না, তাক লাগিয়ে দেব পৃথিবীর। খালি পায়েই ঘায়েল করব বুটকে। উনিশ শো এগারো সনে এই খালি পায়েই শীল্ড এনেছিলাম। এবার পারলাম না, কিন্তু দেখো, আরবার পারব। যেও সব তোমরা।

যাব তো ঠিক, কিন্তু দুপুরের দিকে হঠাৎ কোথা থেকে এক টুকরো কালো মেঘ ভেসে এসেছে, অমনি নিমিষে সক্কলের মুখ কালো হয়ে গেল। হে মা কালীঘাটের কালী, হে মা কালীতলার কালী, তোমরা ~~কে বেশি~~ কালো জানি না। কিন্তু এ মেঘ তোমাদের গায়ে মেখে-মেখে মুছে দাও মা, তোমাদের কালো কেশে উড়িয়ে নিয়ে যাও কৈলাসে।

কত তুকতাক, কত মানত, কত ইষ্টমন্ত্র—হাওয়া উঠুক, ধুলো উড়ুক, মেঘ লণ্ডভণ্ড হয়ে যাক। সব সময় প্রার্থনা কি আর শোনে! মেঘের পরে মেঘ শুধু জমাটই হতে থাকে, ঘন নৈরাশ্যের পর ঘনতর মনস্তাপ। সে যে কী দুঃসময় তা কে বা বোঝে, কাকে বা বোঝাই! ঘাড় গলা উঁচু করে শুধু আকাশের দিকে তাকানো আর মেঘের অবয়ব আর চরিত্র নিয়ে গবেষণা। পশ্চিমের মেঘ যে অমোঘ হয় এই মর্মন্তুদ সত্য চার আনার সবুজ গ্যালারিতে বসেই প্রথম উপলব্ধি করেছি। ফটিকজল পাখি আছে শুনেছি, এখন দেখলাম ফটিকরোদ পাখি। যারা জল চায় না রোদ চায়, মেঘের বদলে মরুস্থলীর জন্যে হা হা করে। হেঁকে বৃষ্টি আসবার ছড়া আছে, মেঘ-মারণমন্ত্রের প্রথম ছড়া সৃষ্টি হয় এই মোহন-বাগানের মাঠে :

ওরে মেঘ দূরে
যা শিগগির উড়ে,
নেবুর পাতা করমচা
রকে বসে গরম চা।

তবু, পাহাড় সরে তো মেঘ সরে না। ব্যঙ্গের ভঙ্গিমায় নেমে আসে বাস্তব বৃষ্টি। মনে হয় না ঘনকৃষ্ণ কেশ আকুলিত করে কেউ কোন নীপবনে ধারাস্নান করছে। বরং মনে হচ্ছে দেশের মাথার উপর ঝরে পড়ছে দোর্দণ্ড অভিশাপ। আর যেমনি জল ঝরল অমনি মোহনবাগানের জৌলুস গেল ধুয়ে। আশ্চর্য, তখন তাতে না রইল আর বাগান, না বা রইল মোহ। তখন তার নাম গোয়াবাগান বা বাদুড়বাগান রাখলেও কোন ক্ষতি নেই।

তবু কালে-ভদ্রে এমন একেকটা রোমহর্ষক খেলা সে জিতে ফেলে যে তার উপর আবার মায়া পড়ে, মন বসে। বারে-বারে প্রতিজ্ঞা করে মাঠ থেকে বেরিয়েছি ও-হতচ্ছাড়ার খেলা আর দেখব না, আবার বারে-বারেই প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ হয়েছে। তাই তেরো শো তিরিশের হারের পরও যে আবার মাঠে যাব—'কল্লোল'এর দল নিয়ে—তা আর বিচিত্র কী।

ওরা খেলে না জিতুক, আমরা অন্তত চেঁচিয়ে জিতব। জিত আমাদের হবেই, হয় খেলায় নয় এই একত্রমেলায়।

'কল্লোল'এ লাগোয়া পুবের বাড়িতে থাকত আমাদের সুধীন—সুধীন্দ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়। আমাদের দলের সর্বকনিষ্ঠ তরুণ উৎসাহী। সুগৌর-সুন্দর চেহারা, সকলের স্নেহভাজন। দলপতি স্বয়ং দীনেশদা। যৌবনের সেই যৌবরাজ্যে বয়সের কোন ব্যবধান ছিল না, আর মোহনবাগানের খেলা এমন এক ব্যাপার যেখানে ছেলে-বুড়ো শ্বশুর-জামাই সব একাকার, সকলের এক ক্ষুরে মাথা মোড়ানো। অতি-উৎসাহে সামনে কারু পিঠে হয়ত চাপড় দিয়েছি, ভদ্রলোক ঘাড় ফেরাতেই চেয়ে দেখি, পূজ্যপাদ প্রফেসর। উপায় নেই, সব এখন এক সানকির ইয়ার মশাই, এক গ্যালারির গায়েক গায়েন। আরো একটু টানুন কথাটা, এক সুখদুঃখের সমাংশভাগী। তাই, ঐ দেখুন খেলা, বেশিক্ষণ ঘাড় ফিরিয়ে চোখ গোল করে পেছনে তাকিয়ে থাকবার কোন মানে হয় না। বলা বাহুল্য, উত্তেজনার তরঙ্গে ঐসব ছোটখাট রাগ-দুঃখের কথা ভুলে যেতে হয়, আর দর্শকদের বহুজন্মের সুকৃতির ফলে মোহনবাগান যদি একবার গোল দেয়, তখন সেই পূজ্যপাদ প্রফেসরও হাত-পা ছুঁড়ে চিৎকার করেন আর ছাত্রের গলা ধরে আনন্দ মহাসমুদ্রে হাবুডুবু খান। সব আবার এক খেয়ার জল হয়ে যায়।

বস্তুত আট আনার লোহার চেয়ারে বসে কী করে যে ভদ্রলোক সেজে ফুটবল খেলা দেখা চলে তা আমরা কল্পনাও করতে পারতাম না। এ কি ক্রিকেট খেলা, যে পাঁচ ওভার ঠুকঠাক করবার পর খুঁচ্ করে একটা গ্লান্স হবে, বা, সাঁ করে একটা ড্রাইভ হবে! এর প্রতিটি মুহূর্ত উদ্বেগের উত্তেজনায় ঠাসা, বল এখন বিপক্ষের গোলের কাছে, পলক না-পড়তেই আবার নিজের হৃৎপিণ্ডের দুয়ারে। সাধ্য কী তুমি চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে থাকতে পার! 'এই, সেণ্টার কর্, ওকে পাশ দে, ঐখানে থ্রু মার্'—এমনি বহু নির্দেশ উপদেশ দিতে হবে তোমাকে। শুধু তাই? কখনো-কখনো শাসন-তিরস্কারও করতে হবে বৈকি।

'খেলতে পারিস না তো নেমেছিস কেন, বুক দিয়ে পড় গোলের কাছে, পা দু-খানা যায় তো সোনা দিয়ে মিউজিয়ামে বাঁধিয়ে রাখব!' তারপর কেউ যদি গোল মিস করে তখন আবার উল্লম্ফন, 'বেরিয়ে যা, বেরিয়ে যা মাঠ থেকে!' আর যদি রেফারি একটা অমনোমত রায় দেয় অমনি আবার উচ্চঘোষ, 'মারো, মারো শালাকে, থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দাও!' এসব মহৎ উত্তেজনা গ্যালারি ছাড়া আর কোথায় হওয়া সম্ভব? উঠে দাঁড়াতে না পারলে উল্লাস-উল্লোল হওয়া যায় কী করে? তাই গ্যালরিতেই আমাদের কায়েমি আসন ছিল, মাঝ-মাঠে সেন্টারের কাছাকাছি, পাঁচ কি ছয় ধাপ উপরে। প্রায়ই আমরা একসঙ্গে যেতাম কল্লোল-আপিস থেকে—দীনেশদা, সোমনাথ, গোরা, নৃপেন, প্রেমেন, সুধীন আর আমি—কোন-কোন দিন আশু ঘোষ সঙ্গে জুটত। আরো কিছু পরে প্রবোধ সান্যাল। অবিশ্যি যে-সব দিন এগারোটায় বারোটায় এসে লাইন ধরতে হত সে-সব দিন মাঠের বাইরে আগে থেকে সবাইকার একত্র হওয়া যেত না কিন্তু মাঠে একবার ঢুকতে পেরেছ কি নিশ্চিন্ত আছ, তোমার নির্ধারিত জায়গা আছে। নজরুল আরো পরে ঢোকে খেলার মাঠে এবং তখন সে বেশ সম্ভ্রান্ত ও খ্যাতিচিহ্নিত। তাই সে জনগণের গ্যালারিতে না এসে বসেছে গিয়ে আট আনার চেয়ারে, কিন্তু তার উল্লাস-উড্ডীন রঙিন উত্তরীয়টি ঠিক আছে। অবিশ্যি চাদর গায়ে দিয়ে খেলার মাঠে আসতে হলে অমনি উচ্চতর পদেই আসা উচিত। আমাদের তো জামা ফর্দা-ফাঁই আর জুতো চিচিং-ফাঁক। বৃষ্টি নেই একবিন্দু, অথচ তিন ঘণ্টা ধস্তাধস্তি করে মাঠে ঢুকে দেখি একহাঁটু কাদা। ব্যাপার কী? শুনলাম জনগণের মাথার ঘাম পায়ে পড়ে পড়ে ভূমিতল পিচ্ছিল হয়ে গেছে। সঙ্গে না আছে ছাতা না আছে ওয়াটারপ্রুফ—শুধু এক চশমা সামলাতেই প্রাণান্ত। কনুয়ের ঠেলায় কত লোকের চশমা যে নাসিকাচ্যুত হয়েছে তার ইতি-অন্ত নেই। আর চক্ষুলজ্জাহীন চশমাই যদি চলে যায় তবে আর রইল কী? কখনো-কখনো ভূমিপৃষ্ঠ থেকে পাদস্পর্শ বিচ্ছিন্ন হয়ে

গেছে। জলে ভাসা জানি, এ দেখছি স্থলে ভাসা। নগ্ন পদের খেলা দেখতে রিক্তহাতে শূন্য মাথায় কখনো বা নগ্ন পদেই মাঠে ঢুকেছি।

শুধু গোকুলকেই দেখিনি মাঠে। তার কারণ 'কল্লোল'এর দ্বিতীয় বছরেই তার অসুখ করে আর সে-অসুখ আর তার সারে না। কিন্তু যতদূর মনে পড়ে শৈলজা একদিন গিয়েছিল আর চুপিচুপি জিগগেস করেছিল, 'গোষ্ঠ পাল কোন্ জন?' আরো পরে, বুদ্ধদেব বসুকে একদিন নিয়ে গিয়েছিলাম, সে বলেছিল, 'কর্নার আবার কাকে বলে?' শুনেছি ওরা আর দ্বিতীয় দিন মাঠে যায় নি।

তবু তো এখন কিউ হয়েছে, আগে-আগে ঘোড়ার সঙ্গে যুদ্ধ করে ঢুকতে হয়েছে, মাঝদিকে গুণ্ডার কাছ থেকে বেশি দরে টিকিট কিনে। আগে-আগে গ্যালারির বাইরে কাঁটাতারের বন্ধন ছিল না। বাইরের কত লোককে যে কত জনে টেনে তুলেছে ভিতর থেকে তার লেখাজোখা নেই। যাকে টেনে তুলেছে সে যে সব সময়ে পরিচিত বা আত্মীয় বন্ধু তার কোন মানে নেই। দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছে তাও বলা যায় না। তবু নিঃস্বার্থভাবে পরোপকার করা—এই একটা নিষ্কাম আনন্দ ছিল। এখন কাঁটাতারের বড় কড়াক্কড়ি, এখন কিউয়ের লাইন এসে দাঁড়ায় হল-অ্যাণ্ডারসন পর্যন্ত, খেলায় আর সে পৌরুষ কই!

নরক-গুলজার করে খেলা দেখতাম সবাই। উল্লাস জ্ঞাপনের যত রকম রীতি-পদ্ধতি আছে সব মেনে চলতাম। এমনকি পাশের লোকের হাত থেকে কেড়ে ছাতা ওড়ানো পর্যন্ত। বৃষ্টি যদি নামত তো চেঁচিয়ে উঠতাম সবার সঙ্গেঃ 'ছাতা বন্ধ, ছাতা বন্ধ!' ঘাড় সোজা রেখে ভিজতাম। শেষকালে যখন চশমার কাঁচ মুছবার জন্যে আর শুকনো কাপড় থাকত না তখনই বাধ্য হয়ে কারু ছাতার আশ্রয়ে বসে পড়তে হত। খেলা যদি দেখতে চাও তো থাকো ভিজে-বেড়াল হয়ে। মনে আছে এমনি এক বর্ষার মাঠে হুমায়ুন কবিরের সঙ্গে এক ছাতার তলায় গুঁড়ি মেরে বসেছিলাম সারাক্ষণ। বৃষ্টির জলের

চেয়ে পার্শ্ববর্তী ছাতার জলই যে বেশি বিরক্তিকর, মর্মে মর্মে বুঝেছিলাম সেদিন।

কিন্তু যদি আকাশ-ভরা সোনার রোদ থাকে, মাঠ শুকনো খটখটে, তবে সব কষ্ট সহ্য করবার দায়ধারী আছি। আর সে গগনদাহন গ্রীষ্মের কষ্টই কি কম! তারপর যদি দুপুর থেকে বসে থেকে মাথার রোদ ক্রমে ক্রমে মুখের উপর তুলে আনতে হয়! কিন্তু খবরদার, ভুলেও জল চেয়ো না। জল চাইতে না মেঘ এসে উদয় হয়! যা দেবী সর্বভূতেষু তৃষ্ণারূপেণ সংস্থিতা, তার ধ্যান কর। বরফের টুকরো বা টুকরো কাটা শশা বা বাতাবিনেবু না জোটে তো শুকনো চিনেবাদাম খাও। আর যদি ইচ্ছে কর আলগোছে কারো শূন্য পকেটে শুকনো খোসাগুলো চালান করে দিয়ে বকধার্মিক সাজো।

যেমনি দুই দিক থেকে দুই দল শূন্যে বল হাই-কিক মেরে মাঠে নামল অমনি এক ইঙ্গিতে সবাই উঠে দাঁড়াল গ্যালারিতে। এই গ্যালারিতে উঠে দাঁড়ানো নিয়ে বন্ধুবর শচীন কর্‌কে একবার কোন সাপ্তাহিকে আক্ষেপ করতে দেখেছিলাম। যতদূর মনে পড়ে তাঁর বক্তব্য এই যে, গ্যালারিতে যে যার জায়গায় বসেই তো দিব্যি খেলা দেখা যায় তবে মিছিমিছি কেন উঠে দাঁড়ানো? শুধু যে ক্ষোভ্য উত্তেজনা দেখানোর তাগিদেই উঠে দাঁড়াতে হচ্ছে তা নয়, উঠে দাঁড়াতে হচ্ছে আট আনার চেয়ার আর চার আনার গ্যালারির মধ্যেকার জায়গায় লোক দাঁড়িয়েছে বলে। বাধ্য হয়েই তাই গ্যালারির প্রথম ধাপের লোককে দাঁড়াতে হচ্ছে এবং ফলে একে-একে অন্যান্য ধাপের। তা ছাড়া বসে-বসে বড়জোর হাততালি দেওয়ার খেলা তো এ নয় উঠে দাঁড়াতেই হবে তোমাকে। অন্তত মোহনবাগান যখন গোল দিয়েছে। কখনো-কখনো সে চিৎকার নাকি বালি থেকে বালিগঞ্জ পর্যন্ত শোনা গেছে। সে চিৎকার কি বসে-বসে হয়?

তবু এত করেও কি প্রত্যেক খরার দিনেই জেতাতে পেরেছি মোহনবাগানকে? একেবারে ঠিক চূড়ান্ত মুহূর্তে অত্যন্ত অনাবশ্যক

রে হেরে গিয়েছে দুর্বলতর দলের কাছে। কুমোরটুলি এরিয়ান্স
ওড়া ইউনিয়নের কাছে। ঠিক পারের কাছে নিয়ে এসে বানচাল
রে দিয়েছে নৌকো। সে-সব দুর্দৈবের কথা ভাবতে আজও নিজের
ন্য দুঃখ হয়—সেই ঝোড়ো কাক হয়ে ম্লান মুখে বাড়ি ফিরে যাওয়া।
নায় শক্তি নেই, রেস্তরাঁয় ভক্তি নেই—এত সাধের চিনেবাদামে
র্যন্ত স্বাদ পাচ্ছি না—সে কী শোচনীয় অবস্থা! ওয়ালফোর্ডের
াদ-খোলা দোতলা বাসে সান্ধ্য ভ্রমণ তখন একটা বিলাসিতা। তাতে
র্যন্ত মন ওঠে না। ইচ্ছে করে ট্রামের সেকেণ্ড ক্লাসে উঠে মুখ
কোই। কে একজন যে মোহনবাগানের হেরে যাওয়ায় আত্মহত্যা
রেছিল তার মর্মবেদনাটা যেন কতক বুঝতে পারি। তখনই প্রতিজ্ঞা
রি আর যাব না ঐ অভাগ্যের এলাকায়। কিন্তু হঠাৎ আবার কোন
দিনে সমস্ত সঙ্কল্প পিটটান দেয়। আবার একদিন পাঞ্জাবির ঘড়ির
কেটে গুণে গুণে পয়সা গুঁজি। বুঝতে পারি মোহনবাগান যত না
ানে, টানে সেন্ট্রারের কাছাকাছি সেই 'কল্লোল'এর দল।

আচ্ছা, এরিয়ান্স হাওড়া ইউনিয়ন—এরাও তো দিশি টিম, তবে
এরা জিতলে খুশি হই না কেন, কেন মনে-মনে আশা করি এরা
মাহনবাগানকে ভালবেসে গোল ছেড়ে দেবে, গোল ছেড়ে না দিলে
কেন চটে যাই? যখন এরা সাহেব টিমের সঙ্গে খেলছে তখন অবশ্যি
আছি আমরা এদের পিছনে। কিন্তু মোহনবাগানের সঙ্গে খেলতে
এসেছ কি, খর্বদার, জিততে পাবে না, লক্ষ্মী ছেলের মত লাড্ডু খেয়ে
বাড়ি ফিরে যাও। মোহনবাগানের ঐতিহ্যকে নষ্ট কোরো না যেন।

রোজ-রোজ খেলা দেখার ভিড় ঠেলার চেয়ে মোহনবাগানের
মেম্বার হয়ে যাওয়া মন্দ কী? কিন্তু মেম্বার হয়েও যে কী দুর্ভোগ হতে
পারে তারও দৃষ্টান্ত দেখলাম। একদিন কি-একটা খবরের কাগজের
স্তম্ভ-কাঁপানো বিখ্যাত খেলায় দেখতে পেলাম, তিন-চারজন মেম্বার
মাঠে না ঢুকে বাইরে বসে সিগারেট ফুঁকছে, তাদের ঘিরে ছোট্ট একটি
ভিড়। বিশ্বাসাতীত ব্যাপার—ভিতরে ঐ চিত্ত-চমকানো খেলা,

আকাশ-ঝলকানো চিৎকার—অথচ এ কয়জন জাঁদরেল মেম্বার বাইরে ঘাসের উপর বসে নির্লিপ্ত মুখে সিগারেট খাচ্ছে আর মন্দ-মন্দ পা দোলাচ্ছে! ভিড়ের থেকে একজন এগিয়ে গিয়ে বিস্মিত স্বরে জিগগেস করলে, 'একি, আপনার মাঠে ঢোকেন নি যে?' ভদ্রলোকদের মধ্যে একজন বললে, 'আমরা তো কই মাঠে ঢুকি না, বাইরেই বসে থাকি চিরদিন। আমরা non-seeing মেম্বার।' 'তার মানে?' 'তার মানে, আমরা অপয়া অনামুখো অলক্ষুনে, আমরা মাঠে ঢুকলেই নির্ঘাৎ হেরে যায়, মেম্বার হয়েও আমরা খেলা দেখি না, বাইরে বসে দাঁতে ঘাস কাটি আর চিৎকার শুনি।'

এই অপূর্ব স্বার্থশূন্যতার কথা স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার যোগ্য বাড়িতে বা অন্য কোথাও গেলে বা বসে থাকলে চলবে না। খেলার মাঠে আসতে হবে ঠিক, আর খেলার মাঠে অনায়াসে ঢোকবার হকদার হয়েও ঢুকবে না কিছুতেই, বাইরে বসে থাকবে এক কোণে—এমন আত্মত্যাগের কথা এ যুগের ইতিহাসে বড় বেশি শোনা যায়নি। আরো একটা উদাহরণ দেখেছি স্বচক্ষে—একটি খঞ্জ ভদ্রলোকের মাধ্যমে। 'কী হল, পা গেল কী করে? গাড়ি-চাপা?' ভদ্রলোক কঠিন মুখে করুণ ভাবে হাসলেন। বললেন, 'না। ফুটবল-চাপা।' 'সে কী কথা?' 'আর কথা নয়, কাজ ঠিক আদায় করে নিয়েছেন ষোল আনা। শুধু আপনাকে বলছি না, দেশের লোককে বলছি। সবাই বলেছিলেন ফুটবল মাঠে পা-খানা রেখে আসতে, আপনাদের কথা শুনে তাই রেখে এসেছি। কই সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে রাখবেন না জাদুঘরে?'